ভারতে সরকারী প্রশাসন

ভারত—দেশ ও দেশবাসী

ভারতে সরকারী প্রশাসন

পদ্মা রামচন্দ্রন

অনুবাদ

সন্তোষকুমার অধিকারী

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

সূচিপত্র

মুখবন্ধ

রাজ্যের শাসনপ্রণালী আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকে। প্রত্যেকদিন আমাদের সরকারী কর্মচারীদের সংস্পর্শে আসতে হয়। পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রক্রিয়া সব সময় সুখকর হয় না। সাধারণের মধ্যে এমন একটি ধারণা রয়েছে যে,, সাম্প্রতিককালে শাসনব্যবস্থার অবনতি ঘটেছে। জনপ্রতিনিধিত্ব, দায়িত্বশীলতা, সৎ ও ন্যায় বিচারের প্রয়োগ প্রভৃতি বিভিন্ন দিক থেকে দেখলে শাসনযন্ত্রের গঠনপদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই বিষয়গুলিকে যথাযথ রূপ দিতে হলে সুষ্ঠু প্রশাসন ব্যবস্থা চাই। এরজন্যই বলা হয় যে, সরকারের গঠনপদ্ধতি যাই হোক, প্রশাসন যদি উত্তম হয়, তবে সব কিছুই উত্তম। তবু আমাদের মধ্যে খুব কম লোকেই জানে, সরকারী প্রশাসন কাকে বলে, এবং আমাদের মতো জনপ্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে কোন নীতির দ্বারা প্রশাসনকে চালনা করা উচিত।

রাজনৈতিক পদ্ধতি ও সরকার গঠনের নীতি সম্পর্কে ইতিমধ্যে অনেক বই লেখা হয়েছে, কিন্তু 1950 সাল থেকেই মাত্র সরকারী প্রশাসন ও শাসনব্যবস্থা স্বতন্ত্র একটি বিষয়রূপে পঠিত হচ্ছে। এখনও বিষয়টি সেই গুরুত্ব পায়নি, যা পেয়েছে ব্যবসায় পরিচালনার (Management) বিষয়। সাধারণ পাঠকের জন্য ম্যানেজমেন্ট-এর ওপর লেখা অনেক বই রয়েছে। কিন্তু সরকারী প্রশাসন ও সরকারী কার্য পরিচালনার ওপর বই লিখেছেন শিক্ষাবিদ্ ও গবেষকেরা অন্য গবেষক ও প্রশাসকদের জন্য শুধু। অনেক প্রশাসকও তাঁদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বই লিখেছেন, কিন্তু সে সব বই বিস্তৃত পাঠক-জগতে প্রবেশ করতে পারেনি, এবং সেই ধরনের উদ্দেশ্য নিয়েও কেউ বই লেখেননি। আমি নিজেও যতদূর জানি, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাধারণ পাঠকের জন্য ভারতবর্ষে কোন বই লেখা নেই। এই বইটি সেই প্রয়োজন মেটাবে। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট সাধারণ পাঠকের জন্য নানা বিষয়ে প্রকাশনার ব্যবস্থা করে অত্যন্ত মূল্যবান কাজ করে চলেছেন; এই বইটিও তাঁরা লিখিয়েছেন ও প্রকাশ করেছেন। তাঁদেরকে আমার অভিনন্দন জানাই।

লেখক নির্বাচনেও এর চেয়ে ভালো কিছু করা যেত না। পদ্মা রামচন্দ্রন বিশিষ্ট প্রশাসকদের মধ্যে একজন, অক্লান্ত কর্মী, উজ্জ্বল বুদ্ধিসম্পন্না ও দীপ্তিময়ী। তাঁর কর্মজীবনও সাফল্যের পথ ধরেই এগিয়েছে। বিভিন্ন পদে তিনি কাজ করেছেন, একেবারে নিচের তলা থেকে সর্বোচ্চ পদমর্যাদায় কেরালা রাজ্যের চিফ সেক্রেটারীর পদেও। ইউ এন ও-র ব্যাঙ্ককে একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক দায়িত্বেও তিনি ছিলেন; বর্তমানে ভারতবর্ষের অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন একটি বিশ্ববিদ্যালয়, বরোদার M. S. University-র উপাচার্য। পদ্মাকে প্রশাসনের সেই ক্ষুদ্র পরিবেশের মধ্যেও একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো দেখা গিয়েছে। মানব সম্পদ উন্নয়নে, বিশেষ করে নারীকে শক্তিশালী করতে তার কাজ মৌলিক ও সৃষ্টিশীল। আমলাতান্ত্রিক অনুভূতিহীন ব্যবহারের কাছে সে সব সময়েই প্রতিবাদে মুখর। কর্মজীবনে তার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের সঙ্গে মিশেছে বাস্তব বুদ্ধি। সে প্রমাণ করেছে তার বিচার করার ক্ষমতা; কর্মক্ষেত্রে সে সৎ ও অকপট, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্না, সূক্ষ্মদর্শী অথচ স্নেহময়ী ও কোমল। তাকে বর্ণনা করতে গেলেই তার বিচিত্র গুণাবলীর অদৃশ্য ছাপ ভেসে ওঠে চোখের সামনে, বোঝা যায় তার বুদ্ধির দীপ্তি, যা এসেছে তার দীর্ঘ প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা থেকে।

সেই প্রাচীন যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সরকারী প্রশাসনের ইতিহাস সরল ভাষায় তুলে ধরেছে পদ্মা। প্রাক্ ব্রিটিশ যুগের প্রশাসন প্রসঙ্গে এমন অনেক ঘটনার কথা সে আমাদের জানিয়েছে, যা প্রশাসক হয়ে যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁদেরও জানা নেই। প্রশাসনের উল্লেখ্য দিকগুলি তুলে ধরার জন্য তার অনসল প্রয়াস, বিশেষত অতীতের ইতিহাসকে খুঁজে দেখার জন্য তার আগ্রহ নিশ্চয়ই প্রশংসার দাবি রাখে। স্বাধীনতার পরবর্তী দিনগুলিতে রাজ্য সরকার ও প্রশাসনের ভূমিকা বিপুলভাবে বেড়েছে। এই সময়ে আমাদের সাফল্য ও ব্যর্থতার ইতিহাস পদ্মা সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছে। আধুনিক সভ্য সমাজে আইনের নীতির গুরুত্ব ও আইনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রশাসক বর্গের ভূমিকার ওপর সে সঠিকভাবেই জোর দিয়েছে।

1991 সাল থেকে একদিকে আর্থিক উদার নীতি অন্যদিকে শাসন কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ যে পরিবর্তনের সূচনা দিয়েছে সে প্রসঙ্গেও আলোচনা করা হয়েছে এই পুস্তকে। সংস্কারমূলক কাজের ঢেউ ভারতবর্ষে এমনই এক সময়ে এসেছে, যখন শিল্প ও বিজ্ঞানে পরিবর্তনের বিরাট দোলা প্রশাসনিক কাঠামো ও কর্মধারায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গির ইঙ্গিত দিয়েছে। শেষকালে লেখিকা ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন এবং বইটি শেষ করেছেন আশার আলো ছড়িয়ে। তিনি দেখিয়েছেন যে, এই পরিবর্তনের ধারা আগামীকালে সরকারী প্রশাসনে যে উল্লেখ্য প্রভাব আনবে, তার ফলে

প্রশাসনের কাজ হবে ত্রুটিহীন ও নিপুণ; জনমুখী ও সহানুভূতিশীল এবং এমনই উন্নত যা আমাদের আকাঙ্ক্ষিত।

কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদে, রাজ্যে অথবা আঞ্চলিক স্তরে যারা সিভিল সার্ভিসে বা সরকারী চাকুরিতে যোগ দিতে আগ্রহী, ও যারা উচ্চাকাঙ্ক্ষী তাদের জন্য এবং সাধারণ সকল পাঠকের জন্য আমি এই সুলিখিত ও সুপাঠ্য বইটি সুপারিশ করি।

নয়াদিল্লি

আবিদ হুসেন

স্বীকৃতি

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের আমন্ত্রণই আমাকে এই বই লেখার প্রেরণা দিয়েছে। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। শ্রীসুরেশ ওয়াধানি, যিনি নিউদিল্লির ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অধিকর্তা, আমায় সাহায্য করেছেন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের দিল্লিতে অবস্থিত গ্রন্থাগার ব্যবহারের পূর্ণ সুযোগ দিয়ে। তাঁর কাছে এবং গ্রন্থাগার পরিচালন ব্যবস্থায় যাঁরা আছেন তাঁদের সকলের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁদের দুজন ব্যক্তি আমায় বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন আমার লিখিত বিষয়গুলি সাজানো ও সেগুলি টাইপ করার কাজে। আমি ধন্যবাদ জানাই শ্রীমতী রাধাম্মা ও শ্রীমতী তুলসীকে।

কাজ করার জন্য আমায় যে সময় দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যেই আমার কাজগুলি করার ব্যাপারে যাঁরা ছোটাছুটি করেছেন যেমন, মোহন, হরিকুমার, উন্নিকৃষ্ণণ, দাশ ও থিরুবনন্তপুরমের দল, তাঁদের উদ্দেশ্যেও আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

সবচেয়ে বেশি প্রেরণা পেয়েছি আমার স্বামী ভি. রামচন্দ্রনের কাছ থেকে। তিনি আমার সামনে তুলে ধরেছেন আদর্শ প্রশাসকের যোগ্যতা ও উদ্যমের আদর্শ, যার ভিত্তি তৈরি হয়েছে ন্যায়পরায়ণতা ও সহযোগিতার মূল্যবোধের ওপরে।

এই বইটি আমি উৎসর্গ করছি তাঁর নামে, আমার সন্তানদের নামে, আমার পিতামাতা ও ভাইবোনদের নামে, যাঁদের সাহচর্যে আমার শৈশব আনন্দময় হয়ে উঠেছিল, যাঁরা আমায় উৎসাহ দিয়েছেন চলার।

পদ্মা রামচন্দ্রন

ভূমিকা

> আমার মনে হয়, ভারতবর্ষের গৌরব তার সেই শক্তির বিকাশে, যে শক্তির বলে ভারত একই সঙ্গে দুটি বস্তুকে জাগিয়ে রাখতে পেরেছে, যা হল তার অন্তহীন বৈচিত্র্য, আর সেই সঙ্গে তার বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। এই দুটিকেই বাঁচিয়ে রাখতে হবে, কারণ কেবল বৈচিত্র্য থাকার অর্থ বিচ্ছেদ ও খণ্ড খণ্ড হয়ে থাকা। যদি তাকে নির্দিষ্ট ঐক্যে স্থায়িত্বের মধ্যে বাঁধতে চাওয়া যায়, তবে তার অর্থ হবে একটি জীবন্ত অস্তিত্বকে প্রাণহীন করে দেওয়া।
>
> **জওহরলাল নেহরু**

ভারতবর্ষ কয়েক শতাব্দী ধরে মর্যাদার শিখরে উন্নীত ছিল, এবং এখনও তাই আছে। যীশু খ্রীস্টের জন্মের দু'হাজার বছর আগেও দেশের অংশে সভ্যতার আবির্ভাব ঘটেছে। এদেশে আর্যদের আগমন খ্রীস্টজন্মের ১৫০০ বছর আগে ঘটেছিল বলা হয়ে থাকে। আর্যদের আসার সময় থেকেই বৈদিক যুগের শুরু, ঋগ্‌বেদের রচনাও সেই সময়েই। তারপর থেকেই অগণিত মানুষের দল বাইরের জগৎ থেকে এসেছে এবং প্লাবিত করেছে এদেশের মাটিকে। অন্য দেশ থেকে আসা এই অভিবাসীরা প্রথমে জড়ো হয়েছে পাঞ্জাবে; পাঁচশো বছরের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে গাঙ্গেয় উপত্যকায় এবং প্রবেশ করেছে বঙ্গদেশে।

আমরা সকলেই সম্ভবত প্রাচীন সভ্যতার এবং পরবর্তী কালে বাইরে থেকে আসা অভিবাসীদের (Immigrants) বংশজাত। কেউই জানে না এই ভারতের মাটিতে কোন আদিবাসী মানুষ ছিল কিনা। উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা পেয়েছি এক প্রাচীন ও বিশাল দেশ বর্তমানে যার আয়তন উত্তর থেকে দক্ষিণে 3214 কিলোমিটার, পূর্ব থেকে পশ্চিমে 2933 কিলোমিটার, পুরো বর্গ আয়তন—3287.263 বর্গ কিমি। আমাদের দেশে এখন 25টি রাজ্য ও 6টি ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল ও আমাদের জাতীয় রাজধানী দিল্লি। উত্তরে, উত্তর-পূর্বে ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তকে ধরে রয়েছে হিমালয় পর্বতমালা, দক্ষিণ ভারতের প্রান্তদেশে কন্যাকুমারী যার চরণ ছুঁয়ে বয়ে চলেছে একদিকে আরব সাগর, অন্যদিকে ভারত মহাসাগর।

পর্বত ও উপত্যকা, মরুভূমি ও তার পরেই ঘন সবুজ মাঠ, অসংখ্য নদ-নদী ও হ্রদ, সমুদ্রতট, জলশূন্য প্রান্তরের অন্তহীন বিস্তার; চারটি ঋতু ও প্রত্যেক ঋতুর উল্লেখ্য মৌসুমী বায়ু; বন্যা ও খরা এসবই ভারতের বিভিন্ন অংশে কমবেশি দেখা

যায়। ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের এই বৈচিত্র্যই আমাদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্নতার কারণ। আমাদের দেশের মানুষ বিভিন্ন ধর্মমত ও নীতির অনুগামী। এই ধর্মমতগুলির মধ্যে আছে হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্ম, খ্রীস্ট, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন ও জরথুস্ত্র ধর্ম। ভারতবর্ষে সরকারীভাবে স্বীকৃত আঠারোটি ভাষা এবং এক হাজারের বেশি কথ্যভাষা (উপভাষা)। প্রশাসন ব্যবস্থা তাই এমনই হওয়া উচিত যাতে তার দ্বারা স্থানীয় প্রয়োজনগুলি মিটতে পারে। একই সঙ্গে জাতীয় স্তরে একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতির প্রশাসনিক ব্যবস্থা দরকার, যার কাজ হবে দেশের দীর্ঘ সীমান্ত রেখার দিকে নজর রাখা। সমগ্র দেশের উন্নয়নমূলক কাজের ভিত্তি তৈরি করা, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সমতা রক্ষা করা, নানা ধর্ম সংগঠন ও রাজ্যগুলির মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষা করা, এবং দেশের প্রগতিশীল ও আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে অনগ্রসর অংশের মধ্যে ন্যায় ও সমতার ভাবকে গড়ে তোলা। ভারতবর্ষের যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কাঠামোতে শিক্ষা ও কৃষির মতো বিষয়গুলি রাজ্য সরকারের এলাকাভুক্ত; কিন্তু বৈদেশিক সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলি ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের হাতে।

আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির মধ্যে একটি, যার মুখোমুখি হতে হবে ভারতীয় প্রশাসনকে, তা হ'ল জনসংখ্যার ভীতিজনক বৃদ্ধি। 2000 শতকে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা একশো কোটিতে পৌঁছবে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশ্বের নয়টি জনবহুল দেশের মধ্যে ভারতবর্ষ একটি। এই নয়টি দেশের জনসংখ্যা সমগ্র বিশ্বের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি। এদের মধ্যে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা বিশ্বের জনসংখ্যার শতকরা 75 ভাগেরও অধিক।

ঔপনিবেশিক শাসনের চাপে বিক্ষত এক ইতিহাস, এবং দেশের বিশাল আয়তন ও বৈচিত্র্য, এবং উন্নয়নের অসম বিন্যাস প্রশাসনিক কার্যনির্বাহের সামনে এক বিরাট প্রশ্ন তুলে ধরেছে। ভারতবর্ষের প্রশাসন ব্যবস্থা তাই জটিলতায় ভরা। দীর্ঘদিন ধরে নানা পরিবর্তনের পথ ধরে এগিয়েছে, তবু বর্তমান শাসন-পদ্ধতির বুনিয়াদ গড়া হয়েছে বিগত দুই শতকের ব্রিটিশ শাসনের ওপরে।

সরকারী প্রশাসন কাকে বলে?

সরকারী প্রশাসন কি জিনিস? খুব সহজে বলা যায়, এ হ'ল জনসাধারণের জন্য সেবামূলক কাজ, যার দায়িত্ব গভর্নমেন্ট বা শাসন পরিষদ নামের জনসংগঠনের হাতে থাকে। মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল সেবা। সরকারী ক্ষেত্রে এই সেবামূলক কাজের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। সে অর্থ সংগ্রহ করা হয় জনসাধারণের কাছ থেকেই কর ধার্য করে বা শুল্ক বসিয়ে। যাদের আয় বা উপার্জন যথেষ্ট তাদের কাছ থেকে অর্থ

সংগ্রহ করে, সেই অর্থ জনসেবার মাধ্যমে সকলের মধ্যে সমানভাবে বিতরণ করা। সরকারী আয়ের বড় অংশ আসে জমির খাজনা থেকে। ব্রিটিশ আমলে যা ছিল, এখনও তাই, জমির খাজনা থেকে রাজস্বের বড় আয় রাষ্ট্রযন্ত্রের, তার সঙ্গে যুক্ত হয় জাতীয় ও রাজ্যস্তরে এবং স্থানিক প্রশাসনেও নানা পদ্ধতিতে আদায় করা নানা ধরনের কর।

শাসন পরিষদ ও প্রশাসনব্যবস্থা আমলাতন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল। মন্ত্রীসভা সাধারণ মানুষের কাছে দায়ী থাকে আইনসভার মধ্য দিয়ে পার্লামেন্টের সদস্য (M.P.) ও বিধানসভার সদস্য (M.L.A.) হিসাবে। তাদের সাহায্য করার জন্য থাকে কার্য-নির্বাহক আমলাতন্ত্র। আমলাতন্ত্রের (Beaurocracy) কাজ মন্ত্রীদের কাজে উপদেশ দেওয়া ও সাহায্য করা এবং মন্ত্রীসভায় গৃহীত সিদ্ধান্তকে কর্মে রূপায়িত করা। এছাড়া আছে স্বাধীন বিচার বিভাগ, যার দায়িত্ব সরকারী কাজকর্মে, আইনের ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রতি লক্ষ রাখা; সঙ্গে সঙ্গে ন্যায় ও সত্যের মর্যাদা রক্ষা করা। এই তিনটি বিভাগ—ব্যবস্থাপক সভা (Legislative Assembly), বিচার বিভাগ (Judiciary) ও কার্য নির্বাহক কর্মচারীবর্গ (Executive) সংবিধানের বিভিন্ন ধারা ও উপধারায় বাঁধা। সংবিধান গৃহীত হয়েছে 1950 সালের 26 জানুয়ারী। উপরোক্ত তিনটি বিভাগের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম সমতাবোধ ও পারস্পরিক নির্ভরতার সম্বন্ধ বর্তমান।

ভারতবর্ষে সংবিধানই সর্বোচ্চ ক্ষমতার উৎস। কার্য-নির্বাহক কর্মচারীবর্গ যখন ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করে তখন তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে বিচার বিভাগ। যখন লোকসভা (সংসদ) ও রাজ্য বিধানসভা আইন প্রণয়ন করে, তখন বিচার বিভাগ স্থির করে যে, সেই আইন সংবিধানের নিয়ম নীতি মান্য করে রচনা করা হয়েছে কিনা। কিন্তু সংবিধান সংশোধনের দ্বারা লোকসভা বিচার বিভাগের অভিমতকে অগ্রাহ্য করতে পারে। সংবিধানের ধারাগুলিই (articles) প্রশাসনিক পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। তাই সংবিধানকে শাসন-পরিচালন-ব্যবস্থার উৎস বলে মনে করা উচিত।

সরকারী প্রশাসন-নীতি ও তত্ত্ব

প্রশাসনের ক্ষেত্র বিশাল ও বিচিত্র। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার পাঠক্রমে প্রশাসনের বিষয় অনেক ও নানাবিধ বিষয়ের একটি; রাজনীতি বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান নামের বৃহত্তর ছত্রতলে আশ্রিত। সিলেবাসের দুটি একটি অধ্যায়ের মধ্যেই এর শিক্ষাংশ সীমাবদ্ধ। অবশ্য এখন কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসন ব্যবস্থা পাঠ্য বিষয় হিসাবে স্বতন্ত্র গুরুত্ব পেয়েছে। নীতির দিক থেকে এর মধ্যে রয়েছে শিক্ষণীয় নানা বিষয়ের

মূলতত্ত্ব—অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, পরিচালন ব্যবস্থা (Management) এবং সমাজ বিজ্ঞানের মতো বিষয়গুলিও এর এলাকায় পড়ে।

সবল শাসনব্যবস্থা ও সরকারী প্রশাসনের মূলনীতিগুলি পৃথিবীর সর্বত্রই একই ধরনের। কর্মদক্ষতা, মিতব্যয়িতা এবং ন্যায় ও সমতা রক্ষাই এর বুনিয়াদ। বিভিন্ন দেশের মধ্যে পদ্ধতিগত পার্থক্য থাকবেই। পার্থক্যের কারণ, শাসনতন্ত্রের সাংগঠনিক রূপ, অর্থনৈতিক উন্নতির ধারা, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ধরন এবং অতীতের প্রভাব ও ভবিষ্যতের লক্ষ্য। গণতান্ত্রিক কাঠামোতে সরকারী প্রশাসনের লক্ষ্য সব থেকে বেশি সংখ্যক মানুষের জন্য সর্বাধিক হিতসাধন—সৎ ও পরিচ্ছন্ন কর্মধারার মাধ্যমে।

সরকারী প্রশাসন ও বেসরকারী পরিচালন ব্যবস্থা

অনেকেই জানতে উৎসুক হয় যে, সরকারী প্রশাসন ও বেসরকারী পরিচালন ব্যবস্থা একই বস্তু কিনা। যতক্ষণ সামনে লক্ষ্যবস্তু থাকবে, আর সেই লক্ষ্যে সাফল্যের সঙ্গে পৌঁছবার চেষ্টা থাকবে (অর্থাৎ সবথেকে কম খরচে ও সবচেয়ে কম সময়ে) ততক্ষণ নীতির দিক থেকে বলা যাবে যে, তারা একই মুদ্রার দুটি দিক। কিন্তু সবচেয়ে বেশি অথবা সবথেকে ভালো এর ব্যাখ্যায় শাসন কর্তৃপক্ষ ও বেসরকারী পরিচালনার মধ্যে প্রায়ই পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শাসন কর্তৃপক্ষকে ব্যস্ত থাকতে হয় সামাজিক হিতসাধন ও উন্নয়নের কাজে—যা লাভক্ষতির হিসাব দিয়ে মাপা যায় না। কিন্তু সুস্থ সমাজের জন্য উন্নয়ন ব্যবস্থা ও সাধারণ মানুষের কল্যাণমূলক কাজের দিক থেকে যা গুরুত্বপূর্ণ। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে বাঁচতে হয় লাভ ও ক্ষতির আর্থিক বিচার করে। তার সঙ্গে সরকারী প্রশাসনকে এক করে দেখা যায় না।

রাজনৈতিক প্রভাব থেকে সরকারী প্রশাসনকে স্বতন্ত্র করে দেখা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক নেতাদের পরিকল্পনা প্রশাসনিক নির্বাহী বা সিভিল সার্ভিস-এর আধিকারিকদের সহায়তায় কর্মে রূপায়িত হয়ে ওঠে, যার মধ্যে সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়। যে প্রক্রিয়ায় সরকারী ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব আইনসভায় পেশ করা হয়, এবং যে কোন ক্ষেত্রে সরকারী ব্যয় সঠিক ও আইনসঙ্গত কিনা, তা স্থির করার জন্য ভোট গ্রহণ করা হয়, তার দ্বারাই বোঝা যায় যে, নির্বাহী আধিকারিকদের ওপরে আইনসভার প্রাধান্য কত বেশি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতি—শাসন কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনিক দপ্তরগুলি সংবিধানে দেওয়া ক্ষমতার কাঠামোর মধ্যেই শুধু কাজ করতে পারে। কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নয়, আইনের গণ্ডিতেই সকলকে চলতে হয়, সরকারী প্রশাসককেও। এই কারণগুলির

জন্যই সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থা বেসরকারী ও ব্যবসায়িক পরিচালন ব্যবস্থা থেকে স্বতন্ত্র। সরকারী প্রশাসককে দেখাতে হয় যে, তাদের কর্মধারা পক্ষপাতশূন্য ও সততার ভিত্তিতে স্থাপিত। তার জন্য কাজের গতি শ্লথ হলে বা কাজের মান নিচু হলেও যায় আসে না। দেখতে হয় যে, একই পর্যায়ের মানুষ এক ব্যবহার ও ফল পায়। বস্তুত ব্যবসায় পরিচালনায় ভাল ফল পাওয়ার জন্য পার্থক্য বিচার প্রয়োজনীয়। কাজের নীতিবিচার এই দুইয়ের মধ্যে স্বতন্ত্র। কর্মনীতির এই পার্থক্যই বলে দেয় যে, সরকারী শাসনযন্ত্রের কি কি কাজ করা উচিত আর কি কি কাজ বেসরকারী সংস্থার হাতে ছেড়ে দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

সরকারী প্রশাসন ঃ একটি কার্যকরী শিক্ষাক্রম

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সরকারী শাসনব্যবস্থা সমাজের সব দিকগুলিকে ঘিরে রয়েছে। মানুষের জন্মমুহূর্ত থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সব কিছুই তার পর্যবেক্ষণের মধ্যে থাকে। শিশুর জন্মের আগে থেকে Amniocentesis tests নিষিদ্ধকরণ এবং নারী ও শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা, মৃত্যুর পর পেনশন, ক্ষতিপূরণ ও গ্র্যাচুইটি দেওয়া সবই প্রশাসনের কাজ।

প্রশাসনের কাজ শিল্প না বিজ্ঞানের এলাকায় পড়ে তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। শিল্প বা বিজ্ঞান যাই হোক সরকারী প্রশাসন যে একটি ব্যবহারিক শিক্ষা ব্যবস্থা, তা মানতেই হবে। রাজনীতি ও সরকারী কর্মধারা—এই দুইয়ের সঙ্গেই তার সম্বন্ধ নিবিড়।

অনেকে মনে করেন যে সরকারী প্রশাসন একটি উল্লেখ্য পেশা বা বৃত্তি নয়। বিশেষজ্ঞ হওয়ার মতো বিষয়ও নয়। সম্ভবত তাই কৃষিবিদ্যা, চিকিৎসা বিজ্ঞান, বা কারিগরি শিক্ষার মতো প্রশাসন শিক্ষার কোন পেশাদারী কলেজ নেই। তার মানে কি এই, যে প্রশাসন বা উন্নয়নমূলক প্রশাসনকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করার জন্য কোন পেশাদারী শিক্ষার ও পেশাগত দক্ষতার প্রয়োজন নেই। কর্ম থেকে অবসর নেওয়ার পর একজন প্রশাসক কি নানা দিকে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও অন্য কোন কাজের উপযুক্ত নন?

আরও একটি উল্লেখ্য দিক আছে। অনেক ইঞ্জিনিয়ার, চিকিৎসাবিদ বা কৃষিবিদ্যায় স্নাতক—এমন ব্যক্তিরা সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসে সরকারী চাকুরিতে যোগ দিচ্ছে। এর দ্বারা একথাই কি বুঝতে হবে যে, আমাদের মানব-সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা সাধারণভাবে অথবা পেশাদারী শিক্ষার ব্যাপারে, কোনদিক থেকেই সঠিক নয়। অথবা একথা মনে করতে হবে যে, সর্বভারতীয় চাকুরির ক্ষেত্রে কর্মযোগ্যতার চেয়ে চাকুরিতে নিরাপত্তার প্রশ্নই বড় হয়ে উঠছে? চাকুরির পরিবেশ

যদি অনুকূল ও সুবিধাজনক হয়, তাহলে প্রশাসক হিসাবে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভের মোহও হয়তো কাজ করে।

বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্যরা

স্পেশ্যালিস্ট অর্থাৎ কোনও বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, এবং জেনারালিস্ট অর্থাৎ নানা বিষয়ে যাঁর কিছু কিছু জ্ঞান—শীর্ষস্থানে বসার যোগ্যতা এঁদের মধ্যে কার বেশি, তা নিয়ে অন্তহীন বিতর্ক। অনেকদিন প্রশাসনে থাকার পর একজনকে বড় জোর জেনারালিস্ট বলা হয়, যিনি অনেক কিছু বিষয়ে অল্প অল্প জানেন। আমাদের এমন একটি পদ্ধতি গড়তে হবে যাতে, যাঁরা অনেক বিষয়ে কিছু কিছু জানেন, তাঁরা বিশেষ কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠবেন এবং যিনি বিশেষজ্ঞ তিনি একটি প্রশস্ত পটভূমিকা পাবেন, যেখানে অনেক মানুষ ও উপকরণ নিয়ে তাঁর কাজ হবে। ওপরের স্তরে নীতি নির্ধারণের জন্য দুটি ধারারই প্রয়োজন আছে।

প্রকৃতি ও সরকারী প্রশাসনের কার্যধারা

স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করে দেখানো যায় না এমন বিষয় শাসন পদ্ধতিতে অনেক থাকে। কারণ, প্রশাসনের কাজ বিস্তৃত ও বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ। এই ঘটনাগুলি প্রভাবিত হয় রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ফলে। শাসন কর্তৃপক্ষের অনেক দূরবর্তী উদ্দেশ্য থাকে; তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধিতাও থাকতে পারে। যেমন উন্নয়ন ও সমতা রক্ষা। এর ফলে একজনের নির্দিষ্ট কাজ, কর্মশক্তি ও ভূমিকার অসম্পূর্ণ পরিমাপ ঘটে; একজনের সম্পাদিত কাজের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করার মতো মাপযন্ত্র পাওয়া যায় না।

এর সঙ্গে ধরা যেতে পারে প্রশাসনের সেই সব কাজ বা সেবামূলক আচরণ যা সাধারণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। দৃষ্টি আবিল হয়ে যায় আরও এইজন্য যে, একটি কাজে অনেক লোকের শ্রম যুক্ত থাকে কিন্তু তার ফল ভোগ করে অল্প কিছু মানুষ। কোন একটি প্রকল্প বা কার্যসূচিকে রূপায়িত করতে সময় এত বেশি লেগে যায় যে, অগ্রগতির পথে উদ্দেশ্যেরও রদবদল ঘটে যায়, এমন কি মূল লক্ষ্য সরে যায় দৃষ্টি থেকে, সে জায়গায় অন্য কার্যসূচি এসে দাঁড়ায়। অনেক সময় ফলপ্রাপ্তির পর কোন একজন কর্মীর কি দান তা বোঝা সম্ভব হয় না। কারখানার কোন শ্রমিক যার হাতে তৈরি হয়েছে বৈদ্যুতিক বালবের ক্ষুদ্র একটি অংশ, যদি দেখে যে, সেই অংশটি নিয়েই তৈরি হয়েছে একটি বড় যন্ত্র বা আরও বড় একটি বস্তু, তাহলে নিশ্চয়ই সে গর্ববোধ করবে। কিন্তু কি কৃতিত্বের দাবি করতে পারে একজন সরকারী কর্মী। তার কাজের ফলকে চোখে দেখা যায় না, গণনাতে পাওয়া যায় না, অনেক দিন পরে

যদি কোন ঘটনায় তার কাজের ফল জানা যায়, তখন হয়তো সে বিদায় নিয়েছে তার চাকুরি থেকে, হয়তো তখন সে বেঁচে নেই।

কাজের স্বীকৃতি ও পুরস্কার নৈতিক মানকে উন্নত করে, আর সরকারী প্রশাসনই একমাত্র স্থান, যেখানে স্বীকৃতির প্রশ্ন অবহেলিত। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থা মেয়েদের সংসার সামলানোর মত ব্যাপার। যতক্ষণ সব কিছু মসৃণভাবে হয়ে চলেছে ততক্ষণ কারও দৃষ্টি পড়ে না কাজের পরিধি কতটা—সেদিকে। কিন্তু যে মুহূর্তে কোথাও কোন ত্রুটি ঘটল, দোষ পড়ে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর ঘাড়ে। ব্যঞ্জনে বেশি নুন বা মশলা হয়ে গেলে, গৃহিণীর কাজ যেমন চোখে পড়ে। গৃহিণী ও প্রশাসকের মধ্যে এই সাধারণ মিলটুকু চোখে পড়ার মত।

কাজের মধ্যে পরস্পরের প্রতি নির্ভরতা ও একত্র হয়ে কাজে হাত দেওয়ার প্রবণতা, সরকারী প্রশাসনের কোন কোন ক্ষেত্রে এখন রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যক্তির কাজের পরিমাপ ও মূল্যায়নের জন্য এগুলিকে ধরতে হবে। ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার মূল্য সঠিক নির্ধারণের জন্য জ্ঞানার্জন প্রয়োজনীয়। অনেক সময় সংকটজনক পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত কাজ করতে হয়। যে কাজ সম্পন্ন করতে হবে তার পরিমাণ বা গুণগত মান স্থির করার কোন নির্দিষ্ট ছাঁচ বা আগাম ইঙ্গিত না থাকায় একটি কর্মকেন্দ্রের কর্মচারী সংখ্যা বেশি না কম এবং তারা যোগ্য কিনা, তা নির্ধারণ করা শক্ত হয়ে পড়ে।

কাজেই একথা বলা যায় যে, উদ্দিষ্ট কর্ম সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না থাকায় সরকারী প্রশাসনে কাজের মূল্যায়ন ও হিসাব রাখা খুবই শক্ত ব্যাপার, ফলে কাজের অনুশীলনে ও নীতিতে দক্ষতার অভাব প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।

প্রশাসনে কার্যসূচি ও পরিকল্পনা রচনার ব্যাপার আছে। কাজের ছক তৈরি করা, কার্যসূচিকে অনুসরণ করা, নীতি ও নিয়ম রচনা করা এবং কাজের তদারকির ব্যবস্থা করা—এসবই প্রশাসনের কাজ। প্রশাসন যে সব কাজের দিকে লক্ষ রাখবে বলে আশা করা যায় সেগুলি হল—প্রতিরক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা, সীমান্ত রক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিল্পায়নের উপযোগী ব্যবস্থা (যেমন পথঘাট, বিদ্যুৎ, জল, গৃহনির্মাণ ইত্যাদি) বৈদেশিক নীতি, ভূমির হিসাব ও নথিপত্রের সংরক্ষণ, আইন ও শৃঙ্খলা, রাজস্ব, কৃষি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়ন, অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য ও শিল্পায়ন প্রচেষ্টা, বহির্বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং, ইন্সিওরেন্স, খনিজ ও জলজ সম্পদের বিকাশ, পথঘাট ও যানবাহন ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়ন, জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি। প্রশাসনের কর্মক্ষেত্র জাতীয় স্তরে এবং রাজ্য ও স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় যেমন, জেলা ও ব্লকগুলিতে।

স্বাধীনতার পরবর্তী কাল

আমলাতন্ত্রমূলক প্রশাসনের কাঠামো আমরা পেয়েছি ঔপনিবেশিক প্রভুদের কাছ থেকে যাদের উদ্দেশ্য ছিল প্রথম দিকে মুনাফা সঞ্চয় এবং তারপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বৃদ্ধি। প্রশাসক শ্রেণী কাজ চালাতো কাজের সঙ্গে নিজেদের না জড়িয়ে, বরং কিছুটা সতর্ক দূরত্বে থেকে। কারণ, ভারতীয়দের তারা জেনেছিল নেটিভ বলে, যারা নিজেদের ভালমন্দ বুঝতে শেখেনি। প্রশাসনে যারা ছিল, তাদের মধ্যে ছিল প্রখর জাতি-বৈষম্যবোধ, নিজেদের স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত বলে জানতো। হাতে শক্তি পুঞ্জীভূত করা এবং ধাপে ধাপে প্রশাসনের উর্ধ্বতর পদে ওঠাই ছিল তাদের লক্ষ্য।

যদিও স্বাধীনতা পাওয়ার পর এই ধরনের চিন্তার পরিবর্তন ঘটেছে, তবু সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে সকলেই স্বরাজের আদর্শে নিজেদের বদলে নিতে সক্ষম হননি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মুনাফা লাভ ও ব্রিটিশ রাজের শক্তি অর্জনের চেষ্টার পরিবেশ থেকে—স্বাধীনতার সঙ্গে যুক্ত আত্মনিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পৌঁছতে শাসক কর্মচারীদের চেতনার পরিবর্তন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটেনি। মানুষের মনে এমন একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, শাসন কর্তৃত্ব ও তার উদ্দেশ্যের বদল হলেও প্রশাসন সেই পুরানো চরিত্রেই দাঁড়িয়ে আছে। দেশের যে উন্নয়ন-পরিকল্পনার রূপ এখন সামনে, তার সঙ্গে তাল রেখে চলার জন্য দ্রুত পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

স্বাধীনতা হাতে পাওয়ার পর আমাদের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কাজের মুখোমুখি হতে হয়েছে। যেমন, দেশবিভাগ যে ধ্বংসের দাবানল জ্বেলেছিল দেশে, তার অবসান ঘটানো; ভারতের সঙ্গে দেশীয় রাজ্যগুলির মিলনের পরিবেশ তৈরি করা এবং সর্বোপরি স্বাধীন ভারতবর্ষের সংবিধান রচনা করা। তাছাড়া দেশের উন্নয়ন, জাতির ক্রমবিকাশ ও কল্যাণমুখী রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্য সামনে রেখে দেশের অগ্রগতির পরিকল্পনা রচনা করা; সেই পরিকল্পনা রূপায়ণের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করা—এসব দায়িত্বই এখন আমাদের সামনে এসে পড়েছে।

এই নূতন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূর্ণ করার জন্য রাষ্ট্রকে অগণিত কাজের ভার হাতে নিতে হয়েছে। তার জন্য প্রশাসনের প্রত্যেক স্তরে প্রচুর কর্মীর প্রয়োজন। কর্মচারীদের সংখ্যার দিক থেকে বর্তমান প্রশাসন বিরাট সমস্যার মুখোমুখি। এই সমস্যা—কর্মচারী পরিচালনা, অফিস পরিচালনা এবং কর্মীদের মধ্যে ও বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে সমন্বয় সাধনে। গভর্নমেন্ট এখন একটি বিরাট সংগঠন, তার কর্মচারীদের পরিচালনা করা এক হতবুদ্ধিকর জটিলতার মধ্যে পা দেওয়া। এই অবস্থায় কাজের পদ্ধতিতে বা রীতিতে কোন পরিবর্তন ঘটানো, অথবা কর্মচারী পরিচালনায় নূতন চিন্তার প্রবর্তন করার কাজ অত্যন্ত ধীর হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন স্তরে কাজের রূপও এক নেই।

সরকারী প্রশাসনের কাছে দায়িত্ব গ্রহণের আহ্বান

এদেশে সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িত অনেক ব্যাপারে সরকারকে হাত দিতে হয়। পৃথিবীর অন্য অনেক দেশের চেয়ে তাই ভারতবর্ষে প্রশাসনের কাজ ব্যাপক। কাজেই নিচু মানের প্রশাসন ব্যবস্থা খুব বেশি রকম ছড়িয়ে আছে। নব্বইয়ের দশকে পৌঁছনোর পর উদারনীতির ফলে কন্ট্রোল তুলে দেওয়া লাইসেনসিং প্রথা বাতিল করা প্রভৃতি কারণে আমলাতন্ত্রের হাত থেকেও কিছু কিছু কাজের দায়িত্ব কমে গিয়েছে।

সাধারণের ইচ্ছাকে নির্দিষ্ট করে জানা, স্পষ্ট ভাষায় বলা ও কাজে রূপায়িত করা প্রশাসনের কাছে এক বিরাট দায়িত্বের আহ্বান এনেছে। কাজের গুরুত্ব শুধু যে বিশাল ও ব্যাপক তাই নয়, সরকারী কাজের প্রকৃতিও পুরোপুরি বদলে গিয়েছে। স্বাধীনতার পূর্বে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা, এবং রাজস্ব আদায়ের কাজে যেভাবে জোর দেওয়া হ'ত, তা এখন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপরে এসে পড়েছে। চিন্তাধারার পরিবর্তনের ফলে কাজের মধ্যে এসেছে এক অভূতপূর্ব জটিলতা। প্রশাসকদের কাজে চাই নতুন উদ্দীপনা ও দক্ষতা, চাই সাধারণ মানুষের প্রয়োজন বুঝবার মত মানসিকতা। তানজানিয়ার বিখ্যাত নেতা জুলিয়াস ন্যায়রেয়ার (Julius Nyrere) বলেছেন,—"গ্রামের মানুষের কাছে পৌঁছনোর চেয়ে চাঁদে যাওয়া অনেক সোজা। কারণ মানুষ কি চায়, তা জানবার ও তাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কাজে চাই বিশেষ মানসিকতা ও কর্ম্মদক্ষতা।"

অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ঃ প্রশাসনের আয়তন ও জটিলতা

একথা বলা হয় যে, বৃহত্তম রাজনৈতিক পটভূমিকায় দেশবিভাগ জনিত সমস্যাগুলির যখন মোটামুটি সমাধান করা গিয়েছে, ভারতবর্ষ যখন গণতান্ত্রিক ও বহুমতবাদী সমাজব্যবস্থায় একতাবদ্ধ হয়ে থেকেছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে যথেষ্ট অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে, তখন কিন্তু দেশের প্রধান সমস্যা দারিদ্র্যের সমাধান হয়নি। 1990 সালের মার্চ মাসে লোকসভায় একটি বিবৃতি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, 1987-88 সালে ভারতের জনসংখ্যার 29.2 শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে ছিল। যদিও দরিদ্র মানুষের সংখ্যা এখন কমেছে, তবু সবদিক থেকে হিসাব করে দেখা যাচ্ছে যে এখনও দরিদ্রের সংখ্যা বিপুল; দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই হল প্রশাসনের সামনে এক বড় চ্যালেঞ্জ।

তারপরে আছে বেকারত্ব ও নিরক্ষরতা। পাঁচ বছর অন্তর নির্বাচন ভিত্তিক গণতন্ত্র সমাজে বেশ কিছু শক্তির সৃষ্টি করেছে, যার জন্য গভর্নমেন্ট নানা দিকে

কাজের পরিধি বাড়াতে বাধ্য হয়েছে। প্রশাসন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সামাজিক উত্তেজনাকে দমন করে আইন ও শৃঙ্খলার পরিবেশ সৃষ্টির কাজে।

সঠিক অর্থে বিজ্ঞান নয় তবু, সরকারী প্রশাসন পদ্ধতিকে বিজ্ঞানের মত চারদিকে দৃষ্টি রাখতে হয়। তার কাজের পরিধিতে রয়েছে অনেক অজানা বস্তু তাই তাকে নমনীয় হতে হয় কাজের রূপায়ণে। অনিশ্চয়তাই আচ্ছন্ন করে রাখে তার পথকে, তবুও প্রশাসনকে হতে হবে গতিশীল; তাকে মেনে নিতে হবে পরিবর্তনশীল পরিবেশকে, যে পরিবর্তন সকল সময়েই কাজ করে চলেছে স্থানীয় জীবনে, রাজ্যে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে। যোগাযোগ ব্যবস্থা ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে দূরত্ব এখন কমে গিয়েছে, পারস্পরিক নির্ভরতার প্রকৃতি নতুন রূপ পেয়েছে।

বিরাট পরিবর্তন ঘটছে পৃথিবী জুড়ে। দ্রুত বদলাচ্ছে মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার রূপ, তাদের প্রয়োজনের ধরন। এমনি একটি প্রশাসন পদ্ধতি এখন চাই, যার মধ্যে থাকবে মানুষের চাহিদার পরিবর্তনকে দ্রুত বুঝতে পারা; আমরা চাই একটি সহানুভূতিশীল ও কর্ম্মমুখর প্রশাসনব্যবস্থা। প্রাচীন মূল্যবোধ ও অভিজ্ঞতাকে নষ্ট না করে আধুনিক চিন্তার পথ খুঁজে বার করা বর্তমান প্রশাসকদের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ।

বাস্তব সত্য হল এই যে, প্রশাসনকে এখন রাজনীতি, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়গুলি থেকে আলাদা করে ধরা যায় না। এই অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাবোধের প্রবণতা—সরকারী প্রশাসনের বিষয়টিকে আকর্ষক করে তুলেছে।

প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থা কিভাবে বিবর্তিত হয়ে এসেছে, এবং তার নিয়মতান্ত্রিক কাঠামোর পরিবর্তন কি ঘটেছে, আমরা এই বইতে সেই বিষয়গুলি দেখবার চেষ্টা করবো।

এক

স্বাধীনতা পাওয়ার আগে ভারতের সরকারী প্রশাসন

1947 সালে স্বাধীনতা পাওয়ার আগে ভারতের প্রশাসন ব্যবস্থা কেমন ছিল, তা জানা যায় প্রাচীন ভারত, মোগল ভারত ও ব্রিটিশ ভারতের প্রশাসনের রূপ আলোচনা করলে।

প্রাচীন ভারত ঃ এই যুগের আরম্ভ যিশুখ্রীস্টের জন্মের 6000-3500 বছর আগের কোন এক সময়ে। এই যুগেই ভারতে আর্য-অনুপ্রবেশের (1500 বি.সি.) প্রথম ঢেউ এসেছে। প্রাচীন যুগের সমাপ্তি 647 খ্রীঃ (শেষ হিন্দু সম্রাট হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর কাল) থেকে 1108 খ্রীস্টাব্দে মুলতানে মুসলমান শাসন স্থাপিত হওয়ার সময়ের মধ্যে। তারপর আরম্ভ হয়েছে মামুদ গজনী (আফগানিস্তান) ও মহম্মদ ঘোরীর (তুর্কি) ভারত লুণ্ঠন। 1206 খ্রীস্টাব্দে দিল্লিতে সুলতানতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা; কুতবুদ্দিন আইবক এসেছেন সুলতান হয়ে। এই যুগের (প্রাক্ মোগল যুগ) 1526 খ্রীঃ পর্যন্ত।

মোগল ভারতঃ লোদি বংশের সুলতান ইব্রাহিমকে 1526 খ্রীস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে যেদিন পরাজিত করলেন তুর্কি বাবর, সেদিন থেকেই ভারতবর্ষে মোগল যুগের আরম্ভ। বাবরের পর সম্রাট হন তাঁর পুত্র হুমায়ুন, কিন্তু তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করলেন আফগান সর্দার শের শাহ। শের শাহর রাজত্বকাল 1540-1545 খ্রীস্টাব্দ। তাঁর পুত্র ইসলাম শাহর মৃত্যুর পর আফগানদের যুদ্ধে পরাজিত করে হুমায়ুন আবার দিল্লীর সিংহাসনে বসেন 1555 খ্রীস্টাব্দে। কিন্তু এক বছরের মধ্যে একটি দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু ঘটে। হুমায়ুনের পর সম্রাট হন তাঁর পুত্র আকবর। আকবরের রাজত্বকাল 1556-1605 খ্রীস্টাব্দ। আকবরের রাজত্বকাল দুটি কারণে উল্লেখযোগ্য। এই সময়েই রাজস্ব ও বিচার বিভাগ দুটির সৃষ্টি। এই ভিত্তির ওপরেই পরবর্তীকালে দুটি বিভাগেরই প্রসার ঘটেছিল। আকবরের পর সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর, পৌত্র শাহজাহান ও প্রপৌত্র আওরঙ্গজেব। 1707 সালে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে

তার পুত্র বাহাদুর শাহ পিতার আসনে বসেন। বস্তুত 1526-1712 খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, আওরঙ্গজেব ও বাহাদুর শাহ—এই সাতজন সম্রাটের রাজত্বকালই মোগল শাসনের কার্যকরী সময়। তারপরেও অবশ্য ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রথম যুগে তাঁদের দুর্বল উত্তরাধিকারীরা বেঁচে ছিলেন। তাঁদের শেষ বংশধর ইংরাজদের হাতে বর্মায় নির্বাসিত হন।

ব্রিটিশ ভারত ঃ যদিও ব্রিটিশ জাহাজ ভারতে পৌঁছেছে মোগল যুগেই এবং 1600 শতকেই স্থাপিত হয়েছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী, তবু ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের আরম্ভ 1765 সালে। সেই সময়েই মোগল সম্রাটের কাছ থেকে রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার লাভ করে ইংরাজ বণিকেরা। 1947 সাল পর্যন্ত তা অক্ষুণ্ণ ছিল।

প্রাচীন ভারতের প্রশাসন ব্যবস্থা

প্রাচীন ভারতের শাসন পদ্ধতি কেমন ছিল, তার বিশদ কিছু বিবরণ পাওয়া যায় না। একমাত্র ঋগ্‌বেদে কিছু কিছু সূত্র পাওয়া যায় যেগুলি আর্যদের সময়ে সৃষ্ট। ঋগ্‌বেদ দেবতাদের উদ্দেশ্যে রচিত 1028টি শ্লোক। এই শ্লোকগুলি বিভিন্ন পুরোহিত পরিবারের দ্বারা রচিত। তার মধ্যে আর্যদের জীবনধারা সম্পর্কে কিছু কিছু আভাস মেলে।[1] অন্য তিনটি বেদ—সাম, যজুঃ ও অথর্ব পরবর্তীকালে লেখা। বেদের জটিল মন্ত্র ও দুর্জ্ঞেয় ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা দিতে ঋষিরা ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের অংশগুলি লিপিবদ্ধ করেন। খ্রীস্টজন্মের প্রায় 550 বছর আগে রচিত উপনিষদগুলি থেকে বেদের অধ্যাত্ম চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। খ্রীস্ট জন্মের প্রায় 900 বছর আগে মহাভারতের যুদ্ধ এবং মহাভারত রচনা সম্ভবত 300 বছর (B.C.) আগে। দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত কয়েক শতাব্দী ধরে এই গ্রন্থগুলি মানুষের জীবন ও চিত্তবৃত্তির আন্দোলনকে ধরে রেখেছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য বিবরণ, যার মধ্যে পাওয়া যায় সে সময়ের নানা তথ্য, প্রেরণা ও ন্যায়পরায়ণতার ইতিহাস।

বৈদিকযুগে শাসনপদ্ধতির প্রাথমিক সূত্রসমূহ

জনসংখ্যা তখন স্বল্প, মানুষ স্থায়ী হয়ে বাস করতে অভ্যস্ত হয়নি, তবু ক্রমান্বয়ে অনুপ্রবেশের ধারার মধ্যে সংক্ষিপ্ত একটি প্রশাসনিক কাঠামো গড়া হয়েছিল। সেই কাঠামোর ঊর্ধ্বে থাকতেন রাজা; যাঁর অধীনে একটি সমিতি বা সাধারণ জনসভা ও বয়স্কদের নিয়ে একটি সভা যদিও বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না, তবু যা বোঝা যায়, তা হল রাজা নির্বাচিত হতেন সমিতির দ্বারা। তাঁর কাজ সম্পাদনে ব্যর্থ হলে রাজাকে সরিয়ে দেওয়া যেত; কিন্তু তিনি আবার নির্বাচনে দাঁড়াতে পারতেন।

কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি জনপদ এবং কতকগুলি জনপদ নিয়ে রাজার রাজত্বের পরিধি। একজন ধর্মগুরু থাকতেন রাজাকে ধর্মীয় রীতিনীতি ও কর্তব্য বিষয়ক উপদেশ দিতে। রাজার প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল তাঁর প্রজাদের রক্ষা করা এবং প্রয়োজন হলে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করা। সমিতি ও সভার সদস্যরা সর্বশক্তিসম্পন্ন ও সর্বমান্য হতেন। বেদের যুগে শাসন কর্তৃত্বের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার একটা সূত্র থাকতে দেখা যায়। এই শাসন পদ্ধতি ক্রমে ক্রমে বংশগত অধিকারে রাজা হওয়ার নিয়মে পরিণত হয়েছে বলে অনুমান করা যায়।

> যদিও রাজতন্ত্রই ছিল বৈদিক যুগের সাধারণ নিয়ম, তবুও প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্বও পাওয়া গিয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে শাসন কর্তৃত্ব রয়েছে একটি ক্ষুদ্র দলের হাতে, যাকে সাধারণ মানুষের উপযুক্ত ও ফলপ্রসূ নিয়ন্ত্রণ না থাকায় একটি বিকৃত ও অবক্ষয় প্রাপ্ত ব্যবস্থা বলা যায়। এছাড়া চতুর্থ শ্রেণীর শাসনব্যবস্থাও ছিল, যে ব্যবস্থায় (স্পার্টান মডেল) সমপদস্থ দুজন রাজা থাকতেন, যাঁদের কার্য নির্বাহের ক্ষমতাও হ'ত সমান।'[2]

অর্থশাস্ত্র

খ্রীস্টজন্মের 321 বছর আগে মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত কৌটিল্যের সহায়তায় সিংহাসনে বসেন। কৌটিল্য (তাঁর আর একটি নাম চাণক্য) তাঁর রাজনীতির ওপরে লেখা বই 'অর্থশাস্ত্র'র জন্য বিখ্যাত। মৌর্য যুগের শাসনব্যবস্থা বোঝার পক্ষে বইটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রশাসনের বিভিন্ন দিক ও পরিধি নিয়ে লেখা হয়েছে বইটি। কৌটিল্যের মতানুযায়ী রাষ্ট্রকে সাধারণ মানুষের কল্যাণের কথা ভাবতে হবে, শৃঙ্খলা ও স্থায়িত্ব রক্ষা করতে হবে, দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করতে হবে, এবং ধর্মকে রক্ষা করতে হবে। ন্যায় রক্ষার জন্য শাস্তিদান আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষাকে সুনিশ্চিত করে। রাষ্ট্রকে দেখতে হবে যে, সাধারণের মধ্যে সম্পদের সমতাপূর্ণ বণ্টন ঘটে। বইটি রাজকুলের প্রতি বাস্তবোচিত উপদেশ বহন করছে যাতে রাজ্যশাসন সর্বোৎকৃষ্ট হয়, এবং রাজার শক্তি সঞ্চয় হয়।[3] কৌটিল্যের মতে একটি সুপরিচালিত শাসন ব্যবস্থা মানুষের কল্যাণসাধনের অপরিহার্য শর্ত। জনকল্যাণই সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থার লক্ষ্য; আমরা এখন যাকে উন্নয়নমূলক শাসনব্যবস্থা বলি। কৌটিল্য বুঝেছিলেন যে, রাষ্ট্রকে কৃষিকার্য, পশুপালন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের দায়িত্ব নিতে হবে। মানুষের শহরে চলে যাওয়া বন্ধ করতে তিনি পল্লীউন্নয়নের যে সুপারিশগুলি করেছেন, তা থেকেই কৌটিল্যের দূরদর্শিতা কত প্রখর ছিল, তা বোঝা যায়।

কোন কোন লেখকের মতে কৌটিল্যই হলেন ভারতবর্ষে অর্থনীতি ও রাজনীতি বিষয়ক বিজ্ঞানের জনক। অর্থশাস্ত্রের প্রকৃত লেখক কে ছিলেন এবং কোন সময়ে

বইটি লেখা হয়েছিল, এ নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। তবে আমাদের আলোচনা শুধু অর্থশাস্ত্রের বিষয় নিয়ে।

সবসুদ্ধ 15টি বই অথবা অধিকরণে 150টি অধ্যায়ে 6000 শ্লোকে গ্রন্থিত হয়েছে শাসনপদ্ধতি, আইন ও শৃঙ্খলা, ন্যায়বিচার, কর আদায়, রাজস্ব ও রাষ্ট্রের ব্যয়নির্বাহ, কূটনীতি, বৈদেশিক নীতি, সংবাদ-সংগ্রহ কৌশল, প্রতিরক্ষা ও যুদ্ধ সম্পর্কিত নির্দেশ। প্রথম পাঁচটি বইতে অভ্যন্তরীণ প্রশাসন সম্বন্ধে আলোচনা—যেমন রাজার পালনীয় কর্তব্য সমূহ, শিক্ষাব্যবস্থা, যে সব গুণাবলী তাঁর থাকা উচিত এবং রাজার প্রাত্যহিক কর্মসূচি। তাছাড়া কৃষি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ে রাজার কর্তব্য। এর মধ্যে আছে আইনের নিয়মাবলী সংবলিত একটি সম্পূর্ণ অধ্যায়, যার বিষয় হল অপরাধ নির্ধারণ, বণিক ও শ্রমশিল্পীদের ওপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, শাস্তি ও প্রাণদণ্ড এবং অন্যান্য বিবিধ বিষয়। রাজকর্মচারীদের দায়িত্ব ও বেতনের বিষয়েও নির্দেশ দেওয়া আছে। এই পুস্তকে শুধু রাজার কর্তব্য বিষয়ে নয়, মন্ত্রীদের এবং প্রশাসনিক অন্য কর্মচারীদের সম্বন্ধেও বলা হয়েছে।

রাজনীতিবিদ্যা ও শাসনপদ্ধতির যে বিশদ আলোচনা কৌটিল্য করেছেন, তার একটি উদাহরণ ঃ বার্ষিক দেয় বেতনের যে হিসাব তৈরি করা হয়েছে, তাতে রাজপ্রাসাদের নিযুক্ত ব্যক্তিদের বেতন বার্ষিক 48,000 পণ (রৌপ্যমুদ্রা)—(প্রধান পুরোহিত, জ্যেষ্ঠা রানী প্রমুখ ব্যক্তিদের জন্য) থেকে 250 পণ (রাজমন্ত্রীদের জন্য) পর্যন্ত চাকুরি করার সময় ভ্রমণ এবং মৃত্যুজনিত অবস্থায় দেয় অর্থ সহায়তার কথাও বলা হয়েছে।

কৌটিল্য রাজতন্ত্রমূলক শাসন কাঠামোর সময়ের মানুষ; তবু তিনি যথেচ্ছাচারিতা ও একনায়কত্বমূলক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে বলেছেন। রাজার হাতে সর্বাত্মক ক্ষমতা থাকার বিরোধী তিনি। সৎ শাসনকর্তা হতে গেলে রাজার কি কি গুণ থাকা দরকার, তার বর্ণনা দিয়েছেন। প্রজার হিতচিন্তাই যে রাজার মনে সব সময়ে থাকা দরকার, সে কথা বলেছেন। কৌটিল্য বলেছেন যে, কেবলমাত্র ধর্মভীরু মানুষ, যিনি ধর্মপরায়ণ এবং লালসা, ক্রোধ ও লোভ থেকে মুক্ত তিনিই রাজার আসনে বসার উপযুক্ত। রাজাকে আদর্শ চরিত্র হতে হবে, স্বভাবে নম্র ও অহিংস, অন্যের স্ত্রী ও সম্পত্তির প্রতি তাঁর লোলুপ দৃষ্টি থাকবে না লোভী ও অসৎ মানুষের সান্নিধ্য থেকে তিনি দূরে থাকবেন।

রাজার জীবন কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ। তাঁকে শিক্ষালাভ করতে হবে। তাঁকে অর্থব্যয় করতে হবে যাতে তাঁর প্রজারাও শিক্ষিত হতে পারে। উন্নতি লাভ করতে হলে রাজা ও প্রজা—উভয়কেই শিক্ষিত ও জ্ঞানী হতে হবে। রাজাকে জানতে হবে তাঁর প্রজাদের প্রয়োজনের কথা, রাজা হবেন সাহসী ও নির্ভীক। তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত

নেবেন এবং সেইভাবে কাজ করবেন। অর্থশাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে রাজার দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক ঘন্টার কর্মসূচি।

অর্থশাস্ত্রের নিয়মে রাজার বেতন নির্দিষ্ট থাকবে। তিনি ইচ্ছামত রাজকোষ থেকে টাকা নিতে পারবেন না। রাজপরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তিরই একটি নির্দিষ্ট বৃত্য বা বৃত্তি থাকবে যার বেশি মুদ্রা প্রয়োজনেও নেওয়া যাবে না; একমাত্র কাউন্সিল বা মন্ত্রীসভা প্রয়োজন বিবেচনা করে সম্মতি দিতে পারে। অক্ষম, বৃদ্ধ ও শিশুদের প্রয়োজনের দিকে রাজাকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। সে সময় রাজা শব্দে গূঢ়ার্থ ছিল এই যে, রাজার কোন ঐশ্বরিক শক্তি নেই বা রাজপদের দাবিও স্বতঃসিদ্ধ নয়। রাজাকে নির্বাচিত হতে হবে সাধারণ মানুষের হাতে, তাদের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য তাঁকে সজাগ থাকতে হবে।

মন্ত্রীদের এবং ক্ষমতাশালী রাজকর্মচারীদের গুণাবলী কি হওয়া প্রয়োজনীয়, তারও নির্দেশ দেওয়া রয়েছে। তার মধ্যে ধর্ম ও কর্তব্যমুখী দৃষ্টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একথা বলা হয়েছে যে, মন্ত্রীসভায় আটজনের বেশি লোক থাকবে না। নিরাপত্তার কথা যেমন ভাবা হয়েছে, তেমনি বলা হয়েছে পরিচয়সূচক চিহ্নের কথা। মন্ত্রীদের রত্নী নামেও অভিহিত করা হত এবং প্রত্যেক মন্ত্রীকে একটি স্বতন্ত্র রত্ন দেওয়া হত যার দ্বারা তাঁর পরিচয় নির্দিষ্ট হত। মন্ত্রীসভার কাজকর্ম সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেওয়া ও সংবাদ সংগ্রহ করা, কয়া বা রেকর্ডস (যারা রেকর্ডস রাখত তাদের কায়স্থ বলা হত) ঠিক আছে কিনা তার তত্ত্বাবধান করা, কোন একটি পদের কর্মচারীকে তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে অন্যত্র দেওয়া; উপস্থিতির খাতা, জনকল্যাণমূলক কাজের হিসাব, বেতন ও পদোন্নতি, শাস্তি ও আইন ও শৃঙ্খলা প্রভৃতি বিষয়গুলির ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

রাজাকে পরামর্শ দেবে তাঁর মন্ত্রীপরিষদ। তখন মন্ত্রীর কাজ ছিল শুধু পরামর্শ দেওয়া, সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার তাঁর ছিল না। কার্য নির্বাহক কর্মচারীকে বলা হত সচিব, যাঁর অধীনে একজন অমাত্য—এখনকার দিনে সেক্রেটারী ও ডেপুটি সেক্রেটারীর মতো।

পৌর প্রশাসন কি কি বিষয় দেখবে সে সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা দিয়েছেন কৌটিল্য। কতগুলি বিভাগ তার থাকবে; কতগুলি কমিটি তৈরি হবে, প্রত্যেক কমিটিতে কতগুলি সদস্য নিতে হবে। যখন মন্ত্রীদের অথবা উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের অতিরিক্ত করতে হত তখন তাদের ক্ষতিপূরণ যোগ্য ভাতা কত হবে (বেতনের তিনগুণ তাদের দেওয়া হত) তাও ঠিক করে দিয়েছেন কৌটিল্য। কর্মচারীদের বেতনের কথা ছাড়াও কৌটিল্য স্থায়ী বা অস্থায়ী কাজ, প্রোমোশন দেওয়ার ক্ষেত্রে সিনিয়রিটি বিচার, মন্ত্রী ও সরকারী কর্মচারীর শিক্ষাগত গুণ কি থাকা উচিত,

এগুলি নিয়ে যেমন বলেছেন, তেমনি কার্যনির্বাহক সমিতি ও বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার কথাও বলেছেন। একটি স্বতন্ত্র পদ ছিল পণ্ডিতের জন্য যিনি শাস্ত্রবচনের ব্যাখ্যা দেবেন; সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতিকে স্বাধীনভাবে থাকতে দিতে হবে, রাজা বা কার্যনির্বাহক সমিতির কোন প্রভাব তাঁদের ওপর থাকবে না।

মন্ত্রী পরিষদের সভা কিভাবে হবে?

কৌটিল্য বলেছেন যে, যেসব মন্ত্রীরা উপস্থিত থাকতে পারবেন না, তাঁদের চিঠি লিখে ছুটি নিতে হবে। উপরন্তু সভায় আলোচ্য বিষয়ের ওপরে তাঁদের মন্তব্য জুড়ে দিতে হবে।

দুর্নীতি নিবারণ ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্তদের শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা অর্থশাস্ত্রে দেওয়া আছে, যদিও দুর্নীতিকে চিহ্নিত করা শক্ত একথা বলা আছে।

অর্থশাস্ত্রে প্রায় চল্লিশ প্রকার জালিয়াতি বা অর্থ আত্মসাৎ করার বিবরণ দেওয়া হয়েছে ঃ

যা আদায় করা-হয়েছে, তা দেখানো হয়েছে পরে।
যা পরে আদায় হয়েছে, তা আগেই খাতায় লেখা হয়েছে।
যা আদায় হওয়া উচিত ছিল, তা হয়নি।
যা আদায় হওয়া শক্ত, তা দেখানো হয়েছে আদায়ের খাতায়।
যা সংগ্রহ করা গিয়েছে, তা পাওয়া যায়নি বলে দেখানো হয়েছে।
যা আংশিক পাওয়া গিয়েছে, তার পুরোটাই পাওয়া গিয়েছে বলে লেখা হয়েছে।
যা পুরোটাই পাওয়া গিয়েছে, তার কিছুটা পাওয়া গেছে বলে লেখা হয়েছে।
এক ধরনের বস্তু সংগ্রহ করার পর লেখা হয়েছে অন্য জাতের বস্তুর নাম; যেমন চাল পাওয়া গেলে লেখা হয়েছে ডাল।
একজনের কাছ থেকে যা পাওয়া গেল, তা আরেক জনের নামে দেখানো হল।
যা দিয়ে দেওয়ার কথা, তা না দেওয়া।
যা দেওয়ার কথা নয়, তা দেওয়া হয়েছে।
সময় মতো না দেওয়া বা অসময়ে দেওয়া; সামান্য উপহারকে বড় করে দেওয়া।
জিনিসের দাম বাড়িয়ে দেখানো .... ইত্যাদি।

জলের মধ্যে যখন মাছ ঘোবাফেরা করে, তখন তার জল খাওয়া না খাওয়া যেমন বোঝা যায় না, তেমনি সরকারী কর্মচারী কাজে যখন ডুবে থাকে তখন তারা নিজেদের জন্য টাকা নিচ্ছে কি না তা বোঝা যায় না।[4]

অর্থশাস্ত্র মানে মানুষের জীবনযাপনের অর্থনীতির বিজ্ঞান। সে সময়ের প্রশাসন ব্যবস্থার বেশির ভাগ অংশই ছিল রাজস্ব আদায় এবং কর আদায় করা। যা সাধারণ মানুষের কল্যাণের কাজে নিয়োজিত হত। মৌর্য যুগে (321-185 বি.সি.) বেশির ভাগ মানুষই কৃষি নির্ভর ছিল। জমির খাজনাই ছিল রাজ্যের উপার্জনের পথ। রাজস্ব আদায় হত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বস্তুর বিনিময়ে। তার জন্য শস্য ভাণ্ডার,

পণ্য রাখার গুদামঘর প্রভৃতি থাকত, সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হত। সতর্কতায় ফাঁক থাকলে দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়া হ'ত।

কৌটিল্য বিশেষভাবে চিন্তা করেছেন কোষ বা ধনাগারের বিষয়ে। ধনের অভাব হলে উৎপাদন বাড়ানো যায় না, নতুন ভূখণ্ড পাওয়াও সম্ভব হয় না। রাজার প্রতি নির্দেশ—সৈন্যবাহিনী ও ধনাগার তিনি নিজের কর্তৃত্বে ও নিয়ন্ত্রণে রাখবেন। রাজার মৃত্যু হলে যথেষ্ট সাবধানতা দরকার যাতে ঐ দুটি জিনিস অর্থাৎ সৈন্য ও কোষ বিশ্বাসভাজন লোকের হাতে থাকে। অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, রাজ্যের আর্থিক ক্ষতি হলে ক্ষতির জন্য দায়ী ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হত—প্রথম তাকে ক্ষতির অর্থ পূর্ণ করে দিতে হত, ক্ষতির পরিমাণের দ্বিগুণ বা আরও বেশি অর্থ দিয়ে এবং অতিরিক্ত জরিমানাও দিতে হত। যে সব ব্যক্তির নিষ্কর ভূমি ছিল না, তাদের দিকেও দৃষ্টি রাখা হত এবং করমুক্ত স্থানে তাদের যেতে দেওয়া হত না। সরকারী অর্থের অপব্যয় ও মিথ্যা হিসাব দেওয়ার জন্য কঠিন শাস্তি দেওয়া হত।

আমাদের দেশেই লেখা বই হিসাবে অর্থশাস্ত্র অত্যন্ত মূল্যবান; সে সময়ের প্রশাসকদের কাছে বইটি দিকনির্দেশক ছিল। বইটিকে একটি বিস্ময় বলা যেতে পারে কারণ যুগের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে ছিল তার বিশ্লেষণ। বইটি পড়ে বোঝা যায় যে, তখনকার মানুষের চরিত্র এখনকার চেয়ে খুব বেশি পৃথক ছিল না। এখনকার মতো তখনও সমাজের প্রয়োজন ছিল একটি দৃঢ় প্রশাসন ও বিচার বিভাগের। শাসকরূপে শক্তিশালী ও সবল ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন হত, যাকে কাজ করতে হত সাধারণের প্রতিনিধি জ্ঞানী মানুষের উপদেশ অনুসারে।

কৌটিল্যের শিক্ষার একটি সর্বজনীন ও চিরন্তন মূল্য রয়েছে। এখনকার শাসন পদ্ধতির অনেক কিছু উপাদান তাঁর চিন্তার মধ্যেই পাওয়া যায়। শাসক ও শাসিত, বৈদেশিক নীতি ও বিচার বিভাগের গঠন সম্পর্কে কৌটিল্যের চিন্তাধারা আদর্শ প্রশাসনের ছবিকেই তুলে ধরে, কিন্তু এই চিন্তাধারা থেকেই বোঝা যায় যে, তাঁর এমন একটি মন ছিল, যা মানুষের ব্যবহারিক চরিত্র ও ঘটনার সংঘাত সম্বন্ধে ধারণা করতে পারত। কমবেশি যারা তাঁর গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছেন, তাঁরা বলেন যে, তাঁর বিশ্লেষণের মধ্যে যুক্তি রয়েছে, তাঁর সিদ্ধান্ত পরিমিত ও সুষম। কৌটিল্য বলেছেন, তাঁর সূত্র ও নির্দেশগুলি পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে মার্জিত করে নেওয়া যাবে। আধুনিক ম্যানেজমেন্টে আমরা বলে থাকি, দুই আর দুইয়ে সব সময়ই চার হয় না। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত নিতে হবে পূর্বসূত্রের প্রসঙ্গ ধরে।

কৌটিল্যের মনে মানবিকতার বোধ কেমন ছিল, দেখা যাক—তিনি বলেছেন, ঘটনা বিচার করে শাস্তির লাঘব করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, সাধারণ মানুষের বিচরণযোগ্য উদ্যানে বৃক্ষচ্ছেদন করা অনুচিত (পরিবেশ রক্ষা)। তিনি

আরও বলেছেন যে, ভোগ্য বস্তুর ক্রেতাদের সুরক্ষার জন্য এবং আমলাতন্ত্রের দুর্নীতিরোধে সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় অতিরিক্ত কর আদায় সম্পর্কে তাঁর অভিমত অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক; এ ধরনের করের ভার সাধারণ মানুষের কাছে সব সময়েই অবাঞ্ছিত।

আঞ্চলিক শাসন পরিচালনা সম্বন্ধে কৌটিল্যের ধারণার ভিত্তি ছিল তাঁর সময়ের ও আরও আগের শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের ওপর। প্রত্যেকটি গ্রামে একজন নির্বাচিত মোড়ল থাকত, সেখানকার জমির খাজনা আদায়ের ভার থাকত তার ওপরেই। সেই হত গ্রামের আইন ও শৃঙ্খলার রক্ষক। পাঁচ থেকে দশটি গ্রাম নিয়ে একটি গপ (পঞ্চায়েত)। এমন কয়েকটি গপ বা পঞ্চায়েত তত্ত্বাবধানের ভার থাকত যাঁর ওপরে তাঁকে বলা হত স্থানিক (সমূহপতি)। স্থানিকের ওপরের তলার কর্মচারী হলেন নাগরিক। কয়েকজন নাগরিক-এর কাজ পরিচালনা করতেন একজন জেলাশাসক, যাঁকে বলা হত সমাহর্তা।

কৌটিল্যের চিন্তা এইরূপ ছিল যে, প্রত্যেকটি গ্রামে অন্তত 400টি গৃহ থাকবে এবং গৃহগুলিতে কৃষিকাজের জন্য যথেষ্ট কৃষক ও মজুর থাকবে। একটি গ্রাম থেকে আর একটি গ্রামের দূরত্ব দুই থেকে চার মাইলের বেশি হবে না। তিনি স্থানিকের কাজের এলাকাও স্থির করে দিয়েছিলেন এবং জমির তালিকা বা নথি রাখার গুরুত্বের প্রতি জোর দিয়েছিলেন।

অশোকের সময়ে

অশোক সম্রাট হয়ে বসেছেন খ্রীস্টের জন্মের 268 বছর আগে। একমাত্র কলিঙ্গ (উড়িষ্যা) ছাড়া প্রায় সমস্ত দেশই ছিল তাঁর অধীনে। তিনি কলিঙ্গ আক্রমণ করলে প্রচণ্ড যুদ্ধ বাধে, যে যুদ্ধে হাজার হাজার মানুষ মারা যায়। মৃত্যুর হাহাকার তাঁকে এতই ব্যথিত ও বিহ্বল করেছিল যে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে, আর কখনও যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন না এবং অন্যকে আঘাত করবেন না। বুদ্ধের অনুসারী হয়ে তিনি অহিংসার ধর্ম গ্রহণ করলেন। তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যে তাঁর বাণী ছড়িয়ে দিতে, তাঁর উপদেশ তিনি পাথরের ফলকে খোদিত করালেন সাধারণের কথ্য ভাষায়। এই ফলকগুলিকে দেশের বিভিন্ন অংশে নিয়ে গিয়ে রাখা হল যাতে সকল মানুষের চোখে পড়ে। এগুলিই হল তাঁর বিখ্যাত নির্দেশগুলি, তাঁর বাণী যা মানুষকে বলে এসেছে, মানুষকে দয়া করো, সত্যকথা বলো আর হিংসা থেকে নিরত হও। কি দূরদর্শী রাজা ছিলেন অশোক, তিনি শুধু তাঁর সময়ের মানুষের কাছেই যে বলেছেন তা নয়, দূরস্থায়ী পাথরের মাধ্যমে তাঁর বাণীকে পাঠিয়ে দিয়েছেন ভবিষ্যৎ যুগের কাছেও। আমাদের প্রজাতন্ত্র ভারতের প্রতীক হল সারনাথ স্তূপের অনুযায়ী বসে

থাকা চারটি সিংহ, আমাদের জাতীয় পতাকার মধ্যস্থলে রয়েছে চক্র—বুদ্ধ যে নিয়মের শিক্ষা দিতেন তারই প্রতীক, অশোকের সময়ে যার সৃষ্টি।

দক্ষিণ ভারতের অবস্থা

যিশু খ্রীস্টের জন্মের আগের শেষ শতকে এবং প্রথম শতাব্দীর শুরুতে দক্ষিণ ভারতে কয়েকজন রাজার আবির্ভাব, তাঁরা হলেন শতবাহন, চোল বংশ, চের ও পাণ্ড্য। সেই সময়ের সঙ্গম সাহিত্য যার উপাদান ছিল কাব্য গাথা, ঐ সময়ের কিছু ঘটনাকে আমাদের সামনে এনে দিয়েছে। দক্ষিণের রাজ্যগুলি রাজতন্ত্রের রূপ নিয়েছিল আর রাজ্যের অর্থাগমের জন্য কর বসানো ছিল তাদের প্রথা। বাণিজ্যের জন্য নতুন নতুন পথ খুলে দিয়ে তারা ব্যবসা বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে সচেষ্ট ছিল।

> রাজনৈতিক অবস্থার ওঠা পড়ার মাঝ দিয়ে সুঙ্গর, শতবাহন রাজকুল, ইন্দোগ্রীক, শক, কুশান, চের ও চোল বংশীয়রা পণ্য বাণিজ্যের ধারাকে অব্যাহত রেখেছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের চেষ্টায় যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠলে এবং প্রশাসনের একটি নির্দিষ্ট রূপ তৈরি হলে এই উপমহাদেশ উন্মুক্ত হয়ে যায়।[5]

78 খ্রীস্টাব্দ এবং তারপর

78 খ্রীস্টাব্দে শক যুগের আরম্ভ বলে মনে করা হয়। 78 থেকে 144 খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে কুশান রাজা কণিষ্ক সিংহাসনে বসেন। চীনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। গুজরাট ও উড়িষ্যা থেকে উদ্যমী বণিকেরা সমুদ্র পথে পৌঁছেছেন জাভা (যবদ্বীপ), মালয়, বোর্ণিয়ো, সুমাত্রা প্রভৃতি স্থানে। কনিষ্ক সকল ধর্ম ও ধর্মমতকে শ্রদ্ধা করতেন। বৌদ্ধ সাহিত্যের উন্নতির জন্য ও সাংস্কৃতিক বিকাশে তাঁর উল্লেখ্য দান।

গুপ্তযুগ

320 খ্রীস্টাব্দে চন্দ্রগুপ্তের সময়ে গুপ্ত যুগের আরম্ভ বলে মনে করা হয়। অত্যন্ত গৌরবময় ছিল এই যুগের প্রশাসন; সমাজে স্থিরতা ছিল, নারীকে সম্মানের আসন দেওয়া হয়েছিল, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন ভেদরেখা ছিল না।

চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্ত সিংহাসনে বসেন 335 খ্রীস্টাব্দে। দেশ জয় ও যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও তিনি প্রশাসনের উন্নতির দিকে মন দিয়েছিলেন। যেমন, তিনিই প্রথম সরকারের পরিচালিত চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন করেন এবং হিন্দুধর্ম ও স্মৃতির নির্দেশ অনুসারে ন্যায় বিচারের ব্যবস্থাকে নতুন করে রূপ দেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন 380 খ্রীঃ থেকে 413 খ্রীঃ অবধি। এই সময়টাকে পুনরুজ্জীবনের স্বর্ণযুগ বলা হয়। তাঁর আর একটি নাম ছিল

বিক্রমাদিত্য। তাঁর সভায় যে সব গুণী ব্যক্তির সমাবেশ ঘটেছিল, তার মধ্যে ছিলেন অমর কবি কালিদাস, রাজ-পোষকতায় এই সময়ে কতকগুলি পুরাণ ও মনুসংহিতা রচিত হয়। খ্যাতনামা গাণিতিক, জ্যোতির্বিদ ও জ্যোতিষীর আবির্ভাব এই যুগে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত ও বরাহমিহির। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্পর্কিত মতবাদের সৃষ্টি এই সময়েই; অঙ্কের দশমাংশও এই যুগেই আবিষ্কৃত।

হিন্দু রাজাদের মধ্যে শেষ উল্লেখযোগ্য নৃপতি হলেন হর্ষবর্ধন। তিনি সিংহাসনে বসেন 600 খ্রীস্টাব্দে। তিনি দয়ালু ছিলেন তাঁর শাসনকালও ছিল শান্তিপূর্ণ। প্রজাদের কর দিতে হত সামান্যই। রাজা অবিশ্রান্ত গতিতে প্রজাদের হিতের জন্য কাজ করতেন। তাঁর সাম্রাজ্যের সর্বত্র তাঁর যাতায়াত ছিল, সাধারণ মানুষের অভিযোগ শুনতেন, এবং যুবরাজ ও উপদেষ্টাদের সহায়তায় প্রশাসনকে ভাল করে তুলতে চেষ্টা করতেন।

এই যুগে গ্রাম্যস্তরে আঞ্চলিক স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতেন গ্রামের মোড়ল ও বয়স্ক ব্যক্তিরা। শহরে গ্রামের জনপরিষদের অনুরূপ নগরসভা, যার সভাপতি ছাড়া ব্যবসায়ী সভা ও কারুশিল্পীদের মধ্যে থেকে প্রতিনিধি এবং মুখ্য লিপিকার থাকত। প্রত্যেকটি দেশ (বা ভুক্তি) যার শীর্ষে থাকতেন একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী (কুমারঅমাত্য), বিভক্ত হত কয়েকটি প্রদেশে যার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে বলা হয় আয়ুক্ত। জমির ওপরে এবং জমির উৎপাদনের ওপর খাজনা নেওয়া হত, আর সেটাই ছিল রাষ্ট্রের মুখ্য আয়।

দক্ষিণ ভারতে প্রশাসন ব্যবস্থার চিত্র

ষষ্ঠ শতাব্দীতে শাসন ক্ষমতায় ছিলেন কাঞ্চীপুরমের পল্লবরা, বাদামির চালুক্যরা এবং মাদুরাইয়ের পাণ্ড্যয়নরা। তারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল—বিশেষ করে পল্লব ও চালুক্যদের নৌবহর ছিল উল্লেখ্য, তাদের বাণিজ্যপোত বিদেশ যাওয়া আসা করত। চালুক্যদের দ্বিতীয় পুলোকেশী এতই শক্তিশালী ছিল যে, হর্ষবর্ধন তার কাছে পরাজিত হয়ে তাঁর নিজের রাজ্যে ফিরে যেতে বাধ্য হন।

পল্লবরা তিনশো বছর রাজত্ব করেছিল। তাদের সময়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্থান বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। মহাবলীপুরমের বিখ্যাত বিখ্যাত পাহাড়-মন্দির তারাই তৈরি করেছিল। তাদের শাসন পদ্ধতিতে রাজতন্ত্রই স্থান পেয়েছিল। রাজাকে সাহায্য করতে একটি মন্ত্রীসভা থাকত।

1026 খ্রীস্টাব্দ অবধি সময়ের মধ্যে বিভিন্ন রাজবংশের আবির্ভাব দেখা যায়। চালুক্যরা এসে পরাজিত করল পল্লবদের কিন্তু তারাও বিধ্বস্ত হয়ে গেল রাষ্ট্রকূটদের হাতে।

এই সময়েই চোল বংশের আবির্ভাব; রাজা রজরাজা (985-1014 খ্রীঃ) এবং তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী রাজেন্দ্র চোল এই সময়েই রাজত্ব করেন। 50 বছরের মধ্যে তারা তাদের শক্তিকে সংগঠিত করল। তাদের শাসন সময়ে রাজ্যকে তারা কতকগুলি প্রদেশে (বা মণ্ডলম্) ভাগ করল, প্রত্যেকটি মণ্ডলকে আবার জেলাতে ভাগ করা হল, এবং সবশেষে কতকগুলি গ্রাম নিয়ে একটি ইউনিট। প্রশাসন ক্ষেত্র ছিল গ্রাম, গ্রামগুলিতে তিন ধরনের সাধারণ পরিষদ স্থাপিত হয়। পরিষদে থাকতো স্থানীয় অধিবাসীরা যাদের উর বলা হয়েছে। সম্ভবত এই উর শব্দ থেকেই কর্ণাটকের উরস্ পদবি এসেছে। তারা ছিল করদাতা। সভায় থাকত ব্রাহ্মণরা, যে সব গ্রাম তারা দান স্বরূপ পেয়েছে সেই সব গ্রাম থেকে। আর থাকত ব্যবসাকেন্দ্রে ও শহরে 'নগরম'। স্থানীয় সভা সভ্যদের গুণাবলী ও যোগ্যতার মান (তারা সৎ ও নিষ্পাপ ইত্যাদি) স্থির করত, এবং ভেরি বাজিয়ে মন্দিরে সমবেত হত। তারা হয় সংঘের অধিকারভুক্ত গৃহে অথবা স্বতন্ত্র ভাড়াটিয়া হিসাবে থাকত। নিয়ম করে খাজনা দিতে হত।

ভূমিহীন কৃষিশ্রমিকরা সভায় বা পরিষদে যেতে পারত না। জমির খাজনাই ছিল রাজ্যের অর্থাগমের সবচেয়ে বড় উপায়। তার সঙ্গে যুক্ত হত, খনি, জঙ্গল এবং লবণের জন্য দেয় খাজনা, বৃত্তি ও বাণিজ্যের ওপর শুল্ক, বিচার বিভাগ থেকে পাওয়া জরিমানার টাকা এবং খাটানো শ্রমিকের সমমূল্য মাঝে মাঝে জমি জরিপ করে কর বা খাজনার পরিমাণ স্থির করা হত।

শহরবাসী নগরম্‌রা ছিল বিত্তশালী; তারা ছিল বর্ধিষ্ণু স্থানীয় বাজার ও বহির্বাণিজ্যের অংশ। কিছু কিছু ব্যবসায়ী সংস্থা ছিল অত্যন্ত ধনী। আবার কতকগুলি মন্দির ছিল বড় বড় প্রতিষ্ঠানের মতো। অনুদান ও ভক্তদের দেওয়া অর্থই ছিল মন্দিরগুলির মুখ্য আয়। ঐ মন্দিরগুলি থেকে আবার বড় বড় ব্যবসায়ী সংস্থাকে অর্থ ঋণ দেওয়া হত।

প্রাক্ মোগল যুগের প্রশাসন ব্যবস্থা

1206 খ্রীস্টাব্দে মোহাম্মদ ঘোরীর এক ক্রীতদাস কুতবুদ্দিন আইবক দিল্লীর তক্তে সুলতান হয়ে বসলেন। তারপরের 300 বছর ধরে সুলতান-শাসন চলেছে ভারতবর্ষে; খিলজি, তুঘলক, সয়ীদ, লোদি বংশ। সমসাময়িক কালের অন্য রাজারা এদেরই ছায়ায় মিশে গিয়েছিল।

একথা বলা যায় যে, মোগল শাসন পদ্ধতির মূল বিষয়গুলি আগের যুগে প্রচলিত পদ্ধতির অনুসরণ, বিশেষভাবে সুলতানদের আমলে যে ধরনের শাসন ব্যবস্থা ছিল তার থেকেই গ্রহণ করা হয়েছিল মূল রীতিগুলি। আকবর যা করেছেন তা

হল—কোথাও একটা চাকা বসানো, আর এক জায়গায় লিভার লাগানো।[6] সুলতান বা সরকারী কাজে ইসলামিক রীতিনীতিকেই অনুসরণ করেছে। তারা দেশকে ভাগ করেছিল প্রদেশ (বা সুবা), জেলা (সরকার), মহকুমা (পরগণা) এবং গ্রামে।

কৃষিজাত পণ্যের রাজস্বই ছিল রাজ্যের অর্থাগমের সবচেয়ে বড় উৎস। সবসুদ্ধ প্রায় চার ধরনের কর নেওয়া হত (1) কৃষিজাত পণ্যে (2) অমুসলমানদের কাছ থেকে (জিজিয়া কর) (3) অবিশ্বাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে যা লুঠ করা হত তার এক পঞ্চমাংশ (4) মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য তাদের কাছ থেকে প্রদেশের শাসনকর্তা মুক্তি (Muqti) কর আদায় করত। মুক্তির সহকারীরা তাকে কর নির্ধারণ ও আদায়ে সহায়তা দিত। রাজার প্রত্যক্ষ শাসনেও জমি থাকত, তার আয় থেকে অন্যদের পুরস্কার বা বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা থাকত। এই জমি দেখাশোনার ভার একটি রেভিনিউ বিভাগের হাতে থাকে। জমি বণ্টন ব্যবস্থাকে ইকতা বলা হত। মুক্তি অর্থাৎ প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও ইকতার (বা জমি বণ্টনের ভার যাদের হাতে) মালিকের হাতে ভার থাকত রাজস্ব এবং সৈন্য সংগ্রহের।

আলাউদ্দিন খিলজির শাসনকালে (1296-1316) দান বা অনুদান, বৃত্তি, পেনশন, ধর্মীয় কাজে দান বা মালিকানার অধিকার—সব বাতিল করা হয়েছিল। আলাউদ্দিনের নীতি ছিল সামরিক শক্তি গড়ে তোলা, জমির খাজনা আদায়ের পদ্ধতিকে নির্ভুল করা, শস্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা। কর ধার্য করার ব্যবস্থাকে নতুন করে পরিমাপ করানো হয়েছে, যাতে কোন শৈথিল্য না থাকে। জমির বণ্টন ব্যবস্থার মালিকেরা শক্তিশালী হবে, আলাউদ্দিন তাও চায়নি।

উজির বা মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব ছিল সরকারী প্রশাসনের কর্মচারীদের কাজের তত্ত্বাবধান করা, রাজস্ব আদায়ের প্রতি লক্ষ রাখা, এবং ব্যয় ও অন্যান্য হিসাবের ধারা পর্যবেক্ষণের মধ্যে রাখা। সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের কর্তা ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁকে সাহায্য করবার জন্য তিনজন মন্ত্রী; চারজনে একত্রে স্টেট নামক সৌধের চারটি স্তম্ভ। তাঁরা সামরিক বিভাগের দায়িত্ব নিতেন, আন্তঃপ্রদেশ সম্বন্ধ রক্ষা করতেন এবং আদালতের কাজেও লক্ষ রাখতেন। রাজ্যের বিভিন্ন অংশে তাঁদের সংবাদ সরবরাহকারী লোক থাকত। খাজনা স্থির করা ও আদায়ের ব্যাপারে যাঁরা কৃষকদের কাছাকাছি থাকতেন, তাঁদের পরগণায় যেতে হত। এঁদের হাতে লোক থাকত যাঁরা উৎপন্ন শস্যের ও খাজনার পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারত, থাকতো খাজনা আদায়ের জন্য মুন্সিফ। গ্রাম ভিত্তিক ইউনিটে একজন কর্তা ব্যক্তি, পাটোয়ারি (বা একাউন্ট্যান্ট ও রেজিস্ট্রার বা চৌধুরী) থাকত। শহরগুলি ওয়ার্ডে বিভক্ত হত। শহরের দেখাশোনা করতেন দুজন কর্মচারী যাঁদের ওপরে ছিলেন মুখ্য নগর-প্রশাসক।

সুলতান শাসকদের বিচার পদ্ধতিও মোগলদের বিচার বিভাগীয় নীতির ভিত্তিস্বরূপ ছিল। সুলতানই ছিলেন শান্তিরক্ষকদের মধ্যে প্রধান। তিনি দিওয়ানি-কাদার মাধ্যমে ন্যায়বিচার পরিবেশন করতেন। পুরো আইনি-বিভাগ ও ধর্ম সম্বন্ধীয় কার্যনির্বাহ পরিচালনার ভার তাঁর হাতেই থাকত। প্রত্যেক শহরেই গোলমাল মেটানোর জন্য একজন কাজি থাকতেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ বিতণ্ডা মেটাবার ভার ছিল পঞ্চায়েতের হাতে। সুলতানরা ন্যায়বিচারের ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। কথিত আছে, কুতবুদ্দিন আইবকের শাসন এত প্রখর ছিল এবং এত পক্ষপাতশূন্য ছিল তাঁর বিচার ব্যবস্থা যে, বাঘে ও ভেড়াতে একই পুকুরে জলপান করত, এবং চোর বা চুরি উল্লেখ কোথাও ছিল না।[7]

ফিরোজ শাহ্ তুঘলক সুলতান হলেন 1357 সালে। তিনি পুকুর খুঁড়িয়েছেন, সেতু তৈরি করেছেন, এবং স্কুল ও কলেজ স্থাপন করেছেন। তাঁর নির্দেশে অনেক সংস্কৃত বই ফারসি ও আরবি ভাষায় অনুবাদিত হয়।

লোদি বংশের শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদির ব্যবহারে তাঁর পারিষদ বর্গের অনেকে তাঁর শত্রু হয়ে যায়। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এক আফগান সর্দার বাবরের কাছে আবেদন করলেন লোদিকে সরিয়ে দিতে তাঁদের সাহায্য করার জন্য। 1526 খ্রীস্টাব্দে পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে মোগল শাসন স্থাপন করলেন। ফল হল এই যে, দিল্লিতে মোগল রাজবংশ স্থাপিত হল। অল্প কিছুদিনের জন্য মাত্র (1540-1545 খ্রীঃ) শের শাহ্ তাঁর ক্ষমতার জোরে মোগল লাইনকে বিচ্ছিন্ন করে সম্রাট হয়েছিলেন।

মোগলদের শাসন পদ্ধতি

1526 সালে বাবরের ভারত আক্রমণ ও জয়ের সময় থেকে 1707 সালে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত সময়কে মোগল যুগ হিসাবে গণনা করা হয়। শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ ভারতে ব্রিটিশ আক্রমণের প্রথম যুগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ব্রহ্মদেশে নির্বাসনে তাঁর মৃত্যু ঘটে। কিন্তু মোগল যুগের সমাপ্তি আওরঙ্গজেবের সঙ্গেই। যে 200 বছর মোগলরা রাজত্ব করেছে, তার মধ্যে তারা একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার বুনিয়াদ গেঁথে দিয়েছে, যার ওপর ব্রিটিশ আরও কিছু যোগ করেছে।

1540 থেকে 1545 খ্রীঃ এই অল্প কয়েক বছর মাত্র শাসন কর্তৃত্বে ছিলেন শের শাহ্। তিনি তৈরি করেছিলেন প্রশাসনিক ব্যবস্থার একটি নক্সা। যা থেকে আকবর ও তাঁর মন্ত্রীরা পরবর্তীকালে উপকৃত হয়েছেন।[1]

> শের শাহ্ তাঁর স্টেটের প্রত্যেকটি বিভাগকে আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে সংস্কার করেছেন, আরও ভালো করে সাজিয়েছেন, এবং নিখুঁতভাবে গড়েছেন। তাঁর উত্তরাধিকারীদের হাতে তিনি দিয়ে গিয়েছেন একটি সুসংগঠিত প্রশাসনিক কাঠামোর সম্পত্তি; একটি স্থায়ী ও সৎ গভর্নমেন্টের অত্যাবশ্যক যে শর্তগুলি—যেমন ন্যায়পরায়ণ ও সহনশীল নীতির ঐতিহ্য, তিনি পূর্ণ করে গিয়েছেন তাঁর পরবর্তী কালের জন্য।[2]

আমিল বা খাজনা আদায়কারী কর্মচারীদের দু'বছর অন্তর বদলি করার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন শের শাহ্। যাতে তারা কোন কায়েমী স্বার্থ গড়ে তুলতে না পারে। কার্যধারা সম্পর্কে নীতি গড়ার বিষয় সম্রাট নিজে দেখতেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল প্রদেশের প্রয়োজন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়ার। নিয়মিত সর্বত্র ঘুরে ঘুরে শের শাহ তাঁর সাম্রাজ্যের সমস্ত অংশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন।

সম্রাটদের মধ্যে যিনি দাবি করতে পারেন যে, তিনি কার্যনির্বাহ, বিচার ও ধর্মীয় কাজে সক্রিয়ভাবে শৃঙ্খলা ও নিয়ম প্রবর্তনের জন্য চেষ্টা করেছিলেন, তিনি হলেন আকবর। তাঁর রাজত্বকালের দীর্ঘ সময়সীমা (1556-1605 খ্রীঃ) তাঁকে এই সুবিধা দিয়েছিল।

আকবরের ছিল রাজোচিত দৃষ্টিভঙ্গি। আইনের দিক থেকে কড়া অথচ উদার। প্রশাসনের সব দিকেই তাঁর জ্ঞান। তাঁর নেতৃত্বে ছিল চুম্বকের মতো আকর্ষণ শক্তি, তাঁর পরিকল্পনা তাঁর কর্মীর দলকে প্রেরণা দিত কাজের মধ্যে। তিনি শিক্ষিত ও রুচিবান মানুষকে তাঁর দেওয়ান মনোনীত করতেন, কিন্তু তাদের মধ্যে প্রায়ই পরিবর্তন ঘটাতেন, যাতে কেউ বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠতে না পারে।

মনসবদারি প্রথা

মোগলদের শাসনকালে রাজ্যের প্রত্যেকটি কাজের কেন্দ্রে থাকতেন সম্রাট। তাঁরা প্রশাসনের কাজে কিছু সম্ভ্রান্ত পদ সৃষ্টি করেছিলেন, যাদের বলা হত মনসবদার। কিন্তু তাঁদের পদ ও মর্যাদার স্থায়িত্ব না রাখাই ছিল রীতি। তার ফলে তারা সম্রাটের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকত। একমাত্র সম্রাটই পারতেন কাউকে মনসব দিতে, বা কমাতে বাড়াতে। মনসব হল কর্মচারীদের জাগীর ভোগ করার অধিকার। জাগীর শব্দের অর্থ হল খাজনার অংশ দেওয়া; অর্থাৎ বেতনের পরিবর্তে আদায় করা খাজনার একটি নির্দিষ্ট অংশ ভোগ করতে পারা। জাগীরদারি প্রথায় কৃষকের জমির স্বত্ব নষ্ট হত না; জমিদার কিংবা স্বত্বভোগীর অধিকার ক্ষুণ্ণ হত না। জমিদাররা চাষীর কাছ থেকে খাজনা আদায় করতেন, আবার জমিদারদের কাছ থেকে খাজনা নিতেন মনসবদার। প্রায়ই জাগীরের বদল হত। কোন মনসবদারের

মৃত্যু হলে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তির পুরোটাই স্টেটের হাতে চলে যেত। স্টেটের যা পাওনা সেইটুকু কেটে নিয়ে বাকি অংশ ঐ মনসবদারের উত্তরাধিকারীদের ফিরিয়ে দেওয়া হত। মনসবদার পদের ওপর উত্তরাধিকার সূত্রে কোন দাবি কারও থাকত না। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা বেতনও পেতেন নগদ টাকাতে। তাঁদের সমস্ত কাজ ও সময় সম্রাটের জন্য বাঁধা থাকত। অনেকটা বর্তমান কালের সিভিল সার্ভিসের মতো তারা 24 ঘণ্টাই চাকরির রজ্জুতে বাঁধা।

10 জন মানুষের হোক বা 5000 মানুষের হোক সে মনসবদারই, মনসবদারই ছিল সম্রাটের চোখ ও কান। তাঁদের নানা ধরনের কাজ করতে বলা হত। সামরিক বা অসামরিক যেখানে প্রয়োজন দেশের যেকোন প্রান্তে তাদের যেতে হত। তাদেরই হাতে থাকত গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি। দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে তাদের বিশিষ্ট ভূমিকা থাকত। আকবর বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন ধর্মের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের একটি ঐক্যের বন্ধনে এনেছিলেন, যার ফলে তাঁকে কোন একটি দলের ওপর নির্ভর করে থাকতে হত না। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতজ্ঞতা ও অধীনতার পরিধি বুঝিয়ে, সম্রাটের সদিচ্ছার ওপরে যে তাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সেকথা জানতে দিয়ে তাদের বশ্যতা আদায় করতেন সম্রাট। মনসবদারেরা তাদের নিচের পদের লোকেদের খরচে নিজেরা বিলাস ও প্রাচুর্যের জীবনযাপন করত। এই পদ্ধতিতে কাজ চলার ফলে স্বার্থপরতা, কূটকৌশল ও দুর্নীতি দেখা দিত। কৃষকদের শোষণ করে সুবিধাভোগ করত মনসবদারেরা।

আঞ্চলিক বিভাগ

রাজস্ব আদায় ও ন্যায়নিষ্ঠ প্রশাসন পদ্ধতির জন্য আকবর তাঁর সাম্রাজ্যকে সুবিধা-জনক কতকগুলি প্রদেশে ভাগ করেছিলেন। মোট 12টি প্রদেশ বা সুবা, পরে বাড়িয়ে 18টি করা হয়; (আওরঙ্গজেবের সময়ে 20টি)। এগুলিকে আবার সরকার বা জেলায় ও পরগণায় (বা জেলার ভগ্নাংশ) ভাগ করা হয়। কয়েকটি গ্রাম একত্র করে একটি পরগণা।[3]

সুবা ঃ প্রাদেশিক সরকারের প্রশাসন ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসরণেই তৈরি করা হয়েছিল। প্রদেশের শাসনকর্তাকে বলা হত সুবাদার, সম্রাট নিজে সুবাদার নিযুক্ত করতেন। তার কাজ হত সকল ব্যাপারে সর্বময় তত্ত্বাবধান, কার্য নির্বাহক ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা, আইন ও শৃঙ্খলা, অপরাধের বিচার ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন। নিয়োগ পত্রের সঙ্গে থাকত রাজকীয় ফর্মান, এবং একটি নির্দেশপত্র। ঐ পত্রে বিশদভাবে বর্ণনা থাকত তার দায়িত্বের, কর্মপদ্ধতির ও ব্যবহার বিধির। 1715 খ্রীস্টাব্দে হিদায়েতুল্লাহি বিহারী তৈরি করেন হিদায়েৎ উল কাওয়াইদ নামে

একটি নির্দেশ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে সুবাদারের করণীয় কাজ সম্বন্ধে, মধ্যস্থ সালিশী নিয়োগের বিষয়ে ও দান করা প্রভৃতি বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া আছে। সুবাদারকে সাহায্য করতে একজন প্রাদেশিক দেওয়ান নিয়োগের কথাও বলা হয়েছে। দেওয়ানের এলাকা ছিল রাজস্ব আদায়, অসামরিক বিচার ব্যবস্থা প্রভৃতি। কেন্দ্রে তাকে দুবার করে রিপোর্ট পাঠাতে হত, তার সঙ্গে দিতে হত টাকা কড়ির আয় ব্যয়ের হিসাব। দেওয়ানই নিযুক্ত করতেন আমিন, কারোরি ও তহশীলদারকে। তাদের সকলেই রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব বহন করত। তিনিই ছিলেন আমলগুজারদের (সরকারের স্তর) কর্তা; নিচের স্তরের কর সংগ্রাহক কর্মচারী, এবং পাটোয়ারী ও প্যাটেলদের (গ্রামস্তরে) প্রধানও তিনি। প্রাদেশিক স্তরে তিনি রাজস্ব আদায় ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে দায়িত্বশীল, কাজের দিক থেকে তাঁর দায়িত্ব সুবাদারের সমান, যদিও মর্যাদায় তিনি সুবাদারের নিচে।

প্রাদেশিক প্রশাসনে অন্যান্য কর্মচারীরা যারা সুবাদারের সাহায্যকারী, তাঁদের মধ্যে ছিলেন সদর (Sadar), যিনি ধর্মীয় ব্যাপারগুলি দেখতেন, এবং কাজি (বিচার বিভাগের সঙ্গে যুক্ত) যিনি মীরবকসি, তাঁর কাজ ছিল কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সৈন্য সম্বন্ধীয় ব্যাপারে যোগসূত্র রাখা, কোতোয়াল পৌর ব্যাপারে যার দায়িত্ব, মীর বাহর (নৌ সেনাধ্যক্ষ); এবং ওয়াকিয়া (Waqia Nawis) বা রেকর্ড রক্ষক। সুবাদারের সঙ্গে থাকত একজন পেশকার বা ব্যক্তিগত সচিব; একজন অফিস-তত্ত্বাবধায়ক (Office Superintendent) বা দারোগা; হেড ক্লার্ক ও তবিলদার (Treasurer)।

সরকার ঃ প্রশাসনের পরবর্তী স্তরে একজন কার্যনির্বাহক প্রধান (বা ফৌজদার) থাকতেন—যিনি প্রদেশের রক্ষার ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত; তাঁর অতিরিক্ত কাজ ছিল আমিল বা আমলগুজারকে কর আদায়ে সহায়তা দেওয়া। আমিলের কাছে প্রত্যাশা করা হত যে, কৃষকদের সঙ্গে যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখবে, এবং সরকারী কর্মচারীরা যাতে তাদের নিগ্রহ না করতে পারে সেদিকে লক্ষ রাখবে। তার ওপর অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হত কৃষির উন্নয়ন ও উৎপন্ন দ্রব্যের গুণমান ঠিক রাখার জন্য। তাকে মাসিক রিপোর্ট তৈরি করতে হত প্রত্যহ কি পাওয়া গেল, তার ওপরে; আর অনুমোদিত অর্থসীমা ছাড়িয়ে গেলে, উদ্বৃত্ত টাকা কেন্দ্রীয় কোষাগারে পাঠাতে হত। বাজারদর, ভাড়া দেওয়া জমি বা সম্পত্তি ও জাগীরদারদের বিষয়ে তাকে খোঁজখবর নিয়ে জানাতে হত, সাধারণ মানুষের অবস্থা সম্পর্কে তথ্যও তাকে সরবরাহ করতে হত। নিচু স্তরের খাজনা আদায়কারী কর্মচারীদের কাজের তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব তার ওপরেই ছিল।

সদর ও কাজি ধর্মীয় ব্যাপারে অর্থ নির্বাহের দিকটা দেখত। কাজির মুখ্য কাজ ছিল বিচারবিভাগে, এবং মুসলমানদের বিবাহ দেওয়ার ব্যাপারে, সদরকে দেখতে

হত অমুসলমানদের কাছ থেকে জিজিয়া কর সংগ্রহ ও সরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত মসজিদ সমূহের তত্ত্বাবধান।

কোতোয়াল বা কোটালের ছিল শাসন সংক্রান্ত কর্তব্য ও ক্ষমতা। যেমন দুষ্কৃতীদের শাস্তি দেওয়া ও মানুষের অভিযোগ শোনা ও তার ব্যবস্থা করা। শহরের রক্ষাব্যবস্থাও তার কাজের মধ্যে। শহরে কে প্রবেশ করছে, কিংবা শহর থেকে কে বেরিয়ে যাচ্ছে তা দেখবার কাজও তার। পণ্য মজুত করার বিরুদ্ধেও তাকে ব্যবস্থা নিতে হত। সামাজিক ব্যাপারে আইন মানা হচ্ছে কিনা, সতী করা, বালকদের সুন্নৎ করার বয়স, শিশুহত্যা, প্রাণীহত্যা—প্রভৃতি ব্যাপার আইন মেনে করা হচ্ছে কিনা, তাও তাকে দেখতে হত।

পরগণা ঃ প্রশাসনের পরের স্তরে ছিল পরগণা, যার কর্তৃত্ব ছিল 'শিকদার' এর ওপরে। যার করণীয় কাজগুলি ছিল একত্রে রাজস্ব আদায়, বিচার পরিচালনা ও শাসন ব্যবস্থা। তার পর্যবেক্ষণেই কাজ করতে হত আমিন ও কানুনগোদের, যারা জরিপ, খাজনার পরিমাণ নির্ধারণ ও খাজনা আদায়ের দায়িত্বে থাকত।

গ্রাম ঃ কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি পরগণা, গ্রামকে ধরা হত স্বায়ত্তশাসিত ইউনিট হিসাবে। গ্রামের নিজস্ব জন পরিষদ যাকে বলা হত পঞ্চায়েত, তার হাতেই থাকত স্থানীয় বিবাদ-কলহ মেটাবার ভার, খাজনা আদায় ও রিলিফের কাজ দেখা। গ্রামের মোড়ল গ্রামের পাটোয়ারীকে চালনা করত, জমি বাড়ি সংক্রান্ত রেকর্ড এবং উৎপন্ন শস্যের হিসাব থাকত পাটোয়ারীর কাছে। গ্রাম পাহারা দেওয়ার কাজে থাকত যারা, তারাও ছিল মোড়লের অধীন।

বিচার-ব্যবস্থা

বিচার-ব্যবস্থাও পরিচালনা হত একইভাবে বিভক্ত আঞ্চলিক সীমারেখায়। সামরিক বিভাগের জন্য ছিল স্বতন্ত্র আদালত।

খাজনা আদায় সংক্রান্ত মামলাগুলির জন্যও স্বতন্ত্র বিশেষ আদালত ছিল। দিওয়ানি-ওয়ালা বা প্রধান দিওয়ান মুখ্য রাজস্বসংক্রান্ত অধিকরণের অধিকর্তা। বিভিন্ন আদালতের (রাজস্ব) আপীল তার কাছেই আসত।

প্রাদেশিক স্তরে থাকত দিওয়ানি-সুবা যার কাজ ছিল আমিনদের আদেশের বিরুদ্ধে আনা আপীলের বিচার করা। খাজনা সংক্রান্ত ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়ার নিজস্ব ক্ষমতা তারও ছিল। কাছারী আমলগুজারি সরকার স্তরে খাজনা সংক্রান্ত মামলার বিচার করত। পরগণার আমিলদের কাছ থেকে আবেদন তার কাছেই আসত। পরগণাস্তরে ছিল কাছারি, যেখানে আমিল বা কারোরি খাজনাসংক্রান্ত মামলাগুলি দেখার ভার পেত। এছাড়া কোতয়ালিতে শহরের ছোট ছোট অপরাধগুলির বিচার করত কোতয়াল-ই-পরগণা। তার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আপীল

সরকার স্তরে নিতে হত কোতয়াল-ই-সরকারের কাছে। তার হাতেও ছিল ছোটখাটো পুলিশ কেসের বিচার।

বিচারের সকল ক্ষেত্রে সম্রাটই ছিলেন সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। কেন্দ্রস্তরে সম্রাটের আদালত, বিচার ব্যবস্থার শেষ বা সর্বোচ্চ অধিকরণ। এখানে সিভিল ও ক্রিমিনাল দুই প্রকারের মামলারই বিচার করা হত, পুনর্বিচার ও পুনঃ পরীক্ষার আদেশ দেওয়ার এক্তিয়ার এই আদালতের ছিল।

নিম্ন আদালতগুলি পরস্পর হায়ারারকি অনুযায়ী সিভিল ও ক্রিমিনাল মামলাগুলি নিষ্পত্তি করে।

সুবা ঃ এই স্তরে ছিল 'নাজিম'-এর আদালত—তাদের হাতে থাকত প্রাথমিক মামলা, পুনর্বিচার ও পুনঃপরীক্ষার কর্তৃত্ব। আরও থাকত কাজি-ই-সুবার আদালত যার এক্তিয়ারে ছিল ধর্মীয় নীতিস্বীকৃত আইনের মামলা।

সরকার ঃ জেলা আদালতগুলির অধিকর্তা হতেন কাজি-ই-সরকার, যার সিদ্ধান্ত ও পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন রাখতে হত কাজি-ই-সুবার কাছে। আইন ও শৃঙ্খলার জন্য থাকত ফৌজদারি আদালত।

পরগণা ঃ পরগণা আদালত পরিচালনা করত কাজি-ই-পরগণা, যার বিচারের ওপর আপীল করা যেত কাজি-ই-সরকারের কাছে।

বিচার পরিচালনার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ইসলাম ধর্মের আইনই আদালতে গ্রাহ্য হত। সম্রাট সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে উন্মুক্ত আদালত কক্ষে আসতেন বিচারের জন্য। শোনা যায় হুমায়ুন একটি নিয়ম চালু করেছিলেন—তবল আদল বা বিচার সম্বন্ধীয় ভেরি। জাহাঙ্গীর 28 মিটার লম্বা একটি সোনার চেন ঝুলিয়েছিলেন, যাতে 60টি ঘণ্টা লাগান ছিল। যেকোন ব্যক্তি যে কোন সময়ে এসে সেই ঘণ্টা বাজিয়ে বিচার প্রার্থনা করতে পারত।

দরবার পদ্ধতি ঃ এছাড়াও প্রত্যহ দরবার করার মধ্য দিয়ে প্রশাসনের এক নতুন নিয়ম চালু ছিল। এ ব্যাপারে আকবরের উদাহরণের অনুসরণ করেছেন জাহাঙ্গীর শাহজাহান ও আওরঙ্গজেব। দিনে দু'বার দর্শন দেওয়া হত। একবার সকালে সূর্যোদয়ের পর (যাকে জরোখা বলা হত), আর একবার অপরাহ্নে (দিওয়ান-ই-খাস ও আম)। অপরাহ্নের এই দিওয়ানি খাসে সরকারী কাজকর্মের আলোচনা ও আবেদনপত্রগুলি পরীক্ষা করা হত। রাত্রে রাজ্যের গোপনীয় ব্যাপারগুলি নিয়ে স্বতন্ত্র একটি আলোচনা সভা বসত। আকবরের সময়ে একটি উল্লেখ্য প্রথা ছিল, আগের দিনে বিভিন্ন বিষয়ে, রাজস্ব আদায় থেকে জাগীর দেওয়া পর্যন্ত, যে সব হুকুম জারি করা হয়েছে, সেগুলিকে সংক্ষিপ্ত আকারে সম্রাটের কাছে পেশ করা হত।

কর ও জমির খাজনা আদায় পদ্ধতি

এতক্ষণ আমরা শাসন পদ্ধতি, বিচার ও তদারকির কাজ নিশ্চিন্ত করার জন্য যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত, তাই নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা রাজস্ব আদায় করার নিয়ম সম্পর্কে কিছু জানব। সরকারী কোষাখানায় যে রাজস্ব আসে তার প্রধান উৎস হল জমির খাজনা। আয়ের অন্যান্য উৎস ছিল বিভিন্ন ধরনের কর যা আদায় করা যেত ব্যবসা বাণিজ্য, বৃত্তি বা পেশা, যানবাহন উৎপাদন, ভোগ্য দ্রব্য, জিজিয়া, লবণ কর, খনিজ পদার্থ প্রভৃতি থেকে। যুদ্ধে লুঠ করা দ্রব্য ও দানও সরকারী কোষে জমা পড়ত।

রাজ্যের সবচেয়ে বড় আয় জমির খাজনা থেকে। খাজনা আদায়ের প্রক্রিয়াকে আকবর একটি সুশৃঙ্খল নিয়মের মধ্যে আনার চেষ্টা করেছিলেন। তার জন্য জমির শ্রেণীবিভাগ, সঙ্গে সঙ্গে মালিকানার বিভিন্ন ধরন, কৃষকদের জমির ওপর অধিকারের বিভিন্ন রীতির, (জমিতে কৃষিকাজের জন্য কি ধরনের পাট্টা দেওয়া হয়েছে এবং উৎপন্ন দ্রব্যের কত অংশে শস্য ভাগাভাগি হবে ইত্যাদি বিষয়ে) মধ্যে নিয়ম প্রবর্তনের চেষ্টা করেছেন আকবর। 1566 সালে খাজনার তালিকা তৈরি করা হয়েছিল। পরে স্থানীয় অঞ্চলগুলিতে খাজনার ধরন সম্পর্কে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হয়েছিল।

একটি খাতা তৈরি করে তাতে জমির মালিকদের অধিকার ও জমির পরিমাণ সম্বন্ধে বিশদ খবরাখবর লিপিবদ্ধ করে রাখা হত। শের শাহের সময়েও জমি জরিপ করানোর ব্যবস্থা হয়েছিল যার ভিত্তিতে তাঁর আফগান কর্মচারীদের জাগীর দেওয়া হয়েছে। রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের পদ্ধতি নির্ণয়ের জন্য আকবর 1582 খ্রীস্টাব্দে রাজা টোডরমল্লকে তাঁর প্রধান দেওয়ান নিযুক্ত করেছিলেন। উৎপাদন শক্তির বিচারে মাটির শ্রেণীবিভাগ, শস্যে রাজ্যের প্রাপ্য অংশ, রাজস্ব আদায়ের স্বতন্ত্র হিসাব ও অডিট প্রভৃতির ব্যবস্থা টোডরমল্লই করেছেন। আইন-ই-দশালা নামে খ্যাত টোডরমল্লের এই সংস্কারমূলক কাজের বিশেষত্ব হল যে, এই পদ্ধতিতে জমির স্থান ও গুণ বিচার করে তার পরিমাণ স্থির করা, যাতে সঠিকভাবে কর নির্ধারণ করা যায়। উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃষকদের ঋণ দিয়ে উৎসাহিত করা হত। কৃষকদের কেউ বঞ্চিত করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হত। কৃষকরা শস্য বা টাকা যাই দিক, তার জন্য তাদেরকে রসিদ দেওয়ার রীতি ছিল, যাতে তারা প্রতারিত না হয়। টোডরমল্ল কর নির্ধারণ ও আদায় করার পদ্ধতিকে উন্নত ও শক্তিশালী করেছিলেন এবং শস্য উৎপাদনের পরিমাণকে জানার পদ্ধতিও স্থির করেছিলেন, যার ফলে রায়তদের ওপর অত্যাচার না হতে পারে এবং রাজস্ব বিভাগের দুর্নীতির প্রবেশ না ঘটে।

ধর্মচিন্তা

মোগল রাজারা ইসলাম ধর্মের একনিষ্ঠ বিশ্বাসী ছিলেন। হুমায়ুন ভাবতেন যে, রাজতক্তে তাঁদের আরোহনের অধিকার বংশগত, ঐশ্বরিক প্রভাবে পাওয়া। আকবর ও তাঁর বিজ্ঞ, প্রধানমন্ত্রী আবুল ফজল ইসলাম ধর্মের তাৎপর্য অনুধাবন করেছিলেন; ধর্মের নামে যা কিছু পালন করা হয়, তার সবই তাঁরা মানতে চাননি। তাঁরা ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে একই ব্যবহার করতে চেয়েছেন। আকবরের দরবারে হিন্দু ও মুসলমান দুই ধর্মের মানুষই স্থান পেয়েছে, যেমন ফৈজি যিনি ভাগবদগীতা অনুবাদ করেছেন ফারসি ভাষায়, সভাগায়ক তানসেন, এবং তাঁদের সঙ্গে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বীরবল যিনি মন্ত্রী ছিলেন। দিন-ই-ইলাহি (স্বর্গীয় ধর্ম) নামে একটি নতুন ধর্মমত প্রচলিত করতে চেয়েছেন আকবর বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন সংঘটন করতে। তিনি জিজিয়া কর তুলে দিয়ে ধর্মমত নির্বিশেষে সকলকেই সমান নাগরিক অধিকার দিয়েছিলেন। ধর্মীয় ক্ষমতাবলে নিজেকে মুজাহিদ বা মুখ্য আইনবিদ বলে ঘোষণা করেছিলেন। রাজপুত বংশের এক রাজকুমারীকে বিবাহ এবং রাজপুতদের মধ্যে কয়েকজনকে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেছিলেন। আওরঙ্গজেব সিংহাসনে বসেই এই নিরপেক্ষতা ও ঐক্যসাধনের প্রয়াসকে উলটে দিয়েছেন, জিজিয়া করকেও আবার চালু করেছেন।

মোগলরা ও তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে আকবর যে প্রশাসন রাজস্ব সংগ্রহ ও বিচার ব্যবস্থার পদ্ধতি রেখে গিয়েছেন, পরবর্তী কালে তার ওপরেই ব্রিটিশ শাসনের সৌধ গড়ে উঠেছে। মোগল যুগ থেকেই প্রচলিত শব্দগুলি যেমন জমাবন্দি, জাগীর, খারিফ, টাক্কাভি, কাজি, সুবা, কাছারী ও কোতয়াল আমাদের মধ্যে চলে এসেছে।

ব্রিটিশ শাসনকালে প্রশাসন ব্যবস্থা

সাধারণভাবে একথাই সকলে জানে যে, ব্রিটিশ ভারতবর্ষে এসেছিল বাণিজ্যের খোঁজে, মশলার বাজার দেখা এবং ব্রিটিশ পণ্য দ্রব্য এদেশে পৌঁছে দেওয়া এই ছিল তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু এদেশে তাদের মোট 347 বছর অবস্থানের মধ্যে অর্ধেক সময়ই দেশের শাসনকর্তা হয়েই কাটিয়ে গিয়েছে। ষোড়শ শতকের শেষদিকে তারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তৈরি করেছে। 1765 খ্রীস্টাব্দে তারা মোগল সম্রাটের পক্ষে রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করে। ক্রমশ তারা ভারতের কয়েকটি অংশ তাদের সঙ্গে যুক্ত করে নিল। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের সময় প্রথম যখন তাদের জাহাজ সুরাট বন্দরে নোঙর ফেলেছিল, তখন তাদের মনে এদেশ শাসন করার কোন ইচ্ছাই ছিল না। 1600 বর্ষে প্রদত্ত রাণী এলিজাবেথের চার্টারে কোম্পানীকে পূর্বাঞ্চলের দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যের অধিকার দেওয়া হয়েছিল 15 বছরের জন্য।

ইন্দোনেশিয়া থেকে ডাচরা যদি তাদের তাড়িয়ে না দিত, আর ভারতবর্ষে মোগল শক্তির দ্রুত অবক্ষয় দেখা না দিত, তাহলে এদেশে ব্রিটিশের অবস্থানের সময় ও প্রকৃতি অন্যরূপ হতে পারত। মোগল ও অন্যান্য দেশীয় শাসনকর্তাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক পরবর্তীকালে যা ঘটবে, তারই পথ পরিষ্কার করে দিল। ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিকতার প্রসারে ব্রিটেন অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। ব্রিটেনের প্রতিযোগী ছিল ফ্রান্স। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতে তাদের শক্তি সংহত করে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শহরের ওপর, কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে চাইল। এই তিনটি শহরকে কোম্পানী প্রেসিডেন্সীতে পরিণত করে প্রত্যেক প্রেসিডেন্সীতে শাসন পরিচালনার জন্য একটি কাউন্সিল গঠন করে একজন করে প্রেসিডেন্ট বসালো। সর্বোচ্চ শাসনকর্তার আসন দেওয়া হল কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে। কোম্পানী তার দুর্গ রক্ষার জন্য সৈন্য নিযুক্ত করল, তার শক্তি দেশীয় রাজ্যগুলির চেয়ে বেশি হয়ে উঠল।

প্রথম দিকে কোম্পানী কেবলমাত্র ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে চলেছিল; সে সময় অন্যান্য ইউরোপীয় বাণিজ্য সংস্থাগুলির সঙ্গে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগেই ছিল। পর্তুগীজ ও বিশেষভাবে ডাচদের কাছ থেকে বাণিজ্য ছিনিয়ে নিচ্ছিল। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ অবধি তাদের কাজ এইভাবেই চলেছে। তারপর এল দ্বিতীয় যুগ, অষ্টাদশ শতকের শেষের দিক থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত যখন কোম্পানী তার অবস্থানকে সংহত করে নিল, আর তার দখলে আসা দেশগুলির ওপর তার সর্বভৌমত্ব ব্রিটেনের রাজার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিল।

পরবর্তীকালে কোম্পানীর ব্যবসায়িক সুবিধাগুলি চলে গেল, ব্রিটেনের পার্লামেন্টারি কমিশনে ও সিলেক্ট কমিটির পর্যবেক্ষণের মধ্যে তাকে আসতে হল। তারপরেই এল শাসন পদ্ধতিতে পরিবর্তন। ব্রিটিশ সরকার কোম্পানীর কাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে দৃঢ় করল। 1857 সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃত্বকে অগ্রাহ্য করে সিপাহী বিদ্রোহ; 1858 সালে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কোম্পানী ও তার প্রশাসন ব্যবস্থাকে অধিগ্রহণ করল। 1858 থেকে 1947 সাল পর্যন্ত ভারত শাসন করে ব্রিটেন ভারতবর্ষের হাতে শাসন ক্ষমতা তুলে দিল 1947 সালের 15 আগস্ট।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রশাসনিক কর্তৃত্বের আরম্ভ 1765 সালের আগস্ট মাসে, যখন তারা মোগল সম্রাটের কাছ থেকে সনদ লাভ করল বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের, শর্ত বছরে কোম্পানী 26 লক্ষ টাকা তুলে দেবে সম্রাটের হাতে। মোগলদের বনামে কোম্পানী এইভাবে রাজস্ব আদায়ের কর্তৃত্ব ও নাগরিক বিচারব্যবস্থার প্রশাসনভার হাতে নিতে পারল। কোম্পানী মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় দুজন সহকারী কর্মচারী—নায়েব নিযুক্ত করল। এই সময়টায় দেশ দ্বৈত শাসন

ব্যবস্থায় পরিচালিত অর্থাৎ দেশ শাসনের দায়িত্বভার ও ক্ষমতা ভাগাভাগি হয়ে গেল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও ভারতীয় শাসকবৃন্দের মধ্যে। এই পরিস্থিতিতেও কোম্পানীর কোন ইচ্ছা ছিল না সোজাসুজি শাসনভার হাতে নেওয়ার। তার সামরিক শক্তির সহায়তায় তার ক্ষমতা এখন ভয়াবহ হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। বিভিন্ন প্রদেশে নবাবদের কাছ থেকে বিচার বিভাগীয় প্রশাসনের ভার নিয়ে নেওয়া হল, এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বিচার বিভাগ, নাগরিক ও সামরিক দপ্তরের পূর্ণ ক্ষমতা হাতে তুলে নিল।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে মাঝে মাঝেই কোম্পানীর কাজে কর্মে হাত দিতে হয়েছে, কারণ তাদের শাসন পদ্ধতি এরপর কূটকৌশল ও দুর্নীতির ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। টাকা পয়সা ও লাভের বখরা নিয়ে নানা গোলমাল তার ফলে 1773 সালের রেগুলেটিং অ্যাক্ট ও পিট-এর ইন্ডিয়া অ্যাক্ট অব 1784 নির্ধারিত করেছে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও কোম্পানীর অবস্থান ও সম্পর্ককে। 1773-এর আইন কোম্পানীর কনস্টিটিউশন (নিয়মাবলী) নতুন করে গড়েছে এবং কোম্পানীকে হোম গভর্নমেন্টের একজন মন্ত্রীর পরিদর্শন ও তত্ত্বধানে আসতে হয়েছে। বোম্বে ও মাদ্রাজের সাব প্রেসিডেন্সিকেও যুদ্ধ রাজস্ব আদায় ও রাজনৈতিক কূটনীতির ব্যাপারে বাংলার সর্বোচ্চ শাসন কর্তৃপক্ষের অধীনে আনা হয়েছে। ভারতে যা ঘটছে তা দেখবার ও নিয়ন্ত্রণে রাখবার উদ্দেশ্যে পিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্ট অব 1784 ইংল্যান্ডে ছ'জন কমিশনার নিযুক্ত করেন। এই ছজনকে নিয়ে বোর্ড অব কন্ট্রোল গঠিত হয়, যাতে অর্থমন্ত্রী সেক্রেটারী অব স্টেট ও চারজন প্রিভি কাউন্সিলর ছিলেন। এই শাসন পরিষদ প্রথম গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া নামে পরিচিত। প্রশাসনের কাজের জন্য বোর্ড ভারতে একজন গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত করলেন। প্রথম গভর্নর জেনারেল হলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। তাঁর তিনজন সদস্য নিয়ে একটি কাউন্সিল ছিল। এই তিনজনই ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর চুক্তিবদ্ধ কর্মচারী। গভর্নর জেনারেলের সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত। কাউন্সিলের সদস্যদের সিদ্ধান্তকে নাকচ করার ক্ষমতা তাঁর ছিল, তিনি আবার সেনাবাহিনীর প্রধানও ছিলেন।

কোম্পানীর অধিকৃত অঞ্চলের জেলাসমূহের প্রশাসনের কাজ ইউরোপীয় কালেক্টরদের হাতে ন্যস্ত ছিল। এই কালেক্টরদের তাদের জেলাগুলিতে সিভিল ও ক্রিমিনাল কোর্টের প্রেসিডেন্ট করা হয়েছিল। জেলার কালেক্টরদের কাজের তদারকির জন্য কলকাতায় বোর্ড অব রেভিনিউ গঠন করা হয়।

পিটস অ্যাক্টে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা যখন ভারত থেকে বাড়ি ফিরে যাবে, তাদেরকে সম্পত্তির একটি তালিকা দাখিল করতে হবে। কোম্পানীর কর্মচারীদের আচরণবিধি তৈরি করার আরম্ভ

এখানেই। সময় যতই এগিয়েছে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোম্পানীর আধিপত্য আস্তে আস্তে কমেছে, দেখা গিয়েছে কোম্পানীর পরিচালকবর্গ প্রাপ্ত সুবিধার যথেচ্ছ ব্যবহার করেছে, টাকা পয়সা নিয়েও নয়ছয় করেছে। 1813 ও 1833-এর চার্টার অ্যাক্ট অনুযায়ী ভারতবর্ষে শাসন দায়িত্বের পুরো নিয়ন্ত্রণ গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়ার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে; গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া নিযুক্ত প্রতিনিধি গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল, বাংলা থেকে শাসন পরিচালনা করতেন। গভর্নরের কাউন্সিলে তিনজন সদস্য ছিলেন, চতুর্থ একজনকে দেওয়া হয় আইন প্রণয়নের জন্য। হিন্দু ও মুসলমান আইনের বইও তৈরি হয়। ভারতবর্ষের অধিবাসীদের কোম্পানীর চাকুরিতে নেওয়ার প্রস্তাব স্বীকৃত পেল; তবে তাদের চুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভিসের গ্রেডে নয়। 1833-এর অ্যাক্ট একটি উল্লেখ্য ঘটনা। 1853 সালের মধ্যে কোম্পানীর ব্যবসায়িক কাজকর্ম শেষ হয়ে গেল। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অধীনে তখন একটি প্রশাসক সংস্থা। ভারত তারপর আর কোম্পানীর অধিকারে থাকেনি, রাজার নামে একটি ট্রাস্ট (অছি) হয়ে গিয়েছে। বাংলায় গভর্নর নিযুক্ত হওয়ার পর ভারত সরকার ও বাংলা সরকার দুটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব।

1857 সালের অভ্যুত্থান (ব্রিটিশ যাকে বিদ্রোহ বলেছে) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে দিল। ইংল্যান্ডের রাজতন্ত্র তখন সোজাসুজি ভারত শাসনের দায়িত্ব হাতে নিলেন; কার্য পরিচালনার ভার দেওয়া হল ক্যাবিনেটের একজন মন্ত্রীর হাতে, যার নাম হল সেক্রেটারী অব স্টেট। বোর্ড অব কন্ট্রোলকে তুলে দেওয়া হল। ব্রিটিশ রাজের কাছ থেকে নিয়োগপত্র পেলেন গভর্নর জেনারেল (ভাইসরয়) এবং প্রাদেশিক গভর্নরেরা। নৌ ও সামরিক বাহিনীও ব্রিটিশ রাজের হাতে চলে গেল। 1858 সালে রানীর ঘোষণাপত্রে ভারত শাসনের অধিকার কোম্পানীর হাত থেকে রাজতন্ত্রের হাতে নেওয়া হল। 1877 সালে ইংল্যান্ডের রানীকে ভারত-সাম্রাজ্ঞী বলে ঘোষণা করা হল।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রশাসন ব্যবস্থা (1765-1858)

আমরা এবার 1757-1858-এর মধ্যে যে সময় সেই সময়ের ঘটনাবলীর দিকে দৃষ্টিপাত করব, দেখবার চেষ্টা করব ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকালে শাসনব্যবস্থাকে দৃঢ় করবার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল।

মোগল শাসন ভেঙে পড়ায় কোম্পানীর পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল তার বাণিজ্যকে বাঁচাতে তার অধিকৃত উপনিবেশগুলিকে সুদৃঢ় করা। তাদের সঙ্গে সংঘাত বেধেছিল একদিকে স্থানীয় শাসকদের সঙ্গে অন্যদিকে ফরাসি অভিযাত্রিকদের সঙ্গে; ইউরোপে ফ্রান্স ছিল তার প্রধান শত্রু। বাংলায় সর্বোচ্চ শাসনক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত

করতে রাজ্যজয়ের সঙ্গে সঙ্গে আপোশ আলোচনার পথ নিয়েছিল তারা। সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের একটি কেন্দ্রীয় দপ্তর ছিল, যার চারটি বিভাগ—General বা সাধারণ (নাগরিক, সামরিক ও সমুদ্র সম্পর্কিত কাজকর্ম), রেভিন্যু (রাজস্ব), জুডিসিয়াল (বিচার) ও কমার্শিয়াল (বাণিজ্য সম্বন্ধীয়)। কেন্দ্রীয় দপ্তর বা মহাকরণের কাজ চলতো চারটি বোর্ড-এর মাধ্যমে। যেমন, বোর্ড অব কাউন্সিল, মিলিটারী বোর্ড, বোর্ড অব রেভিন্যু ও বোর্ড অব ট্রেড। পরবর্তীকালে একটি মেডিক্যাল বোর্ডও গঠিত হয়েছিল। শাসন বিভাগ ও বিভিন্ন দপ্তরে কাজের জন্য সচিব রাখা হয়েছিল। এই দপ্তরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—ট্রেজারি, অ্যাকাউন্টস, দি মিন্ট ও পোস্ট অফিস।

ভূমি রাজস্ব সংগ্রহ

রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে ভূ-বাসন ব্যবস্থা যার অর্থ হল, যে সবার থেকে বেশি রাজস্ব দিতে পারবে তাকে নির্দিষ্ট কয়েক বছরের জন্য জমি বা সম্পত্তি লিজ প্রথায় দেওয়া হয়; নিলামে জমি দেওয়া হয় তাকে, যে বেশি টাকার ডাক দেয়। এইভাবে যে জমি নেয়, সে আবার কৃষকদের কাছ থেকে কর আদায় করে। কোম্পানী সে করের একটি অংশের দাবিদার। প্রেসিডেন্সীর মুখ্য রাজস্ব আদায়ের কার্যালয় (অথবা খালসা) সঞ্চালক হতেন একজন ভারতীয় কর্মচারী (তাঁকে বলা হত রায় রায়ান), তাঁকে কাজ করতে হত কোন ইউরোপীয় কর্মচারীর তত্ত্বাবধানে।

কোম্পানীর কর্মচারীরা দেখলেন যে, ভারতবর্ষের জমি বিতরণ ব্যবস্থা বেশ জটিল, লাভজনক তো নয়ই। এর থেকে কত টাকা তারা তুলতে পারবে, আর কিভাবে সেই প্রাপ্তিকে ফাঁপিয়ে তোলা যাবে, তাই ছিল তাদের কাছে প্রয়োজনীয় চিন্তা। যাইহোক যখন বাংলা দেওয়ানিতে রাজস্ব সংগ্রহের ভার কোম্পানীর হাতে পড়ল, তখন এ ব্যাপারে উপযুক্ত জ্ঞান তাদের অর্জন করতে হল। সে সময় রাজস্ব সংক্রান্ত বিবরণ ও নথিপত্র তৈরি করার ভার ছিল কানুনগোর হাতে। তখন বাংলার গভর্নর ছিলেন ভেরেলস্ট। তিনি ও তার কমিটি অনুসন্ধান শুরু করলেন রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ অত্যন্ত কম কেন? অনুসন্ধানে তাঁরা দেখলেন, জমির খাজনা আদায়ের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে রয়েছে দুর্নীতি ও প্রতারণার প্রবৃত্তি। জমিদার ও কানুনগোর মধ্যে গোপন আঁতাতে সংগৃহীত অর্থ রহস্যজনক ভাবে উড়ে যেত। কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে থেকে পরিদর্শনের জন্য অবেক্ষক নিযুক্ত করা হলেও স্থানীয় রীতিনীতি ও প্রচলিত প্রথার চাপে তারা পেরে ওঠেনি ওই কাজের ধারাকে বদলাতে। শোষিত কৃষককে সাহায্য করার জন্য তাদের চেষ্টা তাই সফল হয়নি। কোম্পানী যখন দেওয়ানির ভার পেল, ব্রিটিশ পরিদর্শকের অধীনে ভারতীয় নায়েবরা কর আদায় করতো ওয়ারেন হেস্টিংস কর সংগ্রহের এই

প্রথাকে বাতিল করে দিলেন। তিনি চাষের জন্য জমি সোজাসুজি লিজ দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। দেওয়ানি প্রথা এর সঙ্গেই শেষ হয়ে গেল। রাজস্ব সংগ্রাহক হিসাবে দাঁড়াতে, প্রাপ্য রাজস্ব সোজাসুজি আদায় করতে ও রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থাকে পুরোপুরি আয়ত্তে আনতে কোম্পানী সংকল্পবদ্ধ হল। লিজ দেওয়া জমির খাজনা আদায় করতে লাগলেন জেলার কালেক্টর, আর সে কাজের তত্ত্বাবধানের ভার বোর্ড অব রেভিন্যুর হাতে।

দেওয়ানির করণীয় কাজগুলির মধ্যে নাগরিক বিচার ব্যবস্থাও জড়িত ছিল। বিচারপতিদের নিয়ে গঠিত একটি কমিটির সুপারিশ অনুসারে একজন কালেক্টরের অধীনে দুটি করে আদালত বসানো হল ঃ দেওয়ানি আদালত (রাজস্ব বিষয়ক আদালত) ও ফৌজদারি আদালত (বা অপরাধসম্বন্ধীয় আদালত)। অনুরূপ দুটি সদর আদালতও কলকাতায় প্রধান কার্যালয়ে স্থাপন করা হল। রাজস্ব সম্বন্ধীয় আদালত পরিচালিত হত গভর্নর বা কাউন্সিলের একজন সদস্যের দ্বারা। তালিকাভুক্ত করণের কাজ তখন পর্যন্ত কানুনগোদের হাতে। একটা সময় এল যখন কালেক্টরদের ফিরিয়ে আনা হল, এবং একটি কমিটি প্রেসিডেন্সির সমস্ত কাজের ভার গ্রহণ করল, সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক জেলায় একজন করে ভারতীয় দেওয়ানরূপে নিযুক্ত হল।

1786 সালে আবার পরিবর্তন হল ব্যবস্থার। ভূবাসনের (Sattlement) দায়িত্ব দেওয়া হল কালেক্টরের হাতে; কালেক্টরই রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব নিল। স্থানীয় দেওয়ানদের পদ লুপ্ত হ'ল। জেলার সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হল। জমির নথিপত্র ও দলিল (Records) রক্ষার জন্য মুখ্য সেরেস্তাদার নামে একজন আধিকারিকের পদ সৃষ্টি করা হল, সেরেস্তাদার এল কানুনগোর জায়গায়।

সেটলমেন্ট-এর তিনটি স্বতন্ত্রবিভাগ করার চেষ্টা করল কোম্পানী, উদ্দেশ্য কৃষকদের কাছ থেকে যে রাজস্ব আদায় করা হত, তার মধ্য থেকে কোম্পানীকে দেয় অংশ নির্ধারণ। প্রথম, জমিদারের অধীন জমি, দ্বিতীয়, মহলওয়ারি জমি (অর্থাৎ জমি বা সম্পত্তি যেখানে গ্রাম বা মহল অনুযায়ী ভাগ করে দেওয়া হত) তৃতীয়, রায়তওয়ারি জমি (রায়তের যেখানে নিজস্ব জমি ছিল)। এই ভূ-বাসন বা সেটলমেন্টের বিভাগ সাময়িক হত এবং দু'এক বছর অন্তর এর পরিবর্তন ঘটানো হত। কিন্তু 1793 খ্রীস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করলেন। এর ফলে প্রথম দিকে ওয়ারেন হেস্টিংস পাট্টা বা লিজ-এর ভিত্তিতে জমি চাষ করতে দেওয়ার যে নিয়ম করেছিলেন তা বাতিল হয়ে গেল। জমিদারি প্রথায় কৃষক বা জমির পাট্টাদার জমির খাজনা দেবে জমিদার বা জমির মালিককে। তারই একটি অংশ প্রাপ্য হবে কোম্পানীর। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে

কোম্পানীর প্রাপ্য অংশ বরাবরের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই নিয়ম করার একটা কারণ ছিল। 1786 সাল অবধি প্রত্যেক তিন বছর ব্যবধানে এবং তারপর এক বছর অন্তর জমা (সেটলমেন্ট) দেওয়া হত, কোম্পানীর ক্ষতি হওয়া ছাড়াও জমিদার টাকা দিতে দেরি করত, এবং রায়তও অখুশি হত। কর্নওয়ালিস বুঝেছিলেন যে, স্থায়ী বন্দোবস্ত হলে কোম্পানীর কর্মচারীদের কাজের ঝামেলা অনেক লঘু হবে; যেমন জমিদারেরা যে খাজনা আদায় করেছে, তার মধ্যে কোম্পানীর অংশ তার হিসাব তৈরি করা। তিনি যা চেয়েছিলেন, তা হল, মাঝারি ধরনের রাজস্ব নিয়মিত আদায় হবে এবং সত্ত্বর পাওয়া যাবে। তিনি তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দিলেন নতুন বন্দোবস্তের উদ্দেশ্যে। 1770 সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি দশ বছরের মেয়াদে এক নতুন ব্যবস্থা চালু করলেন। 1772 সালের মার্চ মাসে এই ব্যবস্থাকে স্থায়ী ঘোষণা করলেন, যার ফলে জমিদাররা জমির আইনত মালিক হল। খাজনার পরিমাণ স্থির হল জমিদার রায়তদের কাছ থেকে যা পাবে, তার 10/11 অংশ। জমিদারদের কাছ থেকে এই টাকাটা খুব বেশি মনে হওয়ায়, তারা কৃষক/প্রজাদের কাছ থেকে যত বেশি সম্ভব টাকা খাজনা হিসাবে আদায় করতে লাগল। এই প্রক্রিয়া তাদের আগের চেয়েও বেশি নির্দয় করে তুলল। চাষীদের অবস্থা হল করুণ; তারা ঋণগ্রস্ত ও অসহায় হয়ে পড়তে লাগল। বাংলাতেই এই ঘটনা বেশিভাবে ঘটল। এর পরেই এল দুর্ভিক্ষ; যখন তাদের দুরবস্থা প্রচণ্ড বেড়ে গেল।

রায়তদের অধিকার সম্বন্ধে কোথাও কিছু বলা হল না, জমিদারদের বেপরোয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাদের কোন রক্ষার ব্যবস্থাও করা হল না। গ্রামাঞ্চলে জায়গীর প্রথার এই পীড়নের ফলে উদ্ভূত অসুবিধাগুলি এত প্রকট হয়ে দেখা দিল যে, 1883 সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিলোপ ঘটাতে হল। যদিও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উঠে গেল, জমিদারি প্রথা উত্তরাধিকার সূত্রে বিস্তার লাভ করল এখনও উত্তর-পূর্ব ভারতে যার স্পন্দন অনুভব করা যায়। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে কৃষকদের প্রতি ন্যায়বিচার প্রদর্শনের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, ভূমিসংস্কার তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

ভাগ্যক্রমে বাংলার জমিদারি প্রথা অন্যত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। দক্ষিণ ভারতের প্রথা বিভিন্ন ধরনে গড়ে উঠেছিল।

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে রাজস্বের 90 ভাগ স্টেটকে দিতে হত। ঘন ঘন যুদ্ধের দোলায় শাসকের নিরাপত্তার অবস্থা যখন কিছুটা অবনতির পথে, তখন করের বোঝা বাড়িয়ে সহজে দ্রুত রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মহীশূর রাজ্যের হায়দার আলি এ কাজের জন্য আমিলদার নিযুক্ত করেছিলেন, অগণ্য গ্রাম নিয়ে দূরবিস্তৃত এলাকায় তাঁর আধিপত্য ছিল। গ্রামে গ্রামে আমিলদারের একজন

গ্রামপ্রধান ও একজন হিসাব-রক্ষক থাকত। হিসাব-রক্ষকের কাছে খাতা ও নথিপত্র থাকত, তাতে হিসাব থাকত গ্রামগুলিকে কত দিতে হবে। এই ব্যবস্থায় নৈতিক অবনতির মান অনেক নিচে নেমে যেত। আর্কটের নবাব বিরাট বিরাট ভূখণ্ড, এমন কি পুরো জেলাই পাট্টায় দিতেন ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছে, যাদের কাজই ছিল ফাটকাবাজি করা ও জমি কেনা। কিন্তু কারও স্বত্বের স্থায়িত্ব ছিল না। এখনকার অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন অংশে আর একটি শ্রেণী ছিল—পলিগার (জমিদার শ্রেণীর মত), তাদের পেশকাশ দিতে হত রাজাকে। এদের কোন উত্তরাধিকারগত দাবি ছিল না জমির ওপর।

কোথাও কোন আদালত ছিল না—নাগরিক বা অপরাধ সংক্রান্ত কোনটাই না। আইন বা বিধি ছিল না, আবেদন জানাবার কোন সুযোগই ছিল না। এই অব্যবস্থার অথবা কোন ব্যবস্থা না থাকার ফলে দরিদ্র চাষীকুলকে বলির পাঁঠার মতো থাকতে হত। তাদের পেছনে শিকারী কুকুরের মতো লেগে থাকত জমির মালিক। ছোটখাটো অপরাধের সাজা দিত গ্রামের মোড়ল। গ্রাম্য পঞ্চায়েত ও জুরী বিচারের রায় দিত তাদের নিজেদের ধরনে। জাতিগত অপরাধের শাস্তি দিত বর্ণপ্রধান। আমিলদার ও অন্য কর্মচারীরা তাদের ইচ্ছামত শাস্তি দিত; গরীবের দ্রব্য নষ্ট করে দেওয়া এবং ধনীকে অর্থদণ্ড দেওয়া তাদের শাস্তির মধ্যে ছিল। জেল বলে কিছু ছিল না। শক্তি বিশেষ করে অস্ত্রশক্তিই ছিল সত্য।

জমি খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়েছিল। তার মুখ্য কারণ হিন্দুদের যুক্ত পারিবারিক প্রথা (Joint Hindu Family System)। খাজনা আদায়কারী ও চাষীর মধ্যে সব সময়েই একটা লড়াই লেগে থাকত, তা সে আমিলদার, পলিগার বা জায়গীরদার যেই হোক। এই ব্যবস্থার ত্রুটি হল অতিরিক্ত খাজনা আদায়, ও জোর করে আদায়। অনেক সময় চাষীকে স্টেটের নির্দিষ্ট দামে তার নিজের শস্যই কিনে নিতে হত। চাষীরা তাই তাদের একান্ত প্রয়োজনের বেশি শস্য উৎপাদন করতে রাজি হত না। জমির খাজনা আদায়ের পদ্ধতির মতই কষ্টকর ছিল অন্যান্য নানা করের বোঝা। কর দিতে হত বাড়ির ওপরে, তাঁত, তেলের ঘানি, বনজ সম্পদ, এবং লবণ, মদ্য, ঘি আমদানী রপ্তানীর ওপর। কর দিতে হত পাথরভাঙা মিস্ত্রীদের এবং নাচিয়ে মেয়েদের।

ব্রিটিশ যেদিন এসে পৌছলো, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে তখন যুক্ত জমিবণ্টন ব্যবস্থা অথবা জায়গীর (যেখানে সকলে এক বংশজাত)। তার অর্থ সমস্ত গ্রামকে কয়েক অংশে ভাগ করে তার মালিক হত মিরাজদার বা বড় জমিদার। তাদের অধিকারে থাকত নিজের নিজের অংশ বিক্রী করে দেওয়ার, বন্ধক দেওয়ার ও দান করার। কাজেই স্টেটের পুরানো নীতি যে, স্টেট সব জমির মালিক, সে নীতি টিকে

থাকেনি। মিরাজদাররা একত্রে দলবদ্ধ হয়ে কাজ করত। 1792 সালে টিপু সুলতানের পরাজয়ের পর মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির এলাকা সম্প্রসারিত হয়ে গিয়েছে। কোম্পানীর কাজের মধ্যে প্রশাসনই প্রধান হয়ে উঠল। ইংরাজদের পক্ষে কাজ বেশ কঠিন হয়ে উঠল; তারা দেশের ভাষা জানত না, দ্বিভাষীর মাধ্যমে তাদের কাজ চালাতে হত। তারা সোজাসুজি দুটো পথ ধরল। প্রথমত তারা অযোগ্য প্রধানদের সরিয়ে দিল। কাউন্সিল ভেঙে দিয়ে সে জায়গায় নিয়ে এল জেলা কালেক্টরদের। কালেক্টরদের বসানো হল বোর্ড অব রেভিন্যুর অধীন করে। 1794 সালের ঘটনা এগুলি। নতুন অঞ্চলগুলির রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত প্রশাসনকে আলেকজান্ডার রিড্‌কে প্রধান নিযুক্ত করল, তার সহায়তার জন্য আনা হল তিনজন সামরিক বিভাগের কর্মচারীকে। মিরাজদারদের সম্পত্তির (জায়গীর) জন্য জেলা কালেক্টর করা হল লায়োনেল প্লেসকে। এই দুজন ইংরাজ তাদের এলাকার গ্রামগুলি সম্পর্কে, অধিবাসীদের আচার ব্যবহার, খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা, ভোগদখলের স্বত্ব প্রভৃতি বিষয়ে ভালো জ্ঞান সঞ্চয় করেছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল যে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের কাজের উপযোগী করে নিয়ে তাদের মাধ্যমে কাজ করা অনেক সুবিধাজনক। জমি জরিপ করানো হল। যদিও জরিপের কাজে ভুল থেকেছে, তবুও জমির খাজনা আদায় সংক্রান্ত ব্যাপারে জমি জরিপ করা এই প্রথম ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। জমির নথিপত্র ও দলিল রক্ষার কাজে ও রাজস্ব সংক্রান্ত গোলযোগে জরিপের কাজ বিশেষ প্রয়োজনীয়।

কিন্তু মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির সৌভাগ্যের ঘটনা হল একজন জ্ঞানী ও দূরদর্শী প্রশাসককে পাওয়া। তাঁর নাম টমাস মুনরো, তিনি রিডকে তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধুরূপে পেয়েছিলেন। ভারতের এই অংশের জন্য চাষীর ভোগস্বত্ব প্রথাই যে সব থেকে উপযুক্ত হবে, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। উৎপাদন বাড়াতে চাষীদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য খাজনার পরিমাণ কমানোর পক্ষে তিনি জোরালো যুক্তি দিয়েছেন। বাৎসরিক হিসাব নিষ্পত্তির পর তিনি জোর দিয়েছিলেন, কারণ চাষ বৃষ্টির জলের ওপর নির্ভরশীল। অনাবৃষ্টির বছরে কৃষকদের যতদূর সম্ভব রেহাই দেওয়ার জন্য কালেক্টরদের বিচার বিবেচনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। জমির খাজনার পরিমাণ নির্ধারণ ও আদায়ের কাজে কালেক্টরদের সোজাসুজি দায়ী করা হত। জেলায় কি ঘটছে না ঘটছে সে সংবাদও কালেক্টরকে রাখতে হত বোর্ড অব রেভিন্যুকে জানাবার জন্য। খাজনা আদায় ও অপরাধমূলক কাজের বিচারের ব্যাপারে কালেক্টর আমিলদারের জায়গা নিত এবং প্রহরীর মতো (Kavalgars) কৃষকদের রক্ষা করত অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে। যদিও লর্ড ওয়েলেসলি 1798 খ্রীস্টাব্দে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে স্থায়ী বন্দোবস্তর নির্দেশ দিয়েছিলেন, এবং তা কার্যকরী করার জন্য

যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছিল, তবু 1812 সালে সে চেষ্টা ছেড়ে দিতে হয়। মাদ্রাজ গভর্নমেন্টকে আদেশ দেওয়া হয় প্রজাস্বত্বমূলক ব্যবস্থায় ফিরে যেতে।

গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের আদেশে কোম্পানীর জন্য রাজস্ব আদায়কারী ভারতীয় কর্মচারীদের বিদায় দেওয়া হয়; সে জায়গায় এসেছিল ইউরোপীয় ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টার এবং বোর্ড অব রেভিন্যু। খালসা অথবা রাজস্ব বিষয়ক কর্মচারী সোজাসুজি খাজনা আদায় করত। অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের একটি পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় ও তার বিভিন্ন দপ্তর এবং ট্রেজারি। কোম্পানীর কর্মচারীদের দুর্নীতি দমন করতে হেস্টিংস কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসার অনুমতিপত্র (Dastaks) প্রত্যাহার করে নিলেন। লবণ, সুপারি ও তামাক ছাড়া অন্য অনেক দ্রব্যের ওপর থেকে করের হার কমিয়ে দেওয়া হল।

প্রশাসনের বিভিন্ন দিকে উন্নতি ও উৎকর্ষসাধন এবং সততা সৃষ্টিতে উৎসাহদান

প্রশাসন পরিচালনায় কিছু নীতি ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছিলেন গভর্নর জেনারেল কর্নওয়ালিস। তিনি নিজে সৎ ও সরল ছিলেন, ছিলেন নিন্দাজনক কাজের ঊর্ধ্বে। পরিচ্ছন্ন ও কার্যকরী প্রশাসনের শক্ত বনিয়াদ গড়ে দেওয়ায় তাঁর দান, পরবর্তীকালের কাছে মূল্যবান হয়ে আছে; তাঁর কাজের এই গুরুত্বকে সহজে ভোলা যাবে না।

কর্নওয়ালিস কোম্পানীর কার্যভারকে দু'ভাগে ভাগ করেছিলেন—বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক বিভাগ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ছিল একটি বাণিজ্যিক সংস্থা। সঙ্গে ছিল সামরিক শক্তি ও উপনিবেশ স্থাপনের উদ্যম। আরও অতিরিক্ত কার্যভার হল একটি দেশের প্রশাসনের ভার গ্রহণ। এর পরবর্তীকালে কোম্পানীতে চাকরি নিতে হলে হয় বাণিজ্যিক বিভাগে নইলে প্রশাসনিক বিভাগে পদ নিতে হত, কিন্তু একই সঙ্গে দু'দিকে থাকা চলত না। এই সূচনা থেকে সিভিল সার্ভিসের সৃষ্টি। ইন্ডিয়া অ্যাক্ট-1784 একটি যুগান্তকারী আইন যা থেকে সৎ প্রশাসনিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সিভিল সার্ভিস-এর মতো সরকারী কার্যধারার রীতি গড়ে উঠেছে। সকল কর্মচারীর জন্য করণীয় কার্যের তালিকা, ব্যবসায়ের নিয়মাবলীও বেঁধে দেওয়া হয়েছে। অ্যাকাউন্টস বিভাগ ও তার সঙ্গে পে মাস্টারের (বেতন দাতা) কার্যালয় ও ট্রেজারির উৎকর্ষসাধন করা হয়েছে।

তাঁর পূর্বসূরীরা বিশেষভাবে হেস্টিংস যে বনিয়াদ তৈরি করে গিয়েছিলেন, কর্নওয়ালিস তার ওপরেই কাজ করেছেন। তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে সকল কর্মচারীরাই বিশেষত দেশীয়রা দুর্নীতিপরায়ণ। ভারতীয় বড় কর্মচারীদের তিনি

বরখাস্ত করলেন, যে সব পদে বার্ষিক বেতন 500 পাউন্ডের বেশি, সেগুলি কোম্পানীর রাজস্ববিভাগে শুধু ইউরোপীয়দের জন্য নির্দিষ্ট রাখলেন। উঁচুপদের কর্মচারীরা হবে ইউরোপীয়, শুধু নিচের দিকের পদে কর্মচারী নিয়োগ ভারতীয়দের মধ্যে থেকে হতে পারত। তার কারণ যে, দেশীয় কর্মচারীরা তাদের এলাকায় খুঁটিনাটি ব্যাপারের সঙ্গে পরিচিত ছিল।

কর্নওয়ালিস চেয়েছিলেন কোম্পানীর কাজে দুর্নীতি দমন করতে এবং অতিরিক্ত কর্মচারী ও কার্যালয়ের সংখ্যা কমিয়ে দিতে। তাঁর প্রশাসন প্রণালীর বিভিন্ন ধারার নীতি ছিল, অর্থ সঙ্কোচ ও সারল্য। তিনি চেয়েছিলেন যে তাঁর কর্মচারীরা কোম্পানীর প্রতি বিশ্বস্ত হোক, এবং কাজের দিক থেকে সৎ হোক। তিনি চেয়েছিলেন, যে তাঁর মতই তাঁর কর্মচারীরা তাদের নিজস্ব কাজের প্রথা নয়, জাতীয় ঐতিহ্যকেই তুলে ধরবে। ইংরাজরা নিশ্চয়ই ইংরাজি মানকে বাঁচিয়ে রাখবে—এই ছিল তাঁর চিন্তা; এর থেকে কেউ সরে গেলে তাকে শাস্তি পেতে হত। কোম্পানীর নিযুক্ত কর্মচারীরা কিভাবে কাজ করছে, সে সম্বন্ধে তিনি সংবাদ নিতেন। সেই সংবাদের ভিত্তিতে তিনি স্থির করতেন তারা দুর্নীতিগ্রস্ত কিনা এবং তাদের বরখাস্ত করা হবে কিনা। বিশদ অনুসন্ধানের জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থাকে দৃঢ় করেছিলেন। ব্যবসায়িক অধিবাসীদের প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থার পুনর্বিবেচনা করার পর, তাদেরকে দেওয়া চুক্তির ব্যবস্থাও বাতিল করেন। তাদেরকে কোম্পানীর প্রতিনিধি করে দেওয়া হল, বিনিয়োগের নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে সোজাসুজি দেওয়া হল। উৎপাদক ও প্রস্তুতকারকদের সঙ্গে মূল্য নির্ধারণ করা, মূল্য অগ্রিম দেওয়া, উৎপন্ন দ্রব্য মিলিয়ে নেওয়া, কাজ ঠিক হল কি না দেখা ইত্যাদি কাজের জন্য তারা কমিশন পেত। সুপ্রশাসনের মান নির্ণয়ে সততার স্থান অনেক উঁচুতে রাখা হয়েছিল।

কর্নওয়ালিসের করা 1793-এর সম্পূর্ণ আইন বিধিতে প্রশাসনের সমস্ত দিকগুলিই নিয়ন্ত্রণে এসেছিল। এই বিধি নিয়মগুলিতে বাণিজ্যিক ব্যবস্থা, দেওয়ানি ও ফৌজদারী বিচার, আরক্ষা বিভাগ ও রাজস্ব সংগ্রহ বিভাগের সমস্ত নিয়মকানুন ধরা ছিল। এর মধ্যে ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টরদের দায়িত্ব-প্রসঙ্গ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা।

জেলা সমাহর্তার ভূমিকা ও দেওয়ানি প্রশাসন

জেলা সমাহর্তার পূর্ববর্তী কর্মচারী ছিল প্রত্যেক জেলায় নিযুক্ত পরিদর্শক। ক্লাইভ প্রবর্তিত দ্বৈত পরিচালন ব্যবস্থায় দেশীয় কর্মচারীদের খাজনা আদায়ের কাজে দেওয়া হত, তাতে সমস্যা দেখা দেওয়ায় পরিদর্শক নিযুক্ত করা হয়। পরিদর্শকের কাজ ছিল ভাড়ার তালিকা প্রস্তুত করা, খাজনা নির্দিষ্ট করে দেওয়া এবং আদায় ব্যবস্থার তদারকি করা। সঙ্গে সঙ্গে জমির মালিকানা সম্বন্ধে তদন্ত করা, এবং ন্যায়

বিচার করা। সবার ওপরে তাকে প্রজার সুহৃদ হতে হত।

কিন্তু এই পরিদর্শক অধীক্ষকরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর চাকুরে; তারা ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে মন দিল। তারা দেখল যে খাজনা আদায়কারীর কাজ পীড়াদায়ক ও বিরক্তিকর, কাজেই সে কাজ তাদের সন্তোষজনক হয়নি।

1771 সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ান নিযুক্ত হয়ে খাজনা আদায়ের ভার নিজের হাতে তুলে নিল। 1772 সালে ওয়ারেন হেস্টিংস পরিদর্শকের ধারণাকে পুনরুজ্জীবিত করলেন কিন্তু পদের নাম পরিবর্তন করে রাখলেন জেলা সমাহর্তা। জেলা সমাহর্তার দায়িত্ব হল খাজনা আদায় ও মালিকানার মামলা বিচার করা। আগে এই বিচারের জন্য থাকত একজন স্বতন্ত্র কর্মচারী। প্রত্যেক জেলায় হেস্টিংস যে দেওয়ানি ও ফৌজদারী আদালত স্থাপন করেছিলেন সেগুলি জেলা-সমাহর্তার অধীনে এল। কিন্তু এই ব্যবস্থা মাত্র একবছর স্থায়ী হয়েছিল, তারপর জেলা সমাহর্তাদের সরিয়ে নেওয়া হয়। 1781 সালে আবার নীতিবদল এবং প্রত্যেক জেলায় বসানো হল সমাহর্তাকে জেলা সমাহর্তার কাজ ও কোম্পানীর তালিকাভুক্ত কর্মচারী, দেওয়ানি আদালতের বিচারকের কাজের মধ্যে গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। ফৌজদাররা জমি সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি করত, এখন তাদের স্থান নিল দেওয়ানি আদালতের বিচারকেরা।

1787 সালে খাজনা আদায় সংক্রান্ত বিভাগের ক্ষমতা, ন্যায়াধিকরণ ও শাসনক্ষমতা দ্ব্যর্থহীনভাবে সমাহর্তার হাতে দেওয়া হল। জেলাই হল রাজস্ব, আরক্ষা ও বিচার বিভাগীয় প্রশাসনের একক ইউনিট। কাজেই জেলা সমাহর্তার ক্ষমতা প্রচণ্ড বেড়ে গিয়েছিল। তাঁর ক্ষমতা ছিল অ্যারেস্ট করা ও কলহ বা দাঙ্গার ঘটনার বিচার করা এবং নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে শাস্তি প্রদান করা।

একটি মানুষের হাতে এত বেশি ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার ঘটনা লর্ড কর্নওয়ালিসকে শঙ্কিত করেছিল। 1793 সালের আইনে তিনি অবস্থাকে সমতার মধ্যে আনলেন; এখন সমাহর্তা শুধুমাত্র খাজনা আদায়ের প্রতিনিধি। তার কোন বিচারের ক্ষমতা থাকল না। কর্নওয়ালিস বুঝেছিলেন যে, অতখানি নিরঙ্কুশ ক্ষমতা মানুষের মনে ভীতি উৎপাদনই করবে, তার রক্ষার জন্য বিশ্বাসে প্রেরণা জাগাবে না। কিন্তু এরপর সমাহর্তা প্রজার কাছ থেকে দূরে সরে গেল।

যাইহোক, সমাহর্তা-পদের উচ্চ ক্ষমতা আবার ফিরে এল 1813 ও 1814 সালের আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর। উক্ত আইনের বলে রাজস্ব আদায় ও ন্যায়াধিকরণের শাসনকর্তার ক্ষমতা ফিরে পেলেন তাঁরা। যদিও ঐ ক্ষমতা ছিল অনুমোদন সাপেক্ষ তবু সর্বোচ্চ শাসনকর্তার (Government) নির্দেশে যেকোন রাজস্ব সংগ্রহকারী কর্মচারী ম্যাজিস্ট্রেটদের ক্ষমতা পেতে পারতো। এই আইনের

মধ্যে একটি বিশেষ সংকেত পাওয়া গেল যে, একজন সমাহর্তা তার জেলায় সরকারের মুখ্য প্রতিনিধি হওয়ার পদমর্যাদা ফিরে পেতে চলেছে।

আদেশ জারি হল যে, নতুন বিচারব্যবস্থা ও আইনের নিয়মকানুন বাংলার মতো মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতেও চালু করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রাজের জেলাসমাহর্তা তাঁর দেওয়ানি ও ফৌজদারী বিচারকের ক্ষমতা হারালেন; পুলিশ দপ্তরের সঙ্গেও তার সম্পর্ক রইল না। ছোটখাটো মামলা বিচারের জন্য একজন ভারতীয় কমিশনার নিযুক্ত হলেন, তাঁর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার ভার পড়ল প্রাদেশিক আদালতের হাতে। বিচারপতিদের নিয়ে একটি 'Court of Circuit' তৈরি করা হল, যার কাজ হল বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করে বিচারকদের দিয়ে গুরুতর ফৌজদারী মামলার বিচার করানো।

উত্তর ভারতের জেলাগুলিতে জেলা জজের পদের সঙ্গে জেলা শাসকের পদ যুক্ত হল। তাদের নিয়ন্ত্রণে এল নতুন পুলিশ বাহিনী (থানাদার ও দারোগা) যারা আবার গ্রাম্য প্রহরী চৌকিদারদের কাজ পর্যবেক্ষণ করত। কিন্তু এই পদ্ধতিও খুব ফলপ্রসূ হল না; অজ্ঞ, নিরক্ষর ও দরিদ্র আদালতের সাহায্য চাইল না, কারণ আদালত তাদের কাছ থেকে যেমন দূরে অবস্থিত, তেমনি ব্যয় সাপেক্ষ।

1816 সালে জেলা শাসকের কার্যালয় ও পুলিশ প্রশাসনের ভার জেলা জজের হাত থেকে সমাহর্তার হাতে দেওয়া হল। দারোগা ও থানাদারদের পদ বাতিল হল। গ্রামের প্রধান ব্যক্তি (Headman) ছোট ছোট খাজনা সংক্রান্ত মামলার বিচার করতে পারতো, গ্রাম পঞ্চায়েত সমস্ত মামলার (টাকার ঊর্ধ্বসীমা ছিল না) বিচারের ভার নিত, যদি মামলায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সম্মতি দিত। মুন্সিফ নিযুক্ত হয়েছিল খাজনা সংক্রান্ত মামলার (200 টাকা সীমার মধ্যে) বিচারের জন্য।

শেষপর্যন্ত জেলাগুলি এক একটি ইউনিট হয়ে দাঁড়াল, জেলা সমাহর্তা হলেন প্রশাসনের প্রতিনিধি। নিয়ম লঙঘন করলে সমাহর্তার সিদ্ধান্ত বাতিল করতে পারতো বোর্ড অব রেভিন্যু, সরকার তাকে সরিয়ে দিতে পারতো। কৃষকদের কাছে এই পরিবর্তন আশাপ্রদ বলে বোধ হল; তারা এখন স্বার্থরক্ষার জন্য তাদের সমাহর্তার (Collector) ওপর নির্ভর করতে পারতো। যুগের পর যুগ তারা অসৎ ও নির্দয় জমির মালিকের দাসত্ব ও মেহনতের ভারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

মাদ্রাজের গভর্নর টমাস মুনরোর মতো কেউ কেউ অনুভব করেছিলেন যে, জেলা সমাহর্তার মধ্যে এমন এক বিধিসংগত ক্ষমতা থাকা উচিত, যার কাছে প্রজারা এসে তাদের কথা বলতে পারে, এবং যে সাথে সাথেই তাদের প্রতি ন্যায়বিচার প্রদর্শন করতে পারে। প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড বলেছেন যে, জেলা সমাহর্তা হল সরকারের চোখ ও মুখ। জেলার নাড়ী দেখতে তাকে আঙুল

দিতে হয় তার অজ্ঞাতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটছে বলে মনে করা যায় না। তার কানে আসবে না, এমনভাবে একটি চড়াইয়েরও পতন হওয়া উচিত নয়।[1]

1857 সালের অভ্যুত্থান সকলের চোখ খুলে দিল। সকলেই বুঝতে পারলো যে শাসক ও শাসিতের মধ্যে সমুদ্রপ্রমাণ ব্যবধান। 1859 সালে আবার কালেক্টর (সমাহর্তা) ফিরে এল; একদিকে সরকারের একমাত্র প্রতিনিধি, অন্যদিকে জনসাধারণের অভিভাবক। কিন্তু কালেক্টর থেকে জজ, জজ থেকে কমিশনার—কার্যনির্বাহক পদ থেকে বিচার বিভাগ আবার বিচারক থেকে ম্যাজিস্ট্রেট—এই নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতেই লাগল।

দুর্ভিক্ষের মতো ভয়ঙ্কর ঘটনায় একথা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, কর্মক্ষেত্রে একতাবদ্ধতা ও সমন্বয় সাধন একান্ত প্রয়োজনীয়, বিশেষভাবে সংকটজনক অবস্থার মুখোমুখি সময়ে। জেলা সমাহর্তা তাঁর জেলার সর্বত্র ঘুরে দেখবেন, এটাই আশা করা হয়েছে। তাঁদের কেউ কেউ যে, জেলা উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল অথবা আদিবাসীদের সম্বন্ধে আগ্রহী হবেন, তাও কিছু অস্বাভাবিক নয়। তিনি তাঁর জেলার অবস্থা ও ঘটনাবলী সম্বন্ধে গভর্নমেন্টকে সংবাদ দেবেন। তাঁর অনেক ক্ষমতা, যার পরিধি জেলা অনুসারে বিভিন্ন। পরবর্তীকালে জেলা সমাহর্তাকে জেলার বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ভার নিতে হয়েছিল। তার কাজের পরিদর্শন ভার ছিল বিভাগীয় ভুক্তিপতি (Divisional Commissioner) ও রাজস্ব পর্ষদের (Board of Revenue) হাতে—রাজস্ব আদায় সম্পর্কিত ব্যাপারে এবং বিচার সম্পর্কিত ব্যাপারে জেলার প্রধান বিচারক (District Judge) ও হাইকোর্টের হাতে।

উনবিংশ শতাব্দীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এল নতুন পরিবর্তনের ধারা; যেমন জেলা পর্ষদের ও পৌরসভার গঠনতন্ত্র গড়ে উঠল, জেলা সমাহর্তাকেও মুখোমুখি হতে হল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের। কাজের পরিমাণও যেমন বেড়ে গেল, তেমনি তার জটিলতা। সমাহর্তা অতিমানবের মতো নানা ঘটনা সামলাতে যখন ব্যস্ত তার শাসনের স্বাধীনতা প্রচণ্ডভাবে আঘাত পেল তার সঙ্গে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের যোগাযোগের প্রাকৃতিক দূরত্ব হ্রাস পাওয়ায়, ভাল রাস্তা তৈরি হওয়ায় ও রেলপথ গড়ে ওঠায় পথের দূরত্ব কমে গিয়েছিল। ইংরাজ সমাহর্তাদের কাছে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে যাওয়া শক্ত কাজ হয়ে উঠেছিল, কারণ ভারতীয়করণের দাবির সঙ্গে জাতীয়তার বোধ জেগে উঠেছিল। জেলা সমাহর্তাদের বেশির ভাগ সময় যেতে লাগল মন্ত্রীদের কাছে সংবাদ সরবরাহ করার কাজে; আইনসভায় উত্থিত প্রশ্নের উত্তর দিতে হত মন্ত্রীদের, সেই প্রশ্নের ভিত্তিতে সংগ্রহ করতে হত সংবাদ। তাদের কাজের রূপ স্পষ্টই বদলে যাচ্ছিল।

এইভাবে জেলা সমাহর্তার পদ ও দায়িত্বের বিবর্তন ঘটেছে। তার আরম্ভ জমির খাজনা আদায়কারী রূপে; জমির মালিকানা নির্ণয়ের দায়িত্ব ও প্রজাস্বত্ব সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসার ভারও তাকে নিতে হয়েছে। জেলায় ফৌজদারী বিচারের ভার এবং জেলা শাসকের দায়িত্বও তার ওপর এসে পড়েছে। এই কাজের মধ্যে রয়েছে জনসাধারণের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা। অপরাধ নিবারণ ও অপরাধীকে খুঁজে বার করার জন্য থেকেছে পুলিশ, দুষ্কৃতীদের বিচার জেলা সমাহর্তার পর্যবেক্ষণে। এইভাবে জেলাপুলিশ জেলা সমাহর্তার/জেলা শাসকের কার্য নির্বাহক বাহু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার দায়িত্বের অন্তর্গত হয়েছে অধীনস্ত শাসকদের নিয়ন্ত্রণ করা, জেল ও অন্যান্য দপ্তর পরিদর্শন। মহকুমাস্তরে তশিল (মহকুমা ও গ্রামের মাঝামাঝি) ও গ্রামস্তরের রাজস্ব বিভাগে তার সাহায্যের জন্য প্রচুর কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে। জমাবন্দি বা জরিপের কাজে এবং তার জন্য বিভিন্ন স্থানে ক্যাম্প করে থাকতে অনেক সময় লেগেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সঙ্গে এসেছে রেশন ব্যবস্থা; লেখালেখি ও পরিসংখ্যানগত সংবাদ দেওয়ার কাজও বেড়েছে। ভূমিকম্প ও দুর্ভিক্ষের দুর্যোগ সামলানোও তার কাজের মধ্যে পড়েছে। জমি অধিগ্রহণের কাজের গুরুত্ব বেড়েছে। ভারতে ব্রিটিশ শাসন যখন শেষের দিকে এগিয়েছে, ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের (I.C.S.) একজন ইংরাজ কর্মচারী হিসাবে কাজ করার উত্তেজনা ও আনন্দও আস্তে আস্তে কমে এসেছে।

জেলা সমাহর্তার ভূমিকা বর্ণনা করে মন্টেগু চেমসফোর্ড রিপোর্টে বলা হয়েছে ঃ

> জেলা প্রশাসকের দ্বৈত ভূমিকা, রাজস্ববিভাগের প্রধান শাসক হিসাবে অধস্তন আদালত ও বিশেষভাবে পুলিশের কাজের ওপর তদারকি। যে সব স্থানে স্থায়ী বন্দোবস্ত নেই, সেসব অঞ্চলে, রাজস্ব বিভাগের জন্য কর্মচারীদের সহায়তায়, সে তার জেলার যে কোন অংশের প্রত্যেক ইঞ্চি স্থানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। অন্য কতকগুলি বিশেষ ধরনের কাজ তাদের নিজস্ব কর্মীকুল নিয়ে আছে। কিন্তু কমবেশি সকল ব্যাপারেই জেলা প্রশাসক তার প্রভাব বিস্তার করে থাকে; সব কিছুর মধ্যেই সে আছে প্রয়োজনে তার সহায়তা দিতে এবং প্রয়োজন হলে বিশেষজ্ঞ কর্মচারী ও সাধারণ মানুষের মধ্যস্থতা করতে।[2]

জেলা সমাহর্তা জেলা স্তরে প্রশাসনের মধ্যমণি হয়েই আছেন। এখন তাঁর কোন বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব নেই; তবু জমির খাজনা সমেত সমগ্র রাজস্বের সংগ্রহই শুধু নয়, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং জেলার শাসন কর্তৃত্বের দায়িত্বও তাঁরই। ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস খুব খুশি নয় যে, জেলাগুলিতে ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের কর্মচারীরা তাদের নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়াও তাঁর দায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে জেলায় জেলায় পরিকল্পনা ও উন্নয়নের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে তার রূপায়ণের ভার।

যাইহোক, নতুন বিকেন্দ্রণ ব্যবস্থার ফলে, পঞ্চায়েতরাজ অথবা স্থানীয়

স্বায়ত্তশাসনের কাঠামোতে সমাহর্তার ভূমিকা কি হবে, তা অনুমানের বিষয় মাত্র। ব্রিটিশ কর্মচারীরা যে অবস্থার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল সেই অবস্থার মুখোমুখি হতে সকলকেই প্রস্তুত হতে হবে। অর্থাৎ আঞ্চলিক স্তরে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধীনে কাজ করা এবং তাদের ভূমিকার হানি হতে দেখা। কিন্তু দেওয়ালের লেখা পরিষ্কার। অরণ্যের সিংহের মতো সমাহর্তার পদের গুরুত্ব মিলিয়ে যেতে চলেছে। শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র। অন্য দেশেও একই ঘটনা ঘটেছে। ফ্রান্সে 1982 সালে প্রিফেক্ট-এর পদ লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সরিয়ে দেওয়া হয়েছে জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত সাধারণ পরিষদের (General Council) হাতে। শ্রীলঙ্কায় পার্লামেন্টের একজন সদস্য, যিনি জেলা উন্নয়ন পরিষদের (D.D.C.) সভাপতি এবং যে ব্যক্তি জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা সভাপতিরূপে নির্বাচিত, তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন জেলা সমাহর্তাকে, যাঁকে সরকারের প্রতিনিধি বলা হয়।

আরক্ষা প্রশাসন

আরক্ষা বিভাগের পুনর্গঠনের জন্য 1788 সালে কর্নওয়ালিস একটি পরিকল্পনা করেছিলেন। আরক্ষা বিভাগের বিরুদ্ধে নালিশের তদন্ত করতে তিনি একটি কমিটি গঠন করেন। 1791 সালের অক্টোবরে একটি পরিকল্প রচনা করে প্রকাশ করা হয়। তাতে তাদের করণীয় কাজের বিবরণ দেওয়া হয় এবং বেতন নির্দিষ্ট করা হয়। কলকাতায় একজন আরক্ষা অধীক্ষক নিযুক্ত করা হয়। যার কাজ আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা। 1792 সালের ডিসেম্বর মাসে পরিকল্পনাটিকে প্রদেশস্তরে প্রসারিত করা হয়। জমিদারদের পুলিশি কর্তব্যের অবসান ঘটানো হল। প্রত্যেকটি জেলায় ক্ষুদ্র অঞ্চলগুলিকে দারোগা অথবা অধীক্ষকের অধীনে আনা হয়। ঐ দারোগা ও অধীক্ষককে জেলায় কোম্পানীর যিনি প্রতিনিধি (কর্নওয়ালিসের পরিকল্প অনুযায়ী যিনি ইউরোপীয় কর্মচারী) তাঁর তদারকি ও তত্ত্বাবধানে রাখা হল।

ন্যায়শাসন

ন্যায়শাসনের বিবর্তনের ইতিহাসও কৌতূহলজনক। আকবর ন্যায়বিচার ও ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাবের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু অন্য মোগল শাসকদের বেশির ভাগই মনে করতেন হিন্দুরা অবিশ্বাসী বা জিম্মি। দেওয়ানি মামলায় মুসলমানরা ইউরোপীয়দের দ্বারা বিচার চাইতেন না।

তারা একথাও স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিল যে, অপরাধের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত করা দণ্ডদানের ব্যাপারে হিন্দুর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। হেস্টিংসের সময়ে জেলায় জেলায়

ফৌজদারী ও দেওয়ানি আদালত স্থাপন করা হয়। একই সঙ্গে কলকাতায় দুটি আপীল কোর্ট (অভিযোগ পুনর্বিবেচনার জন্য উচ্চ আদালত) একটি ফৌজদারী অন্যটি দেওয়ানি খোলা হয়। দেওয়ানি আদালতের প্রধান ছিলেন রাজ্যপাল, আর ফৌজদারী আদালতে একজন ভারতীয় বিচারপতি। 1773 সালের আইনে কলকাতায় সর্বোচ্চ বিচারালয় (Supreme Court) স্থাপিত হয়, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সমস্ত সম্পত্তির ওপর তার অধিকারক্ষেত্র বিস্তৃত হয়।

1790 সালে রাষ্ট্রপালের (Governor General) আদেশে বলা হয় যে, ধর্মীয় অনুসরণ বা পেশা বন্দীদের বিরুদ্ধে দোষারোপ বা দোষ প্রমাণের ব্যাপারে সাক্ষ্য দানে কোন বাধা হবে না। 1832-এর প্রবিধানে দেওয়ানি ও ফৌজদারী দুই প্রকার আদালতেই জুরির (নির্ণায়ক সভা) দ্বারা বিচারের পদ্ধতি গৃহীত হয়। তাতে ধর্মনিরপেক্ষ আইনী শাসনের সুযোগ প্রসারিত হয়, ধর্মীয় ও সামাজিক অন্যায়গুলি সামনে আনা যায়।

আইনের জগতে কর্নওয়ালিস দুটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি 23টি জেলার প্রত্যেকটি জেলা-দেওয়ানি আদালত স্থাপন করেছিলেন, তার সঙ্গে চারটি (Appeal Court) বিচার পুনর্বিবেচনা করার আবেদনের আদালত। জেলা আদালতগুলিতে তিনি বিচারের ও কার্য-নির্বাহক ক্ষমতার অধিকারকে আলাদা করে দিয়েছেন। তিনিই প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যা 'আইনের নিয়ম' নামে খ্যাত, যার অর্থ কোন কর্মচারী বা সরকার কেউই আইনের উর্ধ্বে নয়।

> রাজস্ব সমাহর্তা ও তাঁর কর্মচারীরা, বস্তুত সকল সরকারী কর্মচারীই তাঁদের সরকারী দায়িত্বে কৃত কাজের জন্য আদালতের শাসনাধীন হবে; শাসন পরিষদেরও সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যাপারে যদি যোগ থাকে, তাহলে আইন ও প্রবিধানের নিয়মে তাকে তার অধিকারের বিবরণ বিচারের জন্য এই আদালতে দাখিল করতে হবে।[3]

এইভাবে একটি বাধামুক্ত বিচারপদ্ধতি গড়ে উঠতে পারল কেন্দ্রীভূত নির্বাহী নিয়ন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও; যার মূল নীতি হল আইনের নিয়ম।

রাষ্ট্রপালের শাসন পরিষদে প্রথম আইনসচিব হয়ে এসেছিলেন লর্ড মেকলে। ভারতবর্ষে সাধারণ মানুষের জন্য আইনের নিয়মাবলী প্রণয়ন করা ও এমন একটি পদ্ধতি তৈরি করা যা ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের এবং দেওয়ানি ও ফৌজদারী বিচার পদ্ধতির বনিয়াদ হয়ে গিয়েছে, তার কৃতিত্ব মেকলের। ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যম হিসাবে ইংরাজির প্রবর্তন ও ইংরাজি শিক্ষায় উৎসাহ সৃষ্টির কৃতিত্বও তাঁর।

1858 সালে ইংল্যান্ডের রাজা যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে ভারত শাসনের ভার নিয়ে নিলেন, জেলার আদালতগুলিতে ও সর্বোচ্চ আদালত তুলে দেওয়া হল। পরিবর্তে প্রদেশগুলিতে প্রধান বিচারালয়গুলির সৃষ্টি। লর্ড বেন্টিঙ্ক বিচার পদ্ধতির সংস্কার সাধন করলেন ভারতীয় বিচারকদের দুটি ক্রম বেঁধে দিয়ে।

কর্নওয়ালিসের সময় থেকে এতদিন সে জায়গায় ইউরোপীয়দের একাধিপত্য ছিল। মোগল যুগ থেকে ফারসি ছিল রাজভাষা, সে জায়গায় তিনি ইংরাজি ভাষার প্রবর্তন করলেন।

সম্রাটের অধীনে ভারতবর্ষ ঃ দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে ব্রিটেনের সম্পর্ক

ভারতবর্ষের ওপর থেকে মোগল সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ চলে যাওয়ায় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতের বিভিন্ন অংশে তার আধিপত্যকে গুছিয়ে নিল ও দৃঢ় করে তুলল। দক্ষিণে হায়দার আলি ও টিপু সুলতানের সঙ্গে, পুনায় মারাঠাদের সঙ্গে, বাংলায় সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে এবং পাঞ্জাবে শিখদের সঙ্গে কোম্পানী যুদ্ধে নামল। আস্তে আস্তে বিভিন্ন অংশকে অধিকার করল। এইভাবে আধিপত্য বিস্তার করা তার পক্ষে সম্ভব হল, কারণ, দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে অনৈক্য যেমন ছিল, ব্রিটিশের নৌশক্তিও তেমনি প্রবল ছিল। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যখন পিটের ইন্ডিয়া অ্যাক্ট (1784) বিধিবদ্ধ হল তখন তাতে বলা হল যে, কোম্পানীকে অন্য রাজ্য আক্রমণ না করা, ও অন্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতিকে অনুসরণ করতে হবে। ভারতের রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, অথবা ব্রিটিশকে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়, এমন কোন চুক্তিতে যোগ দেওয়া নিষিদ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু রাষ্ট্রপালেরা অন্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতিতে টিকে থাকতে পারেন নি। এই উপমহাদেশে ইঙ্গ-ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রভাবে, পিণ্ডারীদের দস্যুতা ও খুনের সমস্যার সমাধানে, এবং মধ্য ভারতের দস্যু সর্দারদের প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে দেশ অধিকার করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। মাকুইস অব ওয়েলেসলি ও তাঁর পরবর্তী গভর্নর জেনারেল যাঁরা এসেছেন, তাঁরা বাধ্য হয়েছেন আক্রমণের নীতিকে অনুসরণ করে ঐসব দেশকে ব্রিটিশের অধীনে আনতে। এইভাবে ব্রিটিশ-ভারতের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। মাকুইস অব হেস্টিংস, লর্ড হার্ডিঞ্জ, লর্ড ডালহৌসি যুক্ত হয়েছেন সাতারা (1848), নাগপুর (1853), ঝাঁসি (1854) ও অযোধ্যা (1856) দখলের কাজে। তাঁরা সুদৃঢ় করেছেন ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে আর সম্পূর্ণ করেছেন সেই কাজ যা ওয়েলেসলি আরম্ভ করেছিলেন। 1813 সাল থেকে 1857-র মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলকে সাম্রাজ্যের অধীনে করার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং দেশীয় রাজাদের ব্রিটিশ স্বার্থের অনুকূলে আনার কাজ শেষ হয়েছিল। রাজাদের বিশ্বস্ততা অর্জন করা হয়েছিল, তাদের অধিকৃত সম্পত্তি ও মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে, তারাও বিনিময়ে ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের জালে ধরা পড়েছিল। বাস্তবে শেষ পর্যন্ত যা ঘটেছিল তা হল দুটি ভারতবর্ষের সৃষ্টি—ব্রিটিশ ভারত এবং ভারতীয় ভারত (দেশীয় রাজাদের অধিকৃত ভারত)। অত্যন্ত জটিলতায় ভরা সমস্যা যা স্বাধীন ভারতবর্ষকে পেতে হয়েছে। 1857

সালের অভ্যুত্থানের পর ব্রিটিশ সরকার স্থির করল যে, দেশীয় রাজা ও ভূম্যাধিকারী (বিহার ও উত্তরপ্রদেশের জমিদার বা জোতদারও তার অন্তর্গত)-দের স্বপক্ষে এনে এবং একতাবদ্ধ করে পুরস্কৃত করা হবে, তারা যে আনুগত্য দেখিয়েছে তার জন্য। তাদের মধ্যে ছিল রাজপুত, মারাঠা ও শিখ সর্দারেরা এবং বেরারের নিজাম। তাদের অনেকে বিশেষ পুরস্কার লাভ করেছিল এবং সাম্মানিক শাসনকর্তার পদ পেয়েছিল। কিন্তু আরও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, তাদের রাজ্য বা ভূসম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব ব্রিটিশ সরকার নিচ্ছে। প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে স্বীকার করে তার অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতাকেও মেনে নেওয়া হয়েছিল। তবে একটি রাজ্য অন্য কোন রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে পারবে না। হায়দরাবাদের নিজাম তাঁর রাজ্য শাসনের জন্য চণ্ডুলাল নামে একজন হিন্দুকে নিযুক্ত করেছিলেন। কাজের দিক থেকে যোগ্যতা থাকলেও চণ্ডুলাল অপরাধী স্বভাবের ছিলেন। রাজ্যের প্রয়োজনে তিনি টাকা ধার করেছিলেন পামার অ্যান্ড কোং নামের এক ইংরাজ ব্যবসয়ীর কাছ থেকে। 1796 সালের আইনে ইংরাজ সরকার স্থির করেছিল যে, গভর্নর জেনারেল অনুমতি ছাড়া ইউরোপের কোন ব্যক্তি বা সংস্থা কোন ভারতীয় রাজার সঙ্গে অর্থনৈতিক কার্য সম্পাদনে যুক্ত হবে না। দেশীয় রাজা ও তার রাজ্য তারপর থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে, ইংল্যান্ডের রানীর কাছে রাজাদের আনুগত্য স্বীকার করতে হয়েছে। আধুনিক শাসন পদ্ধতি শিখবার জন্য দেশীয় রাজাদের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। 1818 থেকে 1857-র মধ্যবর্তী সময়েই এই সম্পর্কবোধের সূচনা। অনেকগুলি চুক্তিপত্রে এই সম্পর্ককে দৃঢ় করা হয়েছে। এই সব চুক্তিপত্রে রাজ্যের মধ্যে রাজাদের শাসনের স্বাধীনতাকে মানা হয়েছে, অন্যদিকে তাদের স্বীকার করে নিতে হয়েছে তাদের ওপরে ব্রিটেনের রাজনৈতিক ও সামরিক প্রাধান্যকে। এক সময়ে এই নিয়ে এক অদ্ভুত অবস্থা দেখা দিয়েছিল, যখন দিল্লির মসনদে মোগল সম্রাট বসে থাকা সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক প্রভুত্ব সকলেই মেনে নিয়েছিল।

> আমাদের সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করে তোলার যে কাজ লর্ড ওয়েলেসলি আরম্ভ করেছিলেন, তা সম্পূর্ণ করার কৃতিত্ব লর্ড হেস্টিংসের। সবার ওপর লর্ড হেস্টিংসের কাছেই আমরা কৃতজ্ঞ, সেই অংশীদারসুলভ বন্ধুত্বমূলক সহযোগিতার নীতি গড়ে দেওয়ার জন্যে, যা এখন ভারত সরকার ও দেশীয় রাজ্যগুলির সম্পর্ক নির্ধারণের পথ তৈরি করেছে।[4]

জনমুখি কাজের পরিমাপ

শুধুমাত্র যুদ্ধবিগ্রহই নয়, শান্তির সময়ে যেসব কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়, যেমন শিক্ষার প্রসার, তাও গ্রহণ করা হয়েছিল এই উত্তাল বছরগুলিতে। ওয়ারেন হেস্টিংস মুসলমানদের জন্য আরবি ও ফারসি ভাষার কলেজ খুলে দিয়েছিলেন। 1791 সালে বারাণসীতে একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। লর্ড ডালহৌসির সময়েও সরকারী

বিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ দেখা দেয়। ইউরোপীয় পরিচালকদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষাদপ্তরগুলি গড়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে। কলকাতায় ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজের কাজও আরম্ভ হয়। ভারতবর্ষে তাদের এক নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে, এই বোধের প্রেরণায় লর্ড বেন্টিঙ্কের সময় সরকারী ইংরাজি বিদ্যালয়ও খোলা হয়েছে।

1857-র পর ঃ ভারতকে স্বশাসিত করার পথে

1857-র অভ্যুত্থানকে ভারতে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা হয়। তারপরের ছবি ব্রিটেনকে ঘিরে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী পুরোপুরি মিলিয়ে গিয়েছে; ভারত শাসনের পুরো দায়িত্ব নিয়েছে ব্রিটেন। অনেকেই একথা বলে যে, মোগল যুগের শেষ এখানেই। বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে হিন্দুস্থানের সম্রাট বলে ঘোষণা করা হয়েছিল, তাঁকে এখন বন্দী করে বর্মায় নির্বাসিত করা হল। সেক্রেটারী অব স্টেট এখন থেকে ভারতের দেখাশোনার কাজ করবেন; লর্ড ক্যানিং ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হলেন, তাঁকে এখন থেকে ভাইসরয় নামে অভিহিত করা হবে।

পরবর্তী 90 বছরে ভারতবর্ষে পার্লামেন্টারি স্বশাসনের পদ্ধতি আনতে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা ও আঞ্চলিক প্রশাসনের পথে যেতে। এর জন্য তিনটি প্রবিধান (ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট 1861, 1892 ও 1909) যা মর্লে মিন্টো রিফরম্স্ নামেও খ্যাত, মন্টেগু চেমসফোর্ড রিফরম্স্-এর ভিত্তিতে গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1919, গোল টেবিল বৈঠক— 1930, 1931, 1932 এবং গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1935 রচনা করা হয়েছে। প্রশাসনের শীর্ষস্তরে বৃহত্তর ভারতীয় যোগাযোগের আরম্ভ এভাবেই।

ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস-এর সৃষ্টি, আর কিভাবে তা ব্রিটিশ ভারতের চিন্তাধারাকে ধরে রেখেছিল, তা নিয়ে এবারে আলোচনা করব।

ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (I.C.S.)

রোমান্টিক উপন্যাস রচয়িতা বার্বারা কার্টল্যান্ড স্বর্গতা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, তিনি কি মনে করেন, ব্রিটিশ ভারতবর্ষকে কিছু দিয়েছে? শ্রীমতী গান্ধীর উত্তর ছিল, 'হ্যাঁ, তোমরা আমাদের দিয়েছ ইংরাজি ভাষা, রেলওয়েজ ও সিভিল সার্ভিস, যা না পেলে ভারতকে সক্রিয় রাখা সম্ভব হত না'।[5] ভারতবর্ষকে সক্রিয় করে রাখতে সিভিল সার্ভিস কিভাবে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে একথা বুঝতে হলে লর্ড ডাফরিন যা বলেছেন, তার মর্ম অনুধাবন করতে হবে। তিনি বলেছিলেন, এই দেশের মতো দেশ আমি কখনও দেখিনি। এক কেটলি ফুটন্ত জল থেকে একজন বার হতে না হতেই আর একজন কেটলিতে সে আকণ্ঠ মগ্ন।[6] ব্রিটিশ

যখন দেশশাসন আরম্ভ করল তাদের জটিল রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থা যেমন জানতে হয়েছে, তাদেরকে সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশে ভাষা শিক্ষা করে দেশের ভূগোল, কৃষ্টি ও ইতিহাস সম্বন্ধে অবহিত হয়ে শাসনের কাজ পরিচালনা করতে হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা যেখানে অপ্রতুল, তাদের জেলায় গিয়ে নেতৃত্ব দিতে হয়েছে, স্থানীয় সম্প্রদায়ের মানুষের মা-বাপ হয়ে কাজ করতে হয়েছে, তাদের হিতসাধনে রত হতে হয়েছে। তাদের দান প্রধানত জেলা প্রশাসনে এবং বিচার ব্যবস্থায় যার মধ্যে তাদের ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞানের সবটুকু তারা দিয়েছে।

কিছু ভারতীয় আধিকারিক সিভিল সার্ভিসে (I.C.S.) প্রবেশ করে বিদেশী শাসকের অধীনে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় রেখেছে। একই সঙ্গে ভারতীয় হওয়ায় জাতির স্বার্থরক্ষার কথা তাদের হৃদয়ে নিবদ্ধ থেকেছে। এই দ্বৈত চাপের মধ্যে তাদের অনেক সময়ে যে উভয় সঙ্কটে পড়তে হয়েছে, তার পরিচয়ও নথিভুক্ত হয়ে আছে। ডেভিড সিপটার লিখিত ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটরস 1919-1983, (1986) পুস্তকে।

আই সি এস একটি বিশেষ সুবিধাযুক্ত চাকরি। এর জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী সংগ্রহ করে তাদের বিশেষভাবে কর্মোপযোগী করে নেওয়া হত। তার জন্য অল্প বয়সের প্রতিযোগীরাই স্থান পেত। কঠোর শিক্ষণ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তাদের দেওয়া হত ভাষা শিক্ষা, এক বিদেশী জনসমাজের প্রশাসনের কাজে তাদের যোগ্য করে তোলা হত, বিচার কার্যের জন্য কিছু আইনের শিক্ষা। জেলা সমাহর্তারূপে—আই সি এস আধিকারিকদের শাসন ক্ষমতা ছিল, ক্ষমতার পরিধিও বিস্তৃত ছিল। অন্যদিকে চাকুরির কার্যকালের স্থায়িত্ব, বিশেষ সুবিধা ও অধিকার ও মর্যাদা এই চাকরিকে আকর্ষণীয় করে রেখেছিল।

আই সি এস ছিল চুক্তিবদ্ধ সরকারী চাকুরি। এর চাকুরেরা প্রথমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও পরে সেক্রেটারী অব স্টেট ইন কাউন্সিল-এর সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হত। প্রথমদিকে তাদের নেওয়া হত কোম্পানীর বণিক ও ব্যবসায়ী সংস্থার কেরানিদের মধ্য থেকে। দেশের বিভিন্ন অংশে কোম্পানীকে সামরিক কর্মেও লিপ্ত থাকতে হত, সিভিল সার্ভিসে নেওয়া হত তাদের যারা অসামরিক বিভাগের কর্মী। 1793 সালের প্রবিধানে (Charter Act of 1793) বলা হল যে, ভারতবর্ষে কোম্পানীর চাকুরির শূন্যস্থানগুলি, তা যে কোন কার্যালয়ে বা স্থানেই হোক না কেন, কতকগুলি নির্দিষ্ট নিষেধ ছাড়া কোম্পানীর চাকুরেদের মধ্য থেকেই পূর্ণ করতে হবে।[7] কিন্তু বিভিন্ন দেশ অধিকারের জন্য এবং প্রশাসনের নতুন নতুন এলাকায় কর্মচারীর চাহিদা বাড়ায়, সামরিক কর্মচারীদের সাময়িকভাবে নেওয়া হতে লাগল। তারা ইউরেশীয়, ইউরোপীয় বা ভারতীয় হতে পারত; এই অবস্থাকে নিয়মের মধ্যে

আনা হল ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস অ্যাক্ট 1861-এর দ্বারা। স্বাধীনতার পরেও আমাদের অনুরূপ সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে। সিভিল সার্ভিসে কর্মী সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় জরুরী নিয়োগের দ্বারা বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে, সামরিক বিভাগ, অল ইন্ডিয়া রেডিও, রাজ্য প্রশাসন থেকে কর্মচারী নেওয়া হল। বয়স ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাদের উচ্চপদস্থতা (Seniority) নির্ধারিত হল, তাদের গ্রহণ করা হল ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস (I. A. S) পদমর্যাদায়।

কর্মী নিয়োগে প্রার্থী সংগ্রহের পদ্ধতি ও বয়সের সীমা ক্রমান্বয়ে বদলে গিয়েছে। যেমন 1853 সালে 18 থেকে 23 বছর বয়সের ছেলেদেরই শুধু প্রতিযোগিতায় বসার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। বোর্ড অব কন্ট্রোলের নিয়ম অনুসারে ইংল্যান্ডেই পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল; পরীক্ষার্থীদের কোন ফি দিতে হত না। শিক্ষানবিশির জন্য সময় রাখা হয়েছিল। বয়সের সর্বোচ্চ সীমা কমিয়ে আনা হয় 1859 সালে বাইশে, 1866 সালে একুশে এবং 1871 সালে উনিশে।

ওয়েলেসলি প্রথম কলকাতায় একটি কলেজ স্থাপন করেন (ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ 1800 খ্রীঃ)। উদ্দেশ্য ছিল সরকারী কর্মচারীদের সাহিত্য, বিজ্ঞান ও প্রাচ্য ভাষায় শিক্ষা দেওয়া। এই কলেজ 1854 সাল পর্যন্ত চালু ছিল, কিন্তু শেষের দিকে বাংলার সরকারী কর্মচারীদের ভাষা শিক্ষার কেন্দ্র রূপে। 1806 সালে কোম্পানীর মনোনীত নব প্রবেশকদের জন্য হাইলি বাড়িতে ইস্ট ইন্ডিয়া কলেজ স্থাপিত হয়। এই কলেজটি 1858 সাল পর্যন্ত চালু ছিল।

পরবর্তীকালে সেক্রেটারী অব স্টেট ইন কাউন্সিল-ই শুধু এই চাকরির জন্য মনোনয়ন দিতে পারতেন। পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে 1860 সালে 80টি পদের জন্য 154 জনের স্থানে 1870 সালে 40টি পদের জন্য 325 জনে দাঁড়ায়। 1871 সালে পরীক্ষার জন্য 5 পাউন্ড ফি ধার্য হয়। 1869 সালে তিনজন বাঙালী পরীক্ষা দেয় (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি) এবং তিনজনেই সফল হয়। ভারতীয় প্রতিযোগীদের আকর্ষণ করতে 1868 সালে 9টি বৃত্তি দেওয়া হয়েছিল, যার বার্ষিক মূল্য ছিল 200 পাউন্ড।

1875 ও 1879 সালে নিয়মাবলীর কিছু সংশোধন করা হয়। এই চাকরিতে নিয়োগের শর্ত ঃ প্রতিযোগীরা হবে সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন, সদ্‌বংশের যুবক, তারা হবে কর্মযোগ্যতাসম্পন্ন ও শিক্ষাপ্রাপ্ত, যারা কোম্পানীর সাধারণ স্তরের (Uncovenanted) চাকরিতে যোগ দিকে যথেষ্ট আগ্রহ বোধ করে না। বিচার বিভাগে যোগদানেচ্ছু প্রার্থীদের আইনের ডিগ্রী থাকা চাই।

1885 সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রস্তাব দিল যে, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা ইংল্যান্ড ও ভারতবর্ষে একই সঙ্গে নেওয়া হোক। 1922 সালে এ প্রস্তাবে সম্মতি মেলে।

1886 সালে লর্ড ডাফরিন পাঞ্জাবের শাসনকর্তা চার্লস এচিসনের অধীনে একটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন স্থাপন করেন। কমিশনে পাঁচজন ইংরেজ ছাড়াও উচ্চপদস্থ চারজন হিন্দু ও দুজন মুসলমান সভ্য থাকবে। পি এস সি সুপারিশ করল যে, পরীক্ষাগুলি ব্রিটেন থেকে পরিচালিত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত; সংবিধিবদ্ধ চাকরি (কোম্পানীর সুপারিশ করা প্রার্থীরা যার অন্তর্গত) বাতিল হয়ে যাক, এবং একটি প্রাদেশিক চাকরির পদ আসুক। শর্তাধীন ও শর্তবিহীন চাকরির মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। সরকারী কাজের মধ্যে থাকবে দি ইম্পিরিয়াল সিভিল সার্ভিস এবং একটি নিম্নবর্তী সিভিল সার্ভিস যার অন্তর্গত হবে প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস। আধিকারিকরা প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস থেকে ইম্পিরিয়াল সিভিল সার্ভিসে উন্নীত হতে পারবে।

ইম্পিরিয়াল সার্ভিস

1893 সালে সেক্রেটারী অব স্টেট যখন প্রস্তাব দিলেন যে, একসঙ্গে নেওয়া পরীক্ষাগুলি ও সমস্ত প্রতিযোগীদের একটি তালিকায় গুণানুসারে দেখানো হোক, তখন বাধা এল ব্রিটেন থেকে এই যুক্তিতে যে, দেশ (অর্থাৎ ভারতবর্ষ) এর জন্য প্রস্তুত নয়।

> দেওয়ানি পদে সামরিক কর্মচারীদের নিয়োগ নিষিদ্ধ হওয়া উচিত নয় এই আবেদন নিয়ে বর্মা সরকার 1906 সালের অক্টোবরে লর্ড মিন্টোর শাসন দপ্তরকে একটি চিঠি দেয়। ঐ চিঠিতে প্রশাসনিক আধিকারিকদের কি কি গুণ থাকা উচিত, তার যে বর্ণনা বর্মা সরকার দিয়েছিলেন এখানে তার উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে করি। ঐ গুণগুলি তখনকার চেয়ে এখন আরও বেশি দরকার। নিখাদ বুদ্ধিই প্রশাসকের একমাত্র গুণ নয়। উদ্ভাবনী শক্তি চরিত্রের সবলতা, সাধারণ মানুষ সম্পর্কে জ্ঞান ও তাদের জন্য সহানুভূতি— এগুলিও চরিত্রের মূল্যবান উপাদান। বুদ্ধির বৈচিত্র্যও বিশেষ প্রয়োজনীয়।[৭]

1919 সালের গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্টে একটি শর্ত ছিল, যার বলে সেক্রেটারী অব স্টেট ভারতবর্ষে সিভিল সার্ভিসের শ্রেণীবিভাগের জন্য নিয়ম তৈরি করতে পারতেন; লোক নেওয়ার পদ্ধতি, চাকরির শর্তাবলী, বেতন ও অ্যালাওয়েন্স, শৃঙ্খলা ও ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়েও তিনি নিয়মাবলী তৈরি করতে পারতেন। সিভিল সার্ভিসের চাকুরির ব্যাপারে চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল সেক্রেটারী অব স্টেট ইন কাউন্সিল-এর হাতে। চাকুরির শর্ত বিষয়ক ব্যাপারে মূল নীতিগুলি সেক্রেটারীর হাতেই তৈরি।

1919 সালের প্রবিধানে 'সার্ভিসে' ভারতীয়দের সংখ্যা বাড়ানোর অনুকূলে শর্ত

দেওয়া হয়েছিল, তবে এই নীতি প্রযোজ্য ছিল প্রাদেশিক প্রশাসনে যাদের যাদের দেওয়া হয়েছিল তাদের সম্বন্ধে। সিভিল সার্ভিসের ব্যাপারে, বিশেষ করে চুক্তিপত্রের পর্যবেক্ষণ ও কার্যে পরিণত করার ক্ষেত্রে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখা ভারতীয়করণের ফলে আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠেছিল। ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস ও ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস ছাড়া অন্যান্য সর্ব ভারতীয় সরকারী চাকরিগুলির মধ্যে ধরা হয়েছিল—ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস, ইন্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিস, ইন্ডিয়ান সার্ভিস অব ইঞ্জিনিয়ার্স, ইন্ডিয়ান ভেটারিনারি সার্ভিস, ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস, ইন্ডিয়ান ফরেস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস প্রভৃতি। কিন্তু পরবর্তীকালে শেষের দিকের উল্লিখিত চাকুরির ক্ষেত্রগুলি প্রাদেশিক সার্ভিসে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

তারপর এল লী কমিশন 1924 সালে। তাদের সুপারিশগুলি ভারতে অত্যন্ত অপ্রীতিকর হয়েছিল কারণ তাদের সুপারিশ ছিল ব্রিটিশ আই সি এস আধিকারিকদের বেতন, ইংল্যান্ড যাওয়ার ব্যয়, পেনসন ইত্যাদি বাড়িয়ে দেওয়া হোক। কমিশনের অন্যান্য সুপারিশগুলির মধ্যে ছিল সর্বভারতীয় চাকুরির ক্ষেত্রে নিয়োগের যে পদ্ধতি প্রচলিত ছিল এবং সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যে নিয়ন্ত্রণ ছিল, তাই চালু থাকুক; তার প্রাদেশিক প্রশাসনে ভবিষ্যতে নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণের ভার থাকবে স্থানীয় শাসন পরিষদের হাতে। লী কমিশনও চেয়েছিল যে, সরকারী চাকুরিতে নিয়োগের জন্য একটি দায়িত্বশীল পরিষদ (Commission) বসানো হোক।

যখন স্বাধীনতা এল, কিছু ব্রিটিশ আই সি এস অফিসার ইংল্যান্ডে ফিরে গেল, কিছু আবার পাকিস্তানেও গেল। যারা এদেশের প্রশাসন চালাতে রইল, তাদের সংখ্যা খুব কম। অনেক পাহাড় প্রমাণ গুরু কাজও হাতে এল। যেমন দেশ বিভাগে যারা উদ্বাস্তু তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা, দেশবাসীর মনে আস্থার ভাব ফিরিয়ে আনা, দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতভুক্তির সমস্যার সমাধান করা, দেশশাসনের কাজ চালু রাখা, দেশকে নতুন উন্নয়নের পথে নিয়ে যাওয়া এবং সাধারণ মানুষের কল্যাণের পথ বার করা। এই সময়েই তাদের সব থেকে সফল প্রশাসক, স্বাধীনতা সংগ্রামী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল জানালেন যে, সরকারী চাকরির উচ্চতর ক্ষেত্রে কোন শূন্যতার সৃষ্টি হয়নি। ভারতের সংবিধান যখন তৈরি হচ্ছিল, তখন কিছু মানুষ সিভিল সার্ভিসের নিয়মাবলীর প্রসঙ্গে আপত্তি জানান; আপত্তির কারণ, উচ্চ মানসিকতার ভাব, জনসমাজ থেকে দূরে থাকা, এবং সরকারের অতিরিক্ত প্রশ্রয়ে থাকার অভ্যাস, যা আই সি এস-এর লৌহ কাঠামো গড়ে তুলেছে। কেউ কেউ বলেন, যে এরা ভারতীয়ও নয়, সাধারণ সমাজের মানুষও নয়; সেবাও অনুপস্থিত তাদের কাজে। সর্দার প্যাটেল তাদের কাজে বিশ্বাস জন্মাতে চেয়ে বলেছেন,

> একথা জোর দিয়ে বলার দরকার হয়না যে, যোগ্যতাসম্পন্ন, শৃঙ্খলাবদ্ধ, চাকুরির পরিবেশে পরিতৃপ্ত, পরিশ্রম ও সততার ফলে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত, সুদৃঢ় প্রশাসনের পক্ষে অপরিহার্য শর্ত। এই সত্য সর্ব কর্তৃত্বময় শাসনপদ্ধতিতে যেমন প্রযোজ্য, গণতান্ত্রিক কাঠামোতে তার চেয়েও বেশি সাংবিধানিক চুক্তি ও রক্ষার ছাড়পত্র এই চাকুরির পক্ষে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় ও স্থায়িত্বের।[10]

সংবিধানে এই রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছে যে, যে সব আই সি এস আধিকারিক 1947-র পরেও চাকরিতে থাকছে, তারা স্বাধীনতার আগে চাকরির যে সুবিধা ভোগ করেছে এখনও সেই সুবিধাগুলি ভোগ করবে। এছাড়াও নতুন আই সি এস (Indian Administrative Service) ও আই পি এস (Indian Police Service) সৃষ্টি হবে। এই শর্ত থাকা সত্ত্বেও বেশি লোক থাকেনি। এতকাল নিশ্চিন্ত পরিবেশে থাকার পর নতুন অবস্থানকে মানিয়ে নেওয়া অনেকের কাছে শক্ত বোধ হয়েছে।

আরক্ষা

অপরাধ দমন ও শাস্তিদান সংক্রান্ত নিয়মাবলী (দি ক্রিমিনাল প্রোসিডিওর কোড ও ইন্ডিয়ান পেনাল কোড লেখা হয় 1859 ও 1860 সালে; এর ভিত্তিতেই 1861 সালে ইন্ডিয়ান পুলিশ অ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হয়। জেলার পুলিশ বিভাগ ও শাসন বিভাগ কাজ করত জেলা সমাহর্তার পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণে। ব্রিটিশ আমলে পুলিশের অপরাধ দমন করা, অপরাধীর সন্ধান করা ও অপরাধীকে অভিযুক্ত করার বিস্তৃত ক্ষমতা ছিল।

1902 সালে লর্ড কার্জন একটি কমিশন বসান, তার সুপারিশে আরক্ষা বাহিনীর সকল স্তরেই বেতন বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তাদের আধাসামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রত্যেক প্রদেশে একজন আই জি (Inspector General) ও তাঁর অধীনে ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট নিযুক্ত করা হয়।

1905 সালের বাজেট বক্তৃতায় লর্ড কার্জন বলেন ঃ

> আমরা এমন একটি আরক্ষা বাহিনী চাই যারা দুর্নীতি ও অন্যায়ের প্রলোভন থেকে দূরে থাকবে। তার জন্য তাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে হবে। তারা বুদ্ধিমান, শৃঙ্খলাযুক্ত ও যোগ্যতাসম্পন্ন হবে এবং যাদের লক্ষ্য হবে প্রতিরোধ নয়, আশ্রয় দেওয়া।[11]

একথার মূল্য এখনও স্থির রয়েছে। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে একটি কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো গড়া হয়, আন্তঃ প্রাদেশিক যোগাযোগ রক্ষার জন্য। ইংল্যান্ডে প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষার দ্বারা রাজকীয় বা উচ্চ শ্রেণীর আধিকারিক নিয়োগ করা হয়, যে নিয়োগ করা হয়েছে শুধুমাত্র ইউরোপীয়দের মধ্য থেকে এবং 17-19 বছর বয়সের মধ্য থেকে। অপরাধের তদন্তের জন্যও একটি দপ্তর খোলা হয়। 1917 সালে আবার আরক্ষা দপ্তরের সংস্কার করা হয়, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশে।

অন্যান্য পরিবর্তন

রেলপথ ও সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ 1845 সালে পরীক্ষামূলক ভাবে তিনটি রেলপথ স্থাপিত হয়, কলকাতা থেকে রাণীগঞ্জ—120 মাইল; বোম্বে থেকে কল্যাণ —32 মাইল; এবং মাদ্রাজ থেকে অর্কনাম—40 মাইল। 1853 সালে লর্ড ডালহৌসি প্রেসিডেন্সিগুলির মধ্যে এবং প্রত্যেকটি প্রদেশের মধ্যভাগ থেকে তার প্রধান বন্দরের মধ্যে যোগাযোগ তৈরি করতে রেলপথ গড়ার পরিকল্পনা অনুমোদন করলেন। তিনি চাইলেন যে, সরকারী তত্ত্বাবধানে বেসরকারী সংস্থাগুলি এ কাজের ভার নিক। 1854 সাল থেকে 1860 সালের মধ্যে সরকার আটটি কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হল 5000 মাইল রেলপথ গড়ার জন্য যার নির্দিষ্ট মূলধন হবে 52 মিলিয়ন টাকা (পাঁচ কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা)।

1900 সালের মধ্যে ভারতের রেল বিভাগের বেশির ভাগ অংশ তৈরি হয়ে গেল, যদিও এর জন্য খরচ পড়ল অনেক বেশি। ভারতীয় রেলপথের কর্মপদ্ধতি ও পরিচালন ব্যবস্থা প্রসঙ্গে তাঁর প্রতিবেদনে রবার্টসন সুপারিশ করলেন রেলওয়ে বোর্ড গঠন করার। এই বোর্ডে থাকবে ব্যবসায়ীরা তাদের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকবে বাণিজ্যিক নীতিতে রেলপথ পরিচালনা করার। 1905 সালে বোর্ড স্থাপিত হয়; তারপর অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে 1922 সালে বোর্ড পুনর্গঠিত হয়। তার ফলে একজন মুখ্য মহাধ্যক্ষ (Chief Commissioner) নিযুক্ত হয়; গড়া হয় কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় উপদেষ্টা কমিটি যার সদস্যরা এল বেসরকারী মহল থেকে। 1926 সালে অভিযোগের বিচারের জন্য ভাড়া-উপদেষ্টা কমিটি গড়া হল। রেলপথের রাজ্য প্রশাসন এবং সরকারী আয়ব্যয়ের হিসাব থেকে রেলওয়ে বাজেটকে পৃথক করার কাজ শুরু হয় 1924 সালে।

সেইভাবে উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের সময়েও (1828-35) গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড কলকাতা ও পেশোয়ার-এর মধ্যে এবং গ্রান্ড ডেকান রোড মির্জাপুর ও নাগপুরের মধ্যে তৈরি করা হয়। 1880 সালেই ভারতবর্ষে 20,000 মাইল মেটাল রোড, যার কিছু কিছু অংশে সেতুবন্ধন করা হয়েছিল। 1929 সালের শাসন সংস্কারের পর পথ প্রাদেশিক শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। আঞ্চলিক সংগঠনগুলি অর্থভাণ্ডার গড়ে তুলেছে জমির ওপর ও অন্যান্যভাবে কর ধার্য করে, সে অর্থে রাস্তা ভাল করা হয়েছে। 1927 সালের সড়ক উন্নয়ন কমিটি সুপারিশ করেছে যে, সংযোগকারী রাস্তা তৈরির জন্য রেলবিভাগের উচিত অর্থ সাহায্য দেওয়া; মোটর পরিবহণ ও সড়ক উন্নয়নের জন্য কর ধার্য করার একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত, যার টাকা জমা হবে একটি স্বতন্ত্র 'সড়ক উন্নয়ন' নামাঙ্কিত হিসাবে। সেতু ছাড়া অন্যত্র কোন টোল ধার্য করা বাতিল করা হবে। 1929 সালে সড়ক উন্নয়ন ফান্ড গড়া হয় প্রত্যেক গ্যালন পেট্রলের ওপর দু' আনা (ষোল আনায় এক টাকা) অতিরিক্ত কর ধার্য করে; যার

ফলে করের পরিমাণ ছ' আনা হয়ে যায়—শতকরা দশভাগ কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারে এবং 90 ভাগ দেওয়া হবে প্রদেশগুলিকে। এর জন্য একটি ফর্মুলা তৈরি হয়েছিল।

1939 সালে মোটর ভেহিকেলস্ অ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হয়। জাতীয় সড়কগুলি রক্ষণাবেক্ষণের ভার ও নির্মাণের দায়িত্ব পুরোপুরি গেল কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে।

এমন আরও কয়েকটি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল; সেগুলিকে সংক্ষেপে হলেও লিপিবদ্ধ করতে হবে, কারণ তার প্রত্যেকটিই সরকারী নীতি ও প্রশাসনের পরিধির মধ্যেই পড়ে।

আধুনিক শিল্পোন্নয়ন ঃ প্রথম কটন মিল (তুলোর কল) স্থাপিত হয়েছে বোম্বেতে 1854 সালে। ঐ বছরেই একটি জুট মিল তৈরি হয়, এবং প্রথম কয়লা খনিও তৈরি হয় রাণীগঞ্জে। 1890 সালের মধ্যে যদিও কটন মিলের সংখ্যা পৌঁছয় 137-এ, তবু দুর্ভিক্ষের আবির্ভাবে উন্নয়নের গতি শ্লথ হয়ে যায়; 1900 সালে মোট সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় 193-তে, যার মোট কর্মী সংখ্যা ছিল 4,80,000।

1919-20 সালে নতুন জয়েন্ট স্টক কোম্পানী গড়ে ওঠে 905টি যার মোট অনুমোদিত মূলধন 146 কোটি টাকা নথিভুক্ত হয়। স্টক এক্সচেঞ্জ স্থাপিত হয় বোম্বেতে 1887 সালে, কলকাতায় 1923 সালে এবং মাদ্রাজে 1937 সালে। 1905 শিল্প ও বাণিজ্যের সর্বোচ্চ দপ্তর (Imperial Department of Industries & Commerce)-এর সৃষ্টি। স্যার টমাস হল্যান্ডের অধীনে একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমিশন প্রদেশগুলিতেও জমির নথিপত্র ও মালিকানার সবুদ সংক্রান্ত দপ্তর ও কৃষি বিভাগ স্থাপিত হল। উন্নত পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতি প্রয়োগ দেখানো হতে লাগল এবং কৃষি সম্বন্ধীয় পরিসংখ্যান সংগ্রহের কথাও ভাবা হল। 1901 সালে কৃষি বিভাগে একজন ইনস্পেক্টর জেনারেল-এর পদ সৃষ্টি করা হল, সঙ্গে সঙ্গে বিহারের পুষাতে কৃষি গবেষণা কেন্দ্র এবং কয়েকটি প্রদেশে কৃষি বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা হল। কিন্তু আই জি-র পদ তুলে দিয়ে সে জায়গায় পুষা ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টরকে ভারত সরকারের কৃষি উপদেষ্টা পদে নিয়োগ করা হল। 1930-31 সালে সরকারী কৃষি আধিকারিকদের তত্ত্বাবধানে 247টি কৃষিকেন্দ্র ছিল। 1919 সালের শাসন সংস্কারে কৃষিকে প্রাদেশিক শাসনের অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়, তবে কৃষি বিদ্যায় বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে সমন্বয় সাধনের ভার থাকে কেন্দ্রের হাতে। 1926 সালে একটি রয়াল কমিশন নিযুক্ত করা হয়। কমিশন 1928 সালে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রকাশ করে, তাতে পশুপালন, সেচ, বন এবং উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, কৃষিঋণ, গ্রামীণ শিল্প, পুষ্পোদ্যান প্রভৃতি বিষয়ে প্রতিবেদন থাকে।

সেচের সুবিধার প্রসার কৃষি উৎপাদনকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। মোট চাষ করা জমির পরিমাণ 1894-95 সালে ছিল 196 মিলিয়ন একর, জমির পরিমাণ বেড়ে

গিয়ে 1913-14 তে 219 মিলিয়ন এবং 1928-29 সালে 228 মিলিয়ন একরে দাঁড়াল। কিন্তু জনসংখ্যাও সাথে সাথে বেড়ে চলেছিল। ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতবর্ষে এক কমিশন বসানো হয়। 1918 সালে এই কমিশনের সুপারিশ—শিল্পোন্নয়নে উৎসাহ দিতে—বিভিন্ন দপ্তরগুলির উন্নতিসাধন করা হোক। কারিগরি শিক্ষার উন্নতি সাধন করা হোক, এবং শিল্প বিষয়ক বিভাগগুলির বিজ্ঞান বিভাগকে ও বৈজ্ঞানিক কর্মীদের চাকুরির শর্তগুলিকে নতুন করে সাজানো হোক, এবং পরিবহণ ব্যবস্থার সুযোগ করে দেওয়া হোক।

1921 সালে ভারত সরকার শুল্ক নীতি সম্বন্ধে প্রতিবেদনের জন্য একটি রাজস্ব কমিশন বসান। এই কমিশন বৈষম্যমূলক রক্ষণ নীতির সুপারিশ করে। 1945 সালে দু' বছরের জন্য একটি অন্তর্বর্তী শুল্ক বোর্ড গঠন করা হয়; তার কাজ বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট শর্তে যে রক্ষণ ব্যবস্থার আশ্রয় চায়, তাদের দাবিগুলিকে পরীক্ষা করে দেখা। 1945 সালেই গভর্নমেন্ট তার শিল্পনীতির ব্যাখ্যা দিয়েছে।

এইগুলির সঙ্গে অন্যান্য সরকারী পদক্ষেপ স্বাধীন ভারতবর্ষকে তার 1948 সালের শিল্পনীতি সম্বন্ধীয় প্রস্তাব রচনায় সাহায্য করেছে।

কৃষিনীতি ও সেচ ব্যবস্থা ঃ 1866 সাল পর্যন্ত দেশে বোটানিক্যাল গার্ডেন কয়েকটি মাত্র ছিল, কৃষি ও উদ্যান পালন সমিতি (সোসাইটি) ছিল না বললেই চলে। 1866 সালে বাংলা ও উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ হওয়ার পর প্রত্যেকটি প্রদেশে স্বতন্ত্র কৃষিবিভাগ খোলার প্রয়োজন অনুভূত হয়। 1970 সালে কৃষিকার্যের একটি উচ্চক্ষমতা বিশিষ্ট দপ্তর সৃষ্টি করা হলেও দপ্তরটি বেশি দিন থাকেনি। দুর্ভিক্ষ বিভাগের (Famine Commission) চাপে কেন্দ্রীয় কৃষি দপ্তরকে 1881 সালে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। চাষ করা জমির পরিমাপ প্রতি ব্যক্তির হিসাবে 1911-12 সালে ছিল 0.88 একর, 1941-48 সালে 0.72 একর, 1948 সালে 0.71 একর।

1858 সাল থেকে 1900 সালের মধ্যে দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে দশটি বড় মাপের দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অসংখ্য খাদ্যাভাবের ঘটনা এর মধ্যে ধরা হয়নি। 1874 সালে দুর্ভিক্ষের ব্যাপারে একটি কমিশন বসানো হয়। এই কমিশন বিভিন্নভাবে সাহায্যের প্রস্তাব ছাড়াও দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য সেচ ব্যবস্থার প্রসারের ওপর জোর দিয়েছিল। মোগল আমলে যমুনা নদী থেকে ক্যানাল কেটে আনা হয়েছিল। নদীর পশ্চিম পারে ফিরোজ শাহ্ তাঁর শাসনের অন্তর্ভুক্ত 'হিসারে' (Hissar) একটি ক্যানেল কাটিয়ে দিয়েছিলেন। পূর্ব দিকে শাহজাহান একটি ক্যানেল তৈরি করান। ব্রিটিশ আমলে প্রথম বড় সেচের কাজ দক্ষিণ ভারতে কাবেরী নদীর একটি উপনদীর ওপরে আপার আজিকাট নির্মাণ; তার খরচ পড়েছিল 15 লক্ষ টাকা। সেচ বিশেষজ্ঞ স্যার আর্থার কটন এটি নির্মাণ করেন। 1847-50 সালে তিনি গোদাবরী নদীর

ওপরে ক্যানেল তৈরির কাজ করেন। স্যার প্রোবি কট্‌লেও গঙ্গানদীর বুক থেকে ক্যানেল তৈরির কাজে সাফল্যলাভ করেন। 1863 সালে মাদ্রাজ ইরিগেশন কোম্পানীর সৃষ্টি। মূলধন 1 মিলিয়ন পাউন্ড। লক্ষ্য ছিল তুঙ্গভদ্রা নদীর বুক থেকে ক্যানেল কাটা; তবে কেবলমাত্র কুর্ণুল কুদ্দাপা ক্যানেলটিই সম্পূর্ণ হয়েছিল।

1902-1903 সাল পর্যন্ত ছোট বড় কয়েকটি প্রযুক্তিতে 43 কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। 1901-1903 সালের সেচ কমিশন পরবর্তী কুড়ি বছরে সাড়ে ছয় মিলিয়ন একর জমিতে 30 মিলিয়ন টাকা ব্যয়ে সেচ ব্যবস্থা চালু করার জন্য একটি কর্মসূচি গ্রহণ করেন। সেচের অগ্রগতি সম্পর্কে রিপোর্ট তৈরি করা ও কাজের গতি পরিদর্শনের জন্য একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড স্থাপনের প্রস্তাবও কমিশন দিয়েছিল। সেচের জন্য নির্মাণ কার্য উৎপাদন বাড়াতে এবং উৎপন্ন দ্রব্য রক্ষণে সহায়ক হবে বলে আশা করা হয়েছে।

1919 সালের শাসন সংস্কারে সেচ ব্যবস্থা প্রদেশের দায়িত্বে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। সেচের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ব্যুরো সৃষ্টি হয়েছিল 'রয়াল কমিশন অব এগ্রিকালচার'-এর সুপারিশে।

সমবায় আন্দোলন ঃ সমবায় সংক্রান্ত আইন (Co-Operative Society Act) প্রথম বিধিবদ্ধ হয় 1904 সালে। 1912 সালে আবার তার সংশোধন করা হয়। 1919 সালে যখন সমবায়ের কাজ প্রাদেশিক ব্যাপার বলে গণিত হল, তারপরে 1925 সালে বোম্বেতে, 1931 সালে বাংলায় এবং 1932 সালে মাদ্রাজে, ও 1935 সালে বিহার উড়িষ্যায় সমবায় সমিতি সংক্রান্ত আইন পাশ হয়। 1921-30 সালের মধ্যে সমবায় সমিতির সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। এই সময়েই জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের জন্ম। ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক প্রথমে তৈরি হয় পাঞ্জাবে, তারপর মাদ্রাজ ও বোম্বেতে। সেন্ট্রাল ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় 1929 সালে।

1919-37 সালে শুরু হয় মন্দা, যার পরেই ধাক্কা খায় সমবায় আন্দোলন, ব্যাহত হয় তার অগ্রগতি। (সমবায় সমিতির এই অগ্রগতির ধারাকে আন্দোলন না বলে সরকারী নীতি বলাই বাঞ্ছনীয়।)

1937 সালে অবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটে তবে অত্যন্ত শ্লথগতিতে, কারণ পল্লী অঞ্চলে ঋণ-এর সমস্যাও বেড়ে চলেছিল।

1935 সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কৃষি ঋণ বিভাগ যুক্ত থাকে। সমবায় সমিতির প্রথম আরম্ভ ঋণদানের ক্ষেত্রে। কিন্তু ধীরে ধীরে অন্যান্য ক্ষেত্রেও (বাজার, শিল্পায়ন, দুগ্ধ সরবরাহ ও ক্রেতা সমবায়) সমিতি গড়ে উঠতে থাকে।

অন্যান্য উন্নয়নমূলক পরিবর্তন ঃ এর মধ্যে পড়ে আবাদ শিল্পগুলি। ইস্পাত

শিল্পের জন্ম, 1904 সালের বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইন যার দ্বারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণের ধারাকে আরও দৃঢ় করা হয়, এবং প্রাচীন সৌধ সংরক্ষণ আইন (Ancient Monuments Preservation Act, 1904) প্রায় দশ বছর পরে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের মুখ্য অধিকর্তার (Director General of Archaeological Survey of India) পদ পুনরুজ্জীবিত করা হয়। 1905 সালের 1লা জুলাই লর্ড কার্জন স্টান্ডার্ড টাইম-এর প্রবর্তন করেন।

রাজনৈতিক পরিবর্তন

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কয়েকটি প্রবিধানের ধারার পথ ধরে এবং ভারতবর্ষকে ভারতীয়দের হাতে দেওয়ার ধাপে ধাপে যে ব্যবস্থা নেওয়া আছে সেই অনুসারে যে সব রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিবর্তন এসেছে তার সবগুলিই দেশের আকাঙক্ষার পরিপোষক নয়। কিছু কিছু আইন এবং রাজনীতি প্রণোদিত ধারা স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্যই তৈরি। যেমন, 1918 সালের রাউলাট অ্যাক্টের দুটি ধারা ছিল, যা বিচারকদের ক্ষমতা দিয়েছিল রাজনৈতিক বন্দীদের বিচার জুরি ছাড়াই করার জন্য, এবং প্রাদেশিক সরকারকে ক্ষমতা দিয়েছিল বিচার ছাড়াই আটক রাখার। এই ধরনের ঘটনা ভারতবাসীর কাছে ক্রোধের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

1861 সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট ভারত সরকারের সঙ্গে ভারতীয়দের যোগাযোগকে ঘনিষ্ঠ করে তুলেছিল, যদিও এই সুযোগকে ভারতীয়রা অতি সামান্য বলেই ভেবেছিল। এই আইনের বলে গভর্নর জেনারেলের কার্যনির্বাহী সভায় (Executive Council) পঞ্চম সদস্য—একজন আইন বিশেষজ্ঞের অন্তর্ভুক্ত। গভর্নর জেনারেলের মনোনীত ব্যক্তিকে নিয়ে কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। কাউন্সিলের প্রত্যেক সদস্য একজন করে সেক্রেটারী রাখতে পারার ক্ষমতা পেল; তার সঙ্গে আন্ডার সেক্রেটারী ও অফিসে কর্মচারী। গভর্নর জেনারেল বৈদেশিক সম্পর্ক রক্ষা করতেন, দেশীয় রাজ্যগুলির ব্যাপারও দেখতেন। সরকারী কাজকর্ম পরিচালনার জন্য আইন প্রণয়নের অধিকার তাঁর ছিল। আইনসভার অধিবেশন মুলতুবি থাকলে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে ছ'মাসের মেয়াদে অর্ডিন্যান্স জারি করার ক্ষমতাও তিনি পেয়েছিলেন। তবে সেক্ষেত্রে সোজাসুজি ব্রিটেনে তাঁকে জানাতে হ'ত ঘটনাটি।

এইভাবে একটি আইনসভার আরম্ভ হতে দেখার সুযোগ আমরা পেয়েছি। অবশ্য আইনসভাতে গভর্নর জেনারেলই ছিলেন সর্বেসর্বা এবং ইংল্যান্ডের শাসন কর্তৃপক্ষই যে কোন ব্যাপারে শেষ কথাটি বলতে পারত। মাদ্রাজ ও বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে ছিল গভর্নরস ইন কাউন্সিল, সেখানে কোন আর্থিক দেওয়া নেওয়ার প্রসঙ্গ জড়িত থাকত না, কাউন্সিল সোজা ব্রিটেনে সেক্রেটারী অব স্টেট-এর সঙ্গে কথা বলতে পারত। বেশির ভাগ প্রশ্নই ভোটে মেজরিটির দ্বারা স্থির হ'ত; তবে

গভর্নরের ক্ষমতা ছিল সে সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দেওয়ার।

কাউন্সিলের মর্যাদা আরও বেড়ে যায় ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট, 1892 বিধিবদ্ধ হওয়ার পরে। এই অ্যাক্টের বলেই প্রথম (বাঁকা পথে হলেও) নির্বাচনের কথা আসে। অবশ্য গভর্নর জেনারেলের মনোনয়ন তাদের পেতে হত। নারী সদস্যের কোন স্থান ছিল না।

1909 সালে ব্যারিস্টার (পরে লর্ড) সিনহা গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলে আইন বিষয়ক সদস্যরূপে মনোনীত হন।

স্থানীয় স্ব-শাসনের আরম্ভ

অন্তত একজন ভাইসরয়ের (রাজ প্রতিনিধি) কাজের বিশেষ উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি হলেন লর্ড রিপন। তাঁকে ভারতবর্ষে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার জনক বলা যায়। 1882 সালে তিনি পৌরশাসনের নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন। পৌর শাসন কর্তৃপক্ষের করণীয় কাজ ও ক্ষমতার পরিধি স্থির করে দেন, নির্বাচিত সদস্যের দ্বারা এর শক্তিবৃদ্ধি করে দেন, এর পৌর কর্তৃপক্ষকে দায়িত্বের সঙ্গে পৌর শাসন পরিচালনার পুরো ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে দেন। 1892-তে দ্বিতীয় ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট পাশ হলে পৌরসভাগুলি প্রাদেশিক সভায় প্রতিনিধি নির্বাচন করার অধিকার লাভ করল, তারা আবার ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলে তাদের প্রতিনিধি মনোনীত করতে পারত। 1918 সালে পৌরসভাগুলির ক্ষমতার পরিধি আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়। পৌরসভার করণীয় কাজগুলি সম্পাদন করতে পারে এমনভাবে আঞ্চলিক বোর্ড গঠন করা হয়েছে পল্লী বা গ্রামাঞ্চলে। পঞ্চায়েত, (কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি), তালুক বোর্ড (কয়েকটি পঞ্চায়েত নিয়ে একটি তালুক) ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড (কয়েকটি তালুকের সমষ্টি) পৌরসভার কাজকে সম্পূর্ণ করেছে তাদের নিজের নিজের অধিকার ক্ষেত্রে।

1882 সালে নেওয়া লর্ড রিপনের সিদ্ধান্তের চারটি দিক ছিল (1) আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন মূলক প্রতিষ্ঠান ছড়িয়ে দেওয়া যেগুলি পল্লী অঞ্চলে স্থানীয় প্রয়োজনের দিকে লক্ষ রাখবে (2) আঞ্চলিক সংস্থাগুলির গঠনতন্ত্রে সরকারী মনোনয়ন মোট শক্তির এক তৃতীয়াংশের বেশি হবে না। (3) নিয়ন্ত্রণ থাকবে ভেতর থেকে, বাইরে থেকে নয়, (4) আর্থিক দিক থেকে সংস্থাগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার যতদূর সম্ভব নিরঙ্কুশ রাখা হবে এবং সম্ভব মত নির্বাচনের মাধ্যমে সংস্থাগুলি গঠন করা হবে।

ইতিপূর্বে লর্ড মেয়ো কতকগুলি অর্থনৈতিক সংস্কারের সূচনা করেছিলেন, যাতে প্রত্যেক প্রদেশকে ক্রমবর্ধমান ব্যয়ভারের কিছু অংশ বহন করতে হবে। 1870

সালের রাজকীয় প্রস্তাবে (14.9.1870) আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন মূলক প্রতিষ্ঠান গড়ার প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছিল। এই স্থানীয় আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত রাখার নীতিকে স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরা হয়েছিল 1915 সালের সরকারী প্রস্তাবে। পরবর্তীকালে মন্টেগুর বিখ্যাত ঘোষণাপত্র (আগস্ট 1917), ও একই সঙ্গে দেওয়া ভারত সরকারের (1918 সালের) প্রস্তাব।

1909 সাল ও তারপর

1909 সালের তৃতীয় বারের প্রনিয়ম (Third Indian Council Act of 1909) মর্লে মিন্টো সংস্কার প্রস্তাবের সঙ্গে মিলে যায়। মর্লে ছিলেন ইংল্যান্ডে সেক্রেটারী অব স্টেট, লর্ড মিন্টোকে ভাইসরয় পদে নিযুক্ত করেছিল বিদায়ী শাসন কর্তৃপক্ষ। আইনসভার আয়তন বাড়িয়ে দেওয়া হল ঃ গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা 60 পর্যন্ত করা যেত; উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, বাংলা, বোম্বে ও মাদ্রাজে আইনসভার সদস্য সংখ্যা 50 পর্যন্ত হতে পারত, পাঞ্জাব, আসাম ও বর্মায় 30 পর্যন্ত। প্রাদেশিক সভাগুলিকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, তারা বেসরকারী সদস্যের সংখ্যাধিক্য রাখতে পারত। সেই প্রথম মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেওয়া হল।

মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট (1919) বিধিবদ্ধ হওয়ায় ব্রিটিশ একথা বুঝিয়ে দিল, যে, ভারতীয়দের বেশি সংখ্যায় গ্রহণ করার নীতি নিয়েছে। তারা প্রত্যেকটি প্রদেশের জন্য আইনসভা তৈরি করার কাজ হাতে নিল। কারণ প্রদেশগুলিকেই স্বশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে পরীক্ষার জন্য ও কেন্দ্রে দ্বিস্তরীয় আইনসভা স্থাপনে সবচেয়ে উপযুক্ত ইউনিটরূপে গণ্য করা হয়েছিল। তবে যা সমালোচনার ঝড় তুলেছিল, তা হল প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় দ্বৈত শাসন আনার নীতি। শুধুমাত্র সংরক্ষিত বিষয় সম্বন্ধেই নয়, আইনসভায় যাদের স্থানান্তরিত করা হয়েছে, তাদের ব্যাপারেও গভর্নরকেই পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল।

সেক্রেটারী অব স্টেট মন্টেগু ও ভাইসরয় চেমসফোর্ড ছ' মাসের মধ্যেই 1918 সালে দেওয়া একটি প্রতিবেদনে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক অবস্থার বর্ণনা দিলেন। এই প্রতিবেদন মন্টেগু-চেমসফোর্ড (বা মন্টে-ফোর্ড) রিপোর্ট নামে খ্যাত। এই প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়েছিল যে, প্রাদেশিক শাসন পরিষদকে আংশিক দায়িত্ব দেওয়া হোক, ভারত সরকারই ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে সেক্রেটারী অব স্টেটের মাধ্যমে পুরো দায়িত্ব বহন করবে।

ভারতীয়দের হাতে স্বায়ত্তশাসনের দীপ তুলে দেওয়ার প্রথম সোপান এখান

থেকেই শুরু এবং একদিক থেকে একথাও বলা যায় যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমাপ্তির ইঙ্গিত এখান থেকেই পাওয়া গেল।

1919 সালের ভারত আইনের পরবর্তী কাল

গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, (ভারত আইন) 1919 বিধিবদ্ধ হওয়ার পরে শাসন পদ্ধতির ক্রমবিকাশের ধারা নিচে দেখানো হচ্ছে ঃ

1. সর্বোচ্চ আইনসভার পরিবর্তে Bicameral Legislature স্থাপিত হয়েছে কেন্দ্রে। রাজ্যসভায় (Council of State) 60 জন সদস্য (33 জন নির্বাচিত 27 জন গভর্নর জেনারেল কর্তৃক মনোনীত), পাঁচ বছরের জন্য; Assembly-তে 145 জন সদস্য, (103 জন নির্বাচিত ও বাকি সদস্যেরা মনোনীত), মনোনীতদের মধ্যে 25 জন সরকারী কর্মচারী। Assembly-র স্থায়িত্ব তিন বছর। দুটি সভাতেই সোজাসুজি নির্বাচন। গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা ছিল দুই জায়গাতেই সভা ডাকতে, স্থগিত রাখতে অথবা ভেঙে দিতে।
2. প্রশাসন ও আইনসভার অধিকার রেখাকে দেখিয়ে দুটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল; কেন্দ্রে ও প্রদেশে নাগরিকদের তালিকা তৈরির ভার কেন্দ্রের হাতে, যেসব ব্যাপারে আইনের সমতা থাকা উচিত এবং নিচে উল্লেখ করা বিষয়গুলিতেও কেন্দ্র সিদ্ধান্ত নেবে ঃ যেমন, প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক, সরকারী ঋণপত্র ও শুল্ক ব্যবস্থা, বন্দর, শুল্ক, পেটেন্টস, তার বিভাগ, কপি রাইট ও মুদ্রা, যোগাযোগ, বাণিজ্য, জাহাজ ও সমুদ্রপথ, দেওয়ানি ও ফৌজদারী আইন এবং নিয়মকানুন ও মুখ্য বন্দরসমূহ। বাকি সব প্রদেশের হাতে। তালিকাভুক্ত নয় এমন বিষয়গুলি একই নীতিতে বিভক্ত হবে কেন্দ্র ও প্রদেশের হাতে।
3. নটি বড় প্রদেশের মধ্যে প্রত্যেকটিতে থাকবে একজন গভর্নর ও একটি আইনসভা। যে সব বিষয়গুলি তাদের অধিকারে থাকবে, সেগুলিকে ভাগ করা হয়েছিল রক্ষিত ও স্থানান্তরিত—এই দুই ভাগে। প্রথম বিষয়টি নিয়ে ভাববেন গভর্নর ও তাঁর আইনসভা। কার্যনির্বাহী সভা। যেগুলি প্রদেশের হাতে স্থানান্তরিত সেগুলির কথা স্থির করবেন মন্ত্রীসভা কার্যনির্বাহী সভার সদস্যরা সকলেই গভর্নরের দ্বারা তাঁর নিজস্ব বিচারে মনোনীত। স্থানান্তরিত বিষয়গুলির মধ্যে ছিল—স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, ঔষধ ও চিকিৎসা, স্বাস্থ্য ও প্রশাসন, কৃষি, সমবায়, আবগারী, শিল্প ও নথিভুক্ত/রেজিস্ট্রেশন করার কাজ।

মন্ত্রীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাদের হাতে যে দায়িত্বভার দেওয়া হ'য়েছিল তার কোন বাস্তবমূল্য ছিল না। ভারতবাসীদের কাছে ঐ দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা একটা

প্রহসন বলেই মনে হ'য়েছিল। এই অনুভবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল জালিয়ানওয়ালা বাগের ঘটনা; জ্বলে উঠেছিল তাদের চেতনা, এবং অনেকেই শপথ নিয়েছিল যে, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে কোন সহযোগিতা নয়।

এই সময়ে সিভিল সার্ভিসে আবদ্ধ সরকারী কর্মচারীরা শত্রুভাবাপন্ন হ'য়ে উঠেছিল শাসনসংস্কারের প্রতি, যার ফলে ভারতের কিছু মানুষ ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠেছিল। আই. সি. এস. আধিকারিকরা মনে করেছিল যে, শাসন সংস্কার তাদের ক্ষমতা ও প্রভাব হরণ করছে, তাদের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব দেখা দিল। তাদের রাগ দূর করতে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ 1922 সালের আগস্টে একটি বিবৃতি দিয়ে আই. সি. এস.-দের প্রশস্তি গেয়েছিলেন। তাদের 'ইস্পাতের কাঠামো' আখ্যায় ভুষিত করে তিনি বলেন—

> আমি মনে করছি না যে, কোন সময়েই গভর্নমেন্ট ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিস যে চৌম্বক শক্তিতে কাজ করে চলেছে, তার সহায়তা ও পরিচালনার কাছ থেকে সরে যাবে। তারা সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থার ইস্পাত কাঠামো। সেই ইস্পাত কাঠামো সরিয়ে নিলে সমগ্র সৌধই ভেঙে পড়বে; সেখানে তোমবা কি তৈরি করতে চাও আমি বুঝিনা।[12]

আগুনে ঘি দেওয়ার মতো, সেই সময়ে 'লী' কমিশনের রিপোর্ট কার্যকরী করতে, একগুচ্ছ নতুন নিয়ম চালু করা হ'ল, উদ্দেশ্য ইস্পাতের কাঠামোকে সুদৃঢ় করে তোলা। দমনমূলক আইনের পরিবর্তন তারা চাইল না। তারা ভারত শাসন করতে লাগল নীতিহীন আইনের দ্বারা। ভারতীয়দের অনেকেই অনুভব করেছে যে, এমন একটি কাঠামো গণতান্ত্রিক শাসনের অনুপযুক্ত।

1935 সালের ভারত আইন

1947 সালে স্বাধীনতা আসার পূর্ব পর্যন্ত 1935 সালের গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্টের (ভারত আইন) মাধ্যমে প্রশাসন ব্যবস্থার কি কি পরিবর্তন ঘটেছে, এবারে তা দেখতে পারি।

1924 সালের জানুয়ারীতে ব্রিটেনে শ্রমিক দল ক্ষমতায় এল। এর আগে তারা যখন ক্ষমতায় ছিল না, তারা ভারতীয়দের মনে আশার আলো জাগিয়েছিল; তারা ইঙ্গিত দিয়েছিল যে সাম্রাজ্যের একত্ব বোধের শর্ত ভারতকে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দেওয়া। কিন্তু যখন তারা ক্ষমতায় বসল, তাদের নীতি হল রক্ষণশীল দলের নীতিকেই অনুসরণ করা অর্থাৎ স্থিতাবস্থা বজায় রাখা। যে দলের লোকই হোক না কেন, প্রত্যেকেই বলতে লাগল যে, গ্রেট ব্রিটেন ভারতবর্ষের দায়িত্ব ত্যাগ করবে না। কিন্তু একথা মোটেই পরিষ্কার হল না যে দায়িত্ব কিসের, এবং কবে ও কিভাবে সে দায়িত্ব তারা ত্যাগ করবে। রক্ষণশীল দলের প্রত্যাবর্তনে সে চিরাচরিত পথই অনুসৃত হতে লাগল।

1928 সালে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট হঠাৎই সাইমন কমিশন নিযুক্ত করল, প্রত্যক্ষত 1919 সালের শাসন সংস্কার সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনার জন্য। কারও কারও মতে এটা পরবর্তী সরকারের (শ্রমিক দল রক্ষণশীলদের তুলনায় ভারতপ্রীতিতে এগিয়ে ছিল) সম্ভবত শ্রমিক দলকে নিষ্প্রভ করতে ভারতবর্ষের আশা আকাঙক্ষার প্রতি যাতে তারা সহানুভূতি সম্পন্ন না হয়। ভারতীয়দের কমিশনে রাখা হয়নি, কারণ, আরুইন এই কথা বলে সাফাই গেয়েছিলেন যে, ভারতীয়রা যে আবেগশূন্য ও বিদ্বেষহীন হবে, তা আশা করা যায় না। ভারতীয়রা এই কমিশনকে বয়কট করল এই যুক্তিতে যে, ব্রিটিশের তৈরি কোন নিয়মতন্ত্রই গ্রহণ করা যায় না। সাইমন কমিশন দেশের সকলকেই শাসনতন্ত্রে স্থান দিতে চেয়ে একটি এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর শাসনতন্ত্র সুপারিশ করল। তারা আরও বলল যে, প্রদেশগুলিতে দ্বৈতশাসনের অবসান ঘটানো উচিত।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে একটি প্রতিবেদন গৃহীত হল, যার মধ্যে স্বাধীন ও সার্বভৌম লোকসভার দাবি (আপার হাউস ও লোয়ার হাউস সহ) যার ক্ষমতা থাকবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য উপনিবেশগুলির মতো, যার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো থাকবে; এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় নির্বাচনের জন্য যুক্ত ও মিশ্র নির্বাচন প্রথার প্রবর্তন করা হবে। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ আলি জিন্না একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনলেন, আইনসভায় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে; কিন্তু সে প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। শাসন পরিষদের এই ছককে ভারতবর্ষের সংবিধানের একটি ব্লুপ্রিন্ট বলা চলে। কিন্তু সে সময়ে মতের বিভিন্নতা দেখা দিয়েছিল, ব্রিটিশের কাছে কি চাওয়া হবে সেই প্রশ্নে। স্বাধীনতা বা পূর্ণ স্বরাজের চেয়ে কম কিছু নয়—এই ছিল নবীনদের মত।

অনেক ঘটনা ও অঘটনের মধ্যে দিয়ে পথ এগিয়েছে এরপর। আইন অমান্য আন্দোলন ও ডান্ডি মার্চ, লবণ সত্যাগ্রহ .... 1930 সালের 22 মার্চ, লবণের ওপর করের প্রতিবাদে লবণ আইন অমান্য করে গান্ধীজির অভিযান। গভর্নমেন্টের প্রেস-অর্ডিন্যান্স্। 1910 সালে তুলে নেওয়া প্রেস আইনের দুরূহ ধারাগুলির পুনরাবৃত্তি। সত্যাগ্রহীরা এবং আন্দোলনের নেতারা পুলিশের হাতে বন্দী, এর সঙ্গে সঙ্গেই সন্ত্রাসের শাসন। গোলটেবিল বৈঠকে (এবং তার সাব কমিটিতে) সাইমন কমিশনের প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা, গান্ধীজির সঙ্গে ভাইসরয় আরুইনের আপোশচুক্তি (এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত, ব্রিটিশ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও তার প্রবক্তাকে কি গুরুত্ব দিয়েছে) গান্ধীজিকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল 'অর্ধনগ্ন ফকির' বলে ব্যঙ্গ করেছিলেন। গান্ধী-আরুইন চুক্তির পরেই কানপুরের দাঙ্গা .... ভগৎ সিং-এর ফাঁসি। তারপরেই দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক যা সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন সমাধানে

গভর্নমেন্টের অক্ষমতাকে প্রমাণ করেছে; যে আলোচনায় দেশীয় রাজ্যগুলির যুক্তরাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্তির প্রশ্ন স্থান পেয়েছে। বৈঠকে কিছুই হয়নি। গান্ধীজিকে শূন্যহাতে ফিরে আসতে হয়েছে। 1932 সালের পুনা চুক্তি দলিত শ্রেণীর জন্য আসন সংরক্ষণে সরকারের সাম্প্রদায়িক স্বীকৃতির ওপর সংশোধন। তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক (প্রথম দুটি বৈঠকের বিস্তার) বসেছে। শুরু হয়েছে আইন অমান্য আন্দোলনের শেষ পর্যায়।

অন্যান্য ঘটনার মধ্যে 1934 সালে বিহারের ভয়াবহ ভূমিকম্প; যার কাছে আইন অমান্য আন্দোলন নগণ্য হয়ে মিলিয়ে গেছে। 1933 সালে শ্বেতপত্রের প্রকাশ, যার মধ্যে দেওয়া হ'য়েছে ভারতবর্ষের নতুন নিয়মাবলী ঃ কেন্দ্রে দ্বৈত শাসন, প্রদেশে দায়িত্বশীল শাসন পরিষদ। শ্বেতপত্র রচনা করেছে লিনলিথগোর নেতৃত্বে 16 জন সদস্যের একটি সভা। এই সভা ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজাদের কাছে তাদের মতামত জানতে চেয়ে আমন্ত্রণপত্র দিয়েছে।

এই সব কিছুর মিলিত ফল হ'ল গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1935। এই আইনে একটি সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, প্রদেশগুলি স্বাভাবিক ভাবেই যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মিশে যাবে। দেশীয় রাজ্যগুলির সম্বন্ধে নির্দেশ যে প্রত্যেকটি রাজ্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দেবে; তার জন্য তারা রাজার কাছে একটি স্বীকৃতি পত্রে সই দেবে।

দেশীয় রাজ্যগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় সভায় 125 জন সদস্য পাঠাতে পারবে, এবং রাজ্যসভায় 104 জন। প্রদেশগুলি কেন্দ্রীয় সভায় 250 জন ও রাজ্যসভায় 156 জন সদস্য পাঠাবে। প্রদেশগুলিতে নির্বাচন হবে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে। আইনের ধারা অনুযায়ী দেশীয় রাজ্য ও প্রদেশের জনসংখ্যার তালিকা করাতে হবে। কেন্দ্রে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার কথা—প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, কোম্পানীর আইন সম্পর্কিত ব্যাপার এবং উপজাতিদের শাসনব্যবস্থা গভর্নর জেনারেলের হাতে, তাঁকে সাহায্য করবে তাঁরই নিযুক্ত তিনজন উপদেষ্টা। যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য প্রজাদের ব্যাপারে গভর্নর জেনারেলকে সাহায্য ও উপদেশ দেবে অনূর্ধ্ব 10 জন মন্ত্রীর একটি সভা। যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রীসভা তৈরি হবে প্রথানুযায়ী; উল্লেখ্য সংখ্যালঘু শ্রেণীর প্রতিনিধিরাও তার অন্তর্ভুক্ত হবে। এই প্রতিনিধিত্ব-নির্বাচন কিভাবে নির্ভুল হয়, তা দেখবার জন্য গভর্নর জেনারেলের কাছে নির্দেশাবলী দেওয়া হয়েছিল। যৌথ দায়িত্ব, যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার কাছে মন্ত্রীসভার দায়িত্বশীলতা ছিল এর অত্যাবশ্যকীয় নীতি। এই আইনে ভারতবর্ষের জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত (Federal Court) থাকার কথা যার মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়মাবলীর ব্যাখ্যা এবং যার অধিকারসীমা সমস্ত রাজ্য ও প্রদেশগুলির ওপর।

সেক্রেটারী অব স্টেটে-এর ইন্ডিয়া কাউন্সিল-এর স্থানে এল একটি উপদেষ্টা

সভা যার সদস্য হয়েছিল তিন থেকে ছয় ব্যক্তি। গভর্নর জেনারেলের মতো, একটি রাজ্য বা প্রদেশের গভর্নরেরও তিন ধরনের ক্ষমতা ছিল।

(1) তিনি নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে মন্ত্রীসভার সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করতে পারতেন, (2) যদিও মন্ত্রীসভার সঙ্গে পরামর্শ করা তাঁর করণীয় তবু তিনি তাঁর ব্যক্তিগত বিচার অনুযায়ী এবং বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে তাঁর নিজস্ব চিন্তায় কাজ করার ক্ষমতা পেয়েছিলেন।

1935 সালের আইনে মন্ত্রীদের ক্ষমতা আগের তুলনায় তাঁদের দায়িত্বশীলতার দিক থেকে অনেক ভাল ছিল। অবশ্য গভর্নরের সীমাহীন শক্তির কাছে তা মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়।

তপশীলভুক্ত জাতির জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। সাম্প্রদায়িক বিচারে মুসলমানদের, শিখ, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, ইউরোপীয়ান ও ভারতীয় খ্রীস্টানদের স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেওয়া ছিল। তাছাড়া আসন রাখা হয়েছিল শিল্প ও বাণিজ্য, খনিজ, চা-শ্রমিক, বিশ্ববিদ্যালয় ও জমির মালিকদের প্রতিনিধিত্ব দিতে।

প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয়েছিল 1937 সালে। প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে দাঁড়াতে প্রার্থীর ন্যূনতম বয়স চাওয়া হয়েছিল 25 বছর, আর আইন পরিষদের জন্য প্রার্থীর বয়স 30 বছর হতে হত। ভোটাধিকার পেতে বছরের নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন প্রার্থীকে তার নির্বাচন ক্ষেত্রে থাকতে হত। যদিও 1935 সালের আইন অনেক বেশি প্রগতিশীল ছিল। তবু, কংগ্রেস দলের দাবি ছিল যে, তারা মন্ত্রীসভায় যোগ দেবে একমাত্র যেখানে আইনসভায় তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে, এবং সেই সঙ্গে গভর্নরের প্রতিশ্রুতি যদি থাকে যে, মন্ত্রীদের ভূমিকা ও দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে গভর্নর হস্তক্ষেপ করবেন না। লর্ড লিনলিথগো এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় কংগ্রেস এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল। কংগ্রেস সকল সাম্প্রদায়িক দলের সহযোগিতা চাইল, এবং জানালো যে সকলকেই কংগ্রেসের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে আসতে হবে। মুসলিম লীগ তাতে রাজি হয়নি।

গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট (1935) রূপায়িত হলে তার কিছু সুফল পাওয়া গেল। অনেকগুলি আইন বিধিবদ্ধ হল, যেগুলির বিষয় হল—মদ্যপান নিষিদ্ধকরণ, শিক্ষা, পল্লীঋণ ও ভূমিসংক্রান্ত বিষয়।

তবুও আইনটি গতিময় হতে পারেনি। এর নিয়ন্ত্রণের সুতো ছিল লন্ডনে। দেশীয় রাজ্যগুলি রাজি ছিলনা যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিতে। কারণ, তারা আগেই সুবিধাজনক শর্তের প্রতিশ্রুতি পেয়েছে। দেশীয় রাজারা অ্যাসেমব্লিতে তাঁদের মনোনীত ব্যক্তিকে পাঠাতে পারতেন, অথচ প্রদেশে প্রতিনিধিকে নির্বাচন করতে হত। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভায় পরোক্ষ নির্বাচন গণতন্ত্রের বিরোধী। ভারতীয় সিভিল

সার্ভিস ও পুলিশিব্যবস্থার সেক্রেটারী অব স্টেট (লন্ডন)-এর নিয়ন্ত্রণ কেউ ভালো চোখে দেখেনি। যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য অর্থ ও সৈন্য দিয়েও প্রতিরক্ষা প্রশাসনে ভারতীয়দের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। আইনসভার আসনে প্রতিনিধি পাঠাতে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার নীতি মোটেই প্রীতিপ্রদ হয়নি। ব্রিটিশই যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভাকে তার হাতের মুঠোয় রেখেছিল, যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাহী আধিকারিকদেরও। প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় জনকর্তৃত্বকে প্রহসন বলে বোধ হয়েছিল। আইনের ধারা ও গণতন্ত্রের দাবি এই দুয়ের মধ্যে টানাটানি চলেছিল, সবসময়েই যা দুলছিল—দুটো সীমার মাঝখানে। 1935 সালের আইনকে ভারত বিরোধী বলা হয়েছে। কেউই এ' আইনকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি, জিন্নাও না।

তবু গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট কতকগুলি রীতি ও নিয়মের প্রবর্তন করেছিল যেগুলি আমাদের সংবিধানের মূল ভিত্তি রচনা করেছে। পুনর্বিবেচনার পর সংশোধনের পথও খোলা ছিল।

যুদ্ধ ও পরবর্তীকালের ঘটনা

যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল, ভারতবাসীর সঙ্গে কথা না বলেই ব্রিটেন সিদ্ধান্ত নিল যে, ভারতও যুদ্ধে যোগ দেবে। সমস্ত দেশে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠল, দাবি উঠল রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য একটি সাংবিধানিক সভার জন্য যাতে সংবিধান তৈরি করা যায়। 1940 সালের আগস্ট মাসে ব্রিটিশ একটি প্রস্তাব দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে হাউস অব কমন্স-এর নেতা স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে ভারতে পাঠাল। রাজাগোপালাচারি একটি ফর্মুলা দিলেন জিন্নাকে তাঁর বিবেচনার জন্য, ভুলাভাই দেশাই —লিয়াকত আলির প্রস্তাব একটি অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য, ওয়েভেল ক্যাবিনেট মিশন এবং 1942 সালের ভারতীয়দের 'ভারত ছাড় আন্দোলন .... কিন্তু কিছুই ঘটল না, কারণ জিন্না সহযোগিতা দিতে অস্বীকার করলেন, যতক্ষণ না তাঁকে একটি নতুন জাতি গড়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। বলা হয়, তিনি বলেছিলেন, "পাকিস্তানের দাবি থেকে মুসলিম লীগ এক ইঞ্চিও সরে দাঁড়াবে না।" দেশ বিভাগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল।

ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা অনুসারে 1946 সালের জুলাই মাসে প্রাদেশিক আইনসভাগুলি নির্বাচিত করল সাংবিধানিক সভাকে। সারা ভারতের মোট 296টি আসন, কংগ্রেস লাভ করল 211টি এবং মুসলিম লীগ 73টি। দেশীয় রাজ্যগুলির জন্য নির্দিষ্ট 93টি আসনে নির্বাচন হ'ল না। অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেমব্লির সদস্য হলেন, এবং ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ ডিসেম্বর মাসে নির্বাচিত হলেন স্থায়ী সভাপতির পদে।

অবশেষে স্বাধীনতা

যে সময়ে পৌঁছতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বহুবছর কেটেছে হঠাৎ সেই সময়টা এসে

পড়ল, লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতবর্ষের ভাইসরয় রূপে দায়িত্ব নিলেন .... 1947 সালে এবং ঘোষণা করলেন যে, শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে একটির বদলে দুটি রাষ্ট্রকে। বাংলা ও পাঞ্জাবের আইনসভা সিদ্ধান্ত নিল দেশভাগের। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিলেট পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করল। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারতের স্বাধীনতা সংক্রান্ত আইন (Indian Independence Act) পাশ হয়ে গেল 18 জুলাই 1947 সালে। ব্রিটিশ ওইদিনে তার সকল ক্ষমতা ভারত ও পাকিস্তানের হাতে তুলে দিল। যতদিন তাদের নিজস্ব সংবিধান তৈরি না হচ্ছে ততদিন তাদের প্রশাসনকার্য চলবে 1935 সালের গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট অনুযায়ী। ব্রিটিশ সম্রাটের সঙ্গে দেশীয় রাজাদের যা কিছু চুক্তিপত্র ছিল সব বাতিল হয়ে গেল 15 আগস্ট 1947 থেকে।

এটাই মনে হ'ল যে, ব্রিটিশ হঠাৎ খুব তাড়াহুড়ো করে চলে গেল। ভারতের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের যে কর্মসূচি নেওয়া হ'য়েছিল 1948-এর জুনের মধ্যে তা হঠাৎ এগিয়ে এল আগস্ট 1947-এ, মাউন্টব্যাটেনের 3 জুন তারিখের পরিকল্পনার পরে। আসলে চারদিক থেকে নানা ধরনের চাপে ব্রিটেন বিব্রত বোধ করছিল। একদিকে জিন্না চাপ দিচ্ছেন পাকিস্তানের জন্য, পাঞ্জাবে, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, উত্তরপ্রদেশ ও বাংলায় বেদনাজনক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হাতের মধ্যে ধরা উত্তপ্ত ইটের খণ্ডটিকে ফেলে দিতে তাবা ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। যদিও সেইটাই ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উজ্জ্বলতম রত্ন।

দেশভাগ ও স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনের সামনে অতি প্রয়োজনীয় তিনটি করণীয় কাজ এসে দাঁড়াল ঃ

ক) দেশজোড়া রক্তপাতের পর শান্তি ও আস্থার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা এবং সাধারণ মানুষের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

খ) দেশীয় রাজারা যাতে ভারত ইউনিয়নে যোগ দেয় তার নীতি ও কৌশল স্থির করা এবং যারা যোগ দেবে না বা সহজে দিতে চাইবে না তাদের জন্য পরিকল্পনা।

গ) প্রশাসনকে গণতন্ত্রমুখী করা এবং ন্যায় ও সুবিচারকে সামনে রেখে একটি ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রশাসনকে শক্তিশালী করা। এই কাজগুলি প্রশাসনের কাছে নতুন ও বিপুল দায়িত্বভার নিয়ে এল যার জন্য প্রয়োজন হ'ল দক্ষতার, প্রশাসনকে পরিমাপ করতে হবে নতুনভাবে সাধারণ মানুষের প্রয়োজন বোধকে, সকল মানুষকে জড়াতে হবে উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে এবং নিশ্চিত করতে হবে, যে উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি উদ্দিষ্ট মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছচ্ছে।

ভারতের দেশীয়রাজ্য

স্বাধীনতার সময় ভারতবর্ষে 500-র বেশি রাজ্য ছোট বড় এই রাজ্যগুলি যেমন, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, মহীশূর, যেগুলি দক্ষিণ ভারতের রাজ্য এবং উত্তরে গোয়ালিয়র, বরোদা, পাতিয়ালা প্রভৃতি অনেক কাজ করেছে তাদের প্রজাদের জন্য, যেমন রাজ্যটিকে সুন্দর করে গড়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিশেষ করে মেয়েদের জন্য) স্থাপন করা। রাজ্যের কৃষ্টির ধারা ও স্থাপত্যের নিদর্শন ছড়িয়েছে। 1910 সালে বরোদার মহারাজা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ভিত্তি স্থাপন করেছেন, এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত করেছেন। 1912 সালে তিনি 1905 সালে প্রবর্তিত সমবায় আন্দোলনকে নতুন করে গড়ে তোলেন। মহীশূরে 1913 সালে সীমায়ত বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন এবং 1916-তে স্থানীয় স্ব-শাসিত সংস্থাগুলির পুনর্গঠন ঘটে। 1916-তে মহীশূরে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম। বড় বড় সেচ প্রকল্পও আরম্ভ হয়েছিল মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর ও বরোদায়। হায়দরাবাদের ওসমানিয়া ইউনিভারসিটির প্রতিষ্ঠা 1918 সালে; ইংরাজি ভাষাকে তখন বাধ্যতামূলক করা হয়। মহীশূর, গোয়ালিয়র, বরোদা, ইন্দোর, রামপুর, ভূপাল, ত্রিবাঙ্কুর ও ময়ূরভঞ্জে শিল্পোন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। কোচিন ও ভাবনগরে বন্দর খোলা হয়েছে। রেলপথের উন্নতি ঘটেছে যোধপুর ও বিকানীরে।

কিন্তু অনেক দুর্বল ও অনগ্রসর রাজ্যও ছিল, তারা ভয় পেয়েছিল। তারা ব্রিটেনকেই সকল শক্তির উৎস বলে জেনেছিল, যখনই তাদের প্রয়োজন হবে তাদের রক্ষাকর্তা হয়ে দাঁড়াবে ব্রিটিশ শক্তি।

রাজাদের সকলেই ভারত সরকারের রাজনৈতিক দপ্তরের অধীনে ছিল; রাজাদের সমস্ত উপাধি ও সম্মান তাদের এক্তিয়ারে ছিল। তাছাড়া ঐ দপ্তরই রাজ্যগুলিতে অস্ত্রশস্ত্র ও লাইসেন্স দেওয়ার দায়িত্বে ছিল। সরকারের রাজনৈতিক দপ্তরই রাজ্যগুলিতে দেওয়ান অথবা মন্ত্রী নিযুক্ত করলে তার অনুমোদন দিতে পারত। কোন রাজাই সোজাসুজি কোন ব্রিটিশ সংস্থার দেওয়া পদবী গ্রহণ করতে পারত না, তাদের সঙ্গে কোন কাজেও যুক্ত হতে পারত না। কোন ইউরোপীয়কেও রাজ্যের কোন চাকরিতে নেওয়া যেত না, যদি না সরকারের রাজনৈতিক দপ্তর তার অনুমোদন দিত।

বাস্তব ঘটনা এই যে, দেশীয় রাজ্যগুলির খুব সুসময় ছিল, যখন ব্রিটিশ তার শক্তির শীর্ষে ছিল, কারণ ব্রিটিশ তাদের কোন কাজে হস্তক্ষেপ করত না; অবশ্য সঙ্কটজনক অবস্থা ছাড়া। 1804 সালে ওয়েলেসলি লিখেছেন —

> ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ও উল্লেখ্য দেশীয় রাজাদের মধ্যে একটি সম্বন্ধসূত্র স্থাপিত হয়েছে সেই নীতিতে, যার অন্তর্নিহিত প্রয়োজন যে, রাজ্যগুলি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রতি তার আনুগত্য

> বোধকে রক্ষা করে চলবে। ... এবং ব্রিটিশ গভনমেন্ট প্রত্যেকটি রাজ্যের জন্য সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের স্বচ্ছন্দ প্রকাশকে স্বীকৃতি দেবে।[13]

প্রত্যেকটি রাজ্যকে একটি স্বতন্ত্র ইউনিট রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তার পূর্ণ স্বাধীনতা, কিন্তু অন্য কোন রাজ্যের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন তার পক্ষে নিষিদ্ধ। রাজ্যগুলির অস্তিত্ব নানাভাবে গড়ে উঠেছিল। অনেক দেশ ব্রিটিশ আগে দখল করেছে, তারপর আইনত যে মালিক, তার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন প্রবল হয়ে উঠেছে, দেশীয় রাজারা তখন শঙ্কিত, অজানা ভবিষ্যতের ভয় তাদের মনে। ভাইসরয়দের মধ্যে অনেকে মাঝে মাঝে সভা করেছেন রাজাদের সঙ্গে মন্টফোর্ড (Montford) রিপোর্ট সুপারিশ করেছে যে, এই সভাগুলিকে নিয়মের মধ্যে আনা হোক এবং রাজাদের নিয়ে Council of Princes নাম দিয়ে একটি স্থায়ী সমিতি গড়া হোক। রাজাদের সঙ্গে আলোচনা করে 1921 সালে রাজকীয় ঘোষণায় চেম্বার অব প্রিন্সেস স্থাপিত হল। 120 জন রাজা (বা রাজপ্রতিনিধি) 127টি রাজ্যের প্রতিনিধিত্বে বারো জন, এবং অন্য সদস্যেরা এল তাদের নিজস্ব অধিকারে। এটি রূপ নিল একটি ফোরামের যার মাধ্যমে মতামত বিনিময় করা সম্ভব হয়েছিল; বছরে একটিই সভা বসত, সভাপতি ভাইসরয় নিজে। সর্বভারতীয় গুরুত্ব আছে এমন ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করাও সম্ভব ছিল।

1927 সালে বাটলার কমিটি বসানো হয়েছিল দেশীয় রাজ্যসমূহ ও ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে অর্থনৈতিক সুব্যবস্থা গড়ে তুলতে। কমিটির মন্তব্য যে রাজকুলের সম্পর্ক সোজাসুজি ইংল্যান্ডের রাজার সঙ্গেই হওয়া উচিত, গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়ার সঙ্গে নয়। কমিটি আরও বলেছিল যে, রাজার (Crown) সঙ্গে দেশীয় রাজ্যগুলির সম্পর্ক তাদের সম্মতি না নিয়ে নতুন গভর্নমেন্টের সঙ্গে জড়ানো উচিত হবে না। বস্তুত আরও এগিয়ে গিয়ে কমিটি সুপারিশ করেছিল যে, রাজ্যগুলির রাজনৈতিক আধিকারিক নিয়োগের জন্য ইংল্যান্ডের ইউনিভারসিটির ছাত্রদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করে তাদের স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত হবে। কমিটির সুপারিশগুলি অত্যন্ত অপ্রীতিজনক হয়ে উঠেছিল।

1930 সালের গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের দেশীয় রাজারা সর্বভারতীয় যুক্তকমিটিতে যোগ দিতে সম্মত হয়েছিল। 1935-এর গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট অনুযায়ী দেশীয় রাজ্যগুলি স্বেচ্ছায় ফেডারেশনে যোগ দিতে পারত। লর্ড লিনলিথগো এই যোগদানের ব্যাপারে রাজাদের জন্য একটি আবেদনপত্র তৈরি করে তাঁর নিজস্ব প্রতিনিধি মারফত লিখিত নির্দেশ সহ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু

রাজারা ভয় পাচ্ছিল যে একবার যোগদান করলে তারা আর ফেডারেশন থেকে বেরোতে পারবে না। তারা সম্মতি দেওয়ার ব্যাপারটাকে এড়িয়ে গেল। তারপরেই যুদ্ধ আরম্ভ। হাউস অব কমন্স-এর নেতা স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস যখন ভারতবর্ষে এলেন, তখন তারা তাঁর সঙ্গে দেখা করে বললেন যে, মাতৃভূমির জন্য সংবিধান রচনার কাজে যোগ দিতে তারা আগ্রহী, তাদের সার্বভৌমত্ব ও সত্তা যদি অক্ষুণ্ণ থাকে। যদি তারা সম্মত হতে না পারে, তাহলে যারা সম্মত হতে পারল না, তাদের সেই অধিকার রাখতে হবে যাতে তারা নিজেদের মধ্যে একটি সমিতি গড়তে পারে যেখানে তাদের সার্বভৌমত্ব বজায় থাকবে এবং সেই উদ্দেশ্য সামনে রেখে সমিতির একটি সর্বসম্মত কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে। আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু স্পষ্টভাষায় জানালেন যে, দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে সকল চুক্তিই বাতিল হয়ে যাবে। অবশ্য ব্রিটিশ শাসন পরিষদ থেকে দেশীয় রাজ্যগুলির কাছে তখনও আশ্বাসের বাণী আসছে। যেমন লর্ড ওয়েভেল তাদের বললেন যে, তাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হবে না। তবুও বাটলার কমিটির সুপারিশের অত্যন্ত বিরুদ্ধ সমালোচনার কথা স্মরণ করে ওয়েভেল রাজাদের পরামর্শ দিলেন সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য তাদের প্রশাসনকে আধুনিক করে তুলতে। সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় তিনটি মৌলিক শর্ত পালন করলে তবেই প্রশাসনকে আধুনিক ও উন্নত করা যায়। সেগুলি হল,

1) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা
2) উপযুক্ত আর্থিক স্বচ্ছলতা
3) সাধারণ মানুষকে প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত করা।

অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে বলা হল, তাদের আর্থিক শক্তিকে একত্র করা এবং সবল রাজনৈতিক শক্তি তৈরি করা।

1946 সালে ক্যাবিনেট মিশন এল এদেশে। চেম্বার অব প্রিন্সেস রাজ্য পরিষদের স্ট্যান্ডিং কমিটিকে তারা যা বলল, তা বোমা ফাটানোর মতো সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করল। ভারত যদি স্বাধীন হয়, তবে ব্রিটিশের সর্বময় কর্তৃত্বেরও শেষ হবে। তখন রাজ্যগুলিকে তাদের ভবিষ্যৎ অবস্থান সম্পর্কে নতুন শাসন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। রাজকুল তখন শর্ত আলোচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করল; কমিটির প্রধান চ্যান্সেলারকে তারা ক্ষমতা দিল কনস্টিট্যুয়েন্ট অ্যাসেমব্লির সঙ্গে আলোচনায় বসে একটি সিদ্ধান্তে আসতে। রাজাদের আহ্বান জানানো হল সোজাসুজি কনস্টিট্যুয়েন্ট অ্যাসেমব্লিতে যোগ দিতে। চ্যান্সেলার যখন দ্বিধান্বিত, বিকানীর ও পাতিয়ালার মতো রাজ্য বিনাবাক্যে যোগ দিল অ্যাসেমব্লিতে। 1947-এর এপ্রিলে পণ্ডিত নেহরু স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন, যদি কোন রাজ্য

কনস্টিট্যুয়েন্ট অ্যাসেমব্লিতে যোগ না দেয়, তবে তাকে শত্রুভাবাপন্ন বলে ঘোষণা করা হবে। ভূপালের নবাব যিনি চ্যান্সেলার ছিলেন, পদত্যাগ করায় পাতিয়ালার মহারাজা তাঁর স্থানে এলেন। বরোদা, বিকানীর, পাতিয়ালা, জয়পুর ও রেওয়া অ্যাসেমব্লির আসনে এল। কিন্তু ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান সি. পি. রামস্বামী আয়ার ঘোষণা করলেন, যে, (11.6.47 তারিখে) ত্রিবাঙ্কুর স্বাধীন থাকবে। 12.6.47 তারিখে হায়দরাবাদের নিজামও একই কথা জানালেন। কংগ্রেস এই রাজ্যগুলির স্বাধীন থাকার দাবিকে অস্বীকার করল, এবং কনস্টিট্যুয়েন্ট অ্যাসেমব্লিতে যোগ দিতে তাদের আবার আহ্বান জানাল।

ভারতের স্বাধীনতা বিষয়ক আইনে (ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট, 1947) রাজ্যগুলি সম্পর্কে কিছুই বলা নেই। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্য-মন্ত্রক স্থাপিত হল। ভারত ইউনিয়নে যোগদানের জন্য একটি যুক্তিযুক্ত আবেদনপত্র তৈরি হল। আশা করা গেল যে, অনেকেই ইন্ডিয়ান ইউনিয়নে যোগ দেবে। কারণ, তাদেরকে ভারত সরকারের কাছে কেবলমাত্র প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার মতো বিষয়গুলিই ছাড়তে হচ্ছিল। তাদের শাসন কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া হয়েছিল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সর্দার প্যাটেল, সচিব ভি. পি. মেনন, তার সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রথম গভর্নর জেনারেল মাউন্টব্যাটেন 1947-এর 15 আগস্টের পর রাজাদের প্রাণপণে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন একসূত্রে গ্রথিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা। একটি পরিকল্পনায় গাঁথা হলে তা দেশীয় রাজ্যগুলির স্বার্থ যেমন রক্ষা করবে, ভারত-ইউনিয়নের স্বার্থও তেমনি। ইউনিয়নে যোগদানের আবেদনপত্র (Instrument of Accession) সরল ও সহজ হওয়ায় তিন সপ্তাহের মধ্যে আগস্ট 1947-এর আগেই প্রায় সকলেই চুক্তিপত্রে সই করেছিল। জুনাগড় ও হায়দরাবাদকে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর দ্বারা বাধ্য করাতে হয়েছিল। কাশ্মীরের অবস্থা স্বতন্ত্র; চুক্তিপত্রে সই করতে তারা দ্বিধান্বিত হয়ে বিলম্ব করেছিল, ইত্যবসরে পাকিস্তান থেকে পাঠান ফৌজ এসে হঠাৎ কাশ্মীর আক্রমণ করল। কাশ্মীরকে রক্ষা করতে তখন ভারতীয় সেনাকেও দ্রুত কাশ্মীর পাঠাতে হ'ল।

ভারত-পাক লড়াইয়ের মাঝখানে কাশ্মীরের জন্য সংবিধানে একটি বিশেষ ধারা—Article 370 সংযোজিত হল। বলা হল যে, ভারতীয় সংবিধানের ধারাগুলি তখনকার মতো কাশ্মীরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে না। যাই হোক, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে ভারতবর্ষের (Indian Union) একটি অংশ বলে গণনা করা হল। পার্লামেন্টের আইনগত কর্তৃত্ব এবং রাজ্য সম্বন্ধে ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের কার্যনির্বাহী কর্তৃত্বও বজায় রইল।

সময়ের সঙ্গে দেশীয় রাজাদের হাতে যে সব বিশেষ সুবিধা দেওয়া ছিল এবং

তারা যে মর্যাদা ভোগ করছিল, তার অবসান ঘটেছে। প্রথম অবস্থাতেই সর্দার প্যাটেল যে রক্তহীন বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন, তার ফলে 500-র ওপর দেশীয় রাজ্যের ভারতভুক্তি ও ভারতবর্ষেরই অংশ হয়ে যাওয়াকে সম্ভব করল।

প্রশাসনের কি উত্তরাধিকার ব্রিটেন রেখে গিয়েছিল? ইউনিয়ন ও রাজ্যগুলি একটি সংক্ষিপ্ত কাঠামো মাত্র; একটি যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা। শাসনপদ্ধতির প্রয়োজনীয় সূত্রগুলি। রাজ্যের প্রধান হবে গভর্নর, কেন্দ্রে দুই পরিষদ বিশিষ্ট শাসন সভা (Bicameral legislature) একটি সুষ্ঠু বিচার বিভাগ (ব্রিটিশ বিচারনীতির শ্রেষ্ঠ সূত্র সহ), দিল্লিতে সুপ্রিমকোর্ট (প্রধান বিচারালয়) এবং প্রত্যেক প্রদেশে/রাজ্যে একটি হাইকোর্ট। আরও আছে, যেমন আইন প্রয়োগের ক্ষেত্র ও নিয়মাবলী, কৃষি, সেচ ও সমবায় ব্যবস্থার আরম্ভ, পথ ও শিল্পের উন্নয়ন, একটি সুবিন্যস্ত রেলপথ, বিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলাবদ্ধ বিন্যাস, শিক্ষার মাধ্যমরূপে ইংরাজি ভাষার সূচনা, ইংরাজিতে সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান ও দর্শন শিক্ষায় মেকলের নীতি, যা মহাকরণ ও জেলার কার্যদপ্তরগুলির জন্য কেরানিকুলের সৃষ্টি করেছে।

জেলা সমাহর্তা রাজস্ব সংগ্রহের কর্তা এবং আইন ও শৃঙ্খলার ধারক, তাঁর সাহায্যের জন্য রয়েছে রাজস্ব ও আরক্ষা বিভাগ। এই ব্যবস্থার বিকল্প কিছু এখনও পাওয়া যায়নি। অনুরূপ কার্যপরিচালনা, কার্যালয়গুলিতে দায়িত্বশীলতার বিভাগ বণ্টন ও প্রশাসনের ব্যবস্থা এখনও ব্রিটিশ ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করছে। ব্রিটেনেও প্রশাসন ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। আমলাতন্ত্র ও কাগজপত্রের ভার অনেক কমে গিয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষে আমাদের কোন পরিবর্তন ঘটেনি, সুবিন্যস্ত পদ্ধতিগুলিকেই আমরা আঁকড়ে ধরে আছি। একটা উদাহরণ দেওয়া যায়, দলিল ও নথিপত্র রক্ষা (Record Keeping)।

আমাদের সামনে এখন নতুন নতুন লক্ষ্য; নতুন বিভিন্ন ধরনের সমস্যা, প্রয়োজনের সঙ্গে যে ব্যবস্থা চলিত, তাকে মেলাতে গেলে নমনীয় হতে হবে। সমস্যার সমাধানে নতুন প্রক্রিয়ার সন্ধান করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। এখন এক নতুন চরিত্রের প্রশাসক চাই, যার জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হবে কর্মদক্ষতা ও সদিচ্ছা। বিকাশের দুরন্ত পরিবর্তনের ধারায় সাধারণ মানুষকেও অভ্যস্ত হতে হবে। প্রশাসনকেও নিরন্তর সংস্কার করতে হবে তার অনুসৃত পদ্ধতিকে।

দুই

সরকারী প্রশাসন

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান গৃহীত হওয়ার পরে

আমাদের সংবিধানের ভিত্তি

কোন দেশের সরকারী প্রশাসনের উদ্দেশ্য, প্রতিষ্ঠানগত গঠন, প্রক্রিয়া ও কর্মী সংগঠন নির্ভর করে তার রাজনৈতিক পদ্ধতি এবং দেশের সংবিধানে নিবদ্ধ শাসনের মূলনীতির ওপরে। ভারতবর্ষের সংবিধান মূর্ত করে তুলেছে মানুষের আদর্শ ও আশা আকাঙক্ষার রূপকে। এই সংবিধান তৈরি করেছেন এমন ব্যক্তিরা যাঁরা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন। তাঁরা সচেতন ছিলেন যে, স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি ততখানিই প্রয়োজনীয়, যতটা সততা ও সামাজিক ন্যায়বিচার। কারণ বিদেশী শাসকের হাতে এগুলির অভাব থাকায় তাঁরা (স্বাধীনতার জন্য যাঁরা সংগ্রাম করেছেন) প্রচুর দুঃখভোগ করেছেন। আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু আগস্ট 14-15 তারিখের মধ্যরাত্রে ভাগ্যের সাথে অভিসার বা 'Tryst with Destiny' বক্তৃতাটি শেষ করেন এইভাবে ঃ

> আমরা যাঁদের প্রতিনিধি সেই ভারতবাসীর কাছে আমাদের আবেদন, এই যে, এই বিরাট অভিযানে বিশ্বাস ও আস্থা নিয়ে সকলে আমাদের সঙ্গে যোগ দিন। সংকীর্ণ ও ক্ষতিকর সমালোচনার সময় এটা নয়। বিদ্বেষ অথবা অন্যের বিরুদ্ধে দোষারোপ করার সময়ই এখন নেই। আমাদের স্বাধীন ভারতের সৌধ গড়ে তুলতে হবে, যেখানে দেশের সকল সন্তান একত্রে বাস করতে পারবে।[1]

মহাত্মা গান্ধী, জহরলাল নেহরু, সর্দার প্যাটেল, আম্বেদকর ও অন্য সকলে যাঁরা আমাদের সংবিধান রচনায় হাত মিলিয়েছেন, তাঁরা দৃষ্টি রেখেছিলেন এমন একটি নীতি ও শাসন কাঠামোর দিকে যার মূলে ছিল সদ্‌ভাবনা ও আদর্শগত চিন্তা। বিশ্বের উন্নত গণতান্ত্রিক দেশগুলির যা কিছু ভাল তাই তারা গ্রহণ করেছিলেন। তার ফলে আমরা পেয়েছি একটি মহৎ দলিল। গোপন ব্যালটের দ্বারা

সর্বজনীন ও মুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামোর পার্লামেন্টারি পদ্ধতিকে তুলে ধরেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে জড়িয়ে পাঁচ বছর অন্তর নির্বাচন ব্যবস্থা। সংবিধানের রাজ্যশাসন পরিচালনায় সাধারণ মানুষের জন্য আর্থিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার বড় হয়ে উঠেছে। প্ল্যানিং বিশেষ করে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যদিয়ে এই চিন্তাধারাই প্রকাশিত। যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রথায় শাসন কাঠামো কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিকে একত্রে কাজ করার মতো পরিসর দিয়েছে। দেশ এখন রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে বিভক্ত। বাক্ স্বাধীনতা, সংবাদপত্র ও ভাষার স্বাধীনতা, যে কোন ধর্ম অনুসরণ করার স্বাধীনতা এবং অন্যান্য নাগরিক সুবিধাগুলির বিবরণ যেমন সংবিধানে আছে, তেমনি এই অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে বিচারের সাহায্য গ্রহণের অধিকারও দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবনায় সংবিধানের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে ঘোষণা এইভাবে ঃ

> **আমরা ভারতের সকল অধিবাসী** ভারতবর্ষকে একটি **সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র** রাষ্ট্র রূপে গড়ে তুলবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দেশের সকল মানুষের জন্য আমরা চাই
>
> 1 **ন্যায় বিচার**—সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক;
>
> 2. **চিন্তার স্বাধীনতা**—চিন্তার ও তার প্রকাশের, বিশ্বাস ও ধর্মমতের এবং উপাসনার;
>
> 3. **সমান অধিকার**—মর্যাদায় ও সুযোগপ্রাপ্তিতে। সকল মানুষের জন্য তুলে ধরতে চাই;
>
> 4. **ভ্রাতৃত্ববোধ**—যার মধ্যে আশ্বাস থাকবে ব্যক্তিগত মর্যাদা ও জাতীয় সংহতি রক্ষার।
>
> 26 নভেম্বর 1949 তারিখে **আমাদের সংসদীয় পরিষদে** আমরা এই মত **গ্রহণ করলাম, বিধিবদ্ধ করলাম এবং আমাদের সকলের জন্য আমাদের সংবিধান আমরা প্রদত্ত করলাম।**

1976 সালে 42তম সাংবিধানিক সংশোধনে Secular ও Socialist শব্দগুলি Sovereign শব্দের পরেই দেওয়া হয়েছে।

সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র

সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র শব্দ দুটির তাৎপর্য গণ-ইচ্ছার প্রাধান্য; জনতার ইচ্ছার প্রকাশ ঘটে লোকসভা ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলির নির্বাচনে যার ভিত্তি হল বয়স্কদের ভোটাধিকার (Act-326)। যাঁরা প্রশাসনে রয়েছেন সরকারী নীতি নির্বাহ ব্যবস্থায় তাঁরা আইনসভার মাধ্যমে জনসমাজের কাছে দায়ী। আমাদের সংবিধানের ধারায় মুক্ত ও সার্বিক ভোটাধিকারের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রত্যেকটি নাগরিক যার বয়স 18 অথবা তার বেশি, তার ধর্ম, বংশ, জাতি, জন্মস্থান এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে পূর্ণ ভোটাধিকার।

1951 থেকে 1991 সাল পর্যন্ত যতগুলি নির্বাচন হয়েছে, তাতে দেখা গিয়েছে যে, নানা বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও এই বিশাল দেশে যার কৃষ্টি শিক্ষা ও চিন্তাধারায় অজস্র বৈচিত্র্য বর্তমান, নির্বাচন সুষ্ঠুভাবেই হতে পারে। নির্বাচন যাতে অবাধ ও দুর্নীতিহীন হয়, তা দেখবার জন্য রয়েছেন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত মুখ্য নির্বাচন মহাধ্যক্ষ।

সমাজতন্ত্র ও সমাজের সমাজতান্ত্রিক ধরন

সমাজতন্ত্রবাদী শব্দটির তাৎপর্য আর্থিক ও সামাজিক ন্যায় বিচারের লক্ষ্যে রাষ্ট্রের ভূমিকার গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা। যদিও সংবিধান রচনার সময় পরিষ্কার করে কিছু বলা হয়নি, তবু সমাজ তান্ত্রিক চিন্তাধারাকে নির্দেশ সংবলিত উপধারায় গ্রথিত করা হয়েছে আইরিশ সংবিধানের অনুকরণে। যেমন, 39 নম্বর ধারা (Act 39) রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে তাদের কর্মসূচিতে আশ্বাসের নিশ্চয়তা রাখতে।

ক) স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিকই যেন জীবিকা অর্জনের অধিকার পায়।
খ) সমাজের স্থাবর সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ এমনভাবে ভাগ করে দিতে হবে যাতে সাধারণ মানুষের হিত সাধিত হয়।
গ) আর্থিক সম্পদের ব্যবহার যেন সম্পদ ও উৎপাদন নীতিকে সাধারণ মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর না করে।
ঘ) পুরুষ ও নারীর জন্য সমপরিমাণ কাজের বেতন যেন সমান হয়।
ঙ) নারী বা পুরুষ যেই হোক, শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও শক্তি এবং শিশুদের বয়সের স্বল্পতার অপব্যবহার যেন না ঘটে; অর্থের প্রয়োজনে কোন নাগরিক তার বয়স বা সামর্থ্যের বাইরে কোন অতিরিক্ত কাজ করতে বাধ্য না হয়।
চ) শৈশব ও যৌবনকে শোষণের হাত থেকে বাঁচাতে হবে; নৈতিক ও বাস্তব ক্ষেত্রে।

সংবিধানের অন্যান্য ধারাগুলিও (Act 41 to 43) বলছে রাজ্যগুলি ফলপ্রসূ ব্যবস্থা নেবে যাতে কাজের অধিকার ও শিক্ষার অধিকার সাধারণ মানুষের থাকে। যেন বেকারত্বে, বার্ধক্যে, রোগে, অক্ষমতায়, সাধারণ সকলের সহায়তা মেলে। কাজের জন্য সৎ ও মানবিক পরিবেশ যেন থাকে, থাকে যেন প্রসূতিকে ত্রাণ ও সাহায্য; উপযুক্ত আইন প্রণয়ন, অথবা অর্থনৈতিক সংগঠন কিংবা অন্য কোন উপায়ে সমস্ত শ্রমিকদের কৃষি বা শিল্পে অথবা অন্যভাবে কৃষি ও মজুরি পাওয়ার ব্যবস্থা, অবকাশ ও কৃষ্টিমূলক এবং সামাজিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারার ব্যবস্থা। এই নির্দেশমূলক কর্মসূচি আইন ও আদালতের প্রতিপাদ্য ব্যাপার নয়, এগুলি উপদেশ ও পরামর্শ রূপে শাসন কর্তৃপক্ষের অনুসরণ করার বিষয়।

গভর্নমেন্টের সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচির রূপ দেওয়া হয়েছে মাঝে মাঝেই—1955 ও 1964 সাল কংগ্রেস দলের প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে, রাজাদের টাকার তহবিল বাতিল করে, ব্যাঙ্ক ও ইন্সিওরেন্স জাতীয়করণের দ্বারা, 'গরিবী হঠাও' অভিযানে এবং পৌর সম্পত্তির উর্ধ্বসীমা নির্দিষ্ট করে যেগুলি ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে ঘটেছিল। আর্থিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করতে রাষ্ট্রায়ত্ত ও রাষ্ট্র পরিচালিত সংস্থার মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের নীতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল; বেসরকারী পরিচালনা থেকে কিছু ব্যবসায়িক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানেরও জাতীয়করণ করা হয়েছিল বা রাষ্ট্র কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হয়েছিল।

ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র

আমাদের সংবিধান রচিত হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে। আম্বেদকরের ভাষায়—"এই লোকসভা কোন একটি ধর্মকে দেশের সকল মানুষের ওপর চাপিয়ে দিতে পারবে না।"[2] মানুষ যে ধর্মে তার বিশ্বাস সেই ধর্মকেই অনুসরণ করবে। তারা নিজেদের বিশ্বাস মতো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারবে। ধর্মের জন্য বৈষম্যমূলক ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলিকে অধিকার দেওয়া হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের, এবং তাদের নিজেদের ভাষা বর্ণমালা ও কৃষ্টি অনুসরণ করার। সংবিধান অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সমাজকে লোকসভা ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে এবং কতকগুলি চাকুরির ক্ষেত্রেও প্রতিনিধিত্বের অধিকার দিয়েছে। তাদের জন্য শিক্ষাখাতে বিশেষ অনুদানেরও ব্যবস্থা রয়েছে।

1978 সালের জানুয়ারীতে একটি সংখ্যালঘু কমিশন স্থাপন করা হয়। উদ্দেশ্য ধর্ম ও ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা। কমিশনকে সাংবিধানিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

সামাজিক ন্যায়বিচার ও মানবিক অধিকার

প্রথাগতভাবে অবনত, অনগ্রসর ও দুর্বল শ্রেণীগুলির জন্য সামাজিক ন্যায়বিচারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সংবিধানে কয়েকটি শর্ত সংযোজিত হয়েছে। প্রশাসনের কাজে এই শর্তগুলি গুরুত্বপূর্ণ।

সংবিধানে বিশেষ বিধান দেওয়া হয়েছে সেই সব এলাকা সম্বন্ধে যেগুলিতে উপজাতি মানুষের প্রাধান্য; যেমন উত্তর-পূর্ব ভারতবর্ষে। লোকসভা ও রাজ্য আইনসভাগুলিতে তালিকাভুক্ত জাতি ও উপজাতির জন্য আসন সংরক্ষিত রয়েছে। সরকারী চাকুরিতে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও তাদের স্থান আইনের দ্বারা রক্ষিত। সংবিধানে বলা রয়েছে যে, সামাজিক দিক থেকে অনগ্রসর মানুষের জন্যও সরকারী চাকুরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অগ্রাধিকারের ব্যবস্থা করা যাবে। দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে এ ধরনের সংরক্ষণ ব্যবস্থা কয়েক বছর আগে থেকেই রয়েছে। সরকারী সিদ্ধান্তের ওপর মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্র শাসনে এবং উত্তরের রাজ্যগুলিতেও অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য সংরক্ষণ নীতিকে বলবৎ করা হয়েছে।

সংবিধানের অনেকগুলি ধারা রয়েছে ব্যক্তির সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার জন্য। 1993 সালের সেপ্টেম্বর থেকে আমরা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে পেয়েছি, ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, সমতা ও মর্যাদা রক্ষার যে প্রতিশ্রুতি আমাদের সংবিধান দিয়েছে, অথবা আন্তর্জাতিক আইনে যা স্বীকৃত এবং ভারতীয় আদালতে

যা গ্রাহ্য, সেই প্রতিশ্রুতি ও অধিকার রক্ষার ভার নিয়েছে এই কমিশন। তাছাড়া নারীর অধিকার রক্ষার দিকে লক্ষ রাখার জন্য জাতীয় কমিশন হয়েছে। তাছাড়া রাজ্যস্তরেও মানবাধিকার কমিশন ও নারীর অধিকার রক্ষা সম্পর্কিত কমিশন গঠিত হতে চলেছে।

মৌলিক্ অধিকার রক্ষার জন্য আদালত আছে। সেখানে অন্য বস্তুর আগে সমতা ও বাক্ স্বাধীনতা রক্ষার দাবি স্বীকৃত। আমেরিকার বিল অব রাইটস-এর ওপর তার ভিত্তি।

আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র শাসনব্যবস্থার কাঠামোতে অন্য যে উপাদানগুলি রয়েছে সেগুলি হল ঃ

1. যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরন
2. বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা সুরক্ষিত
3. কার্য নির্বাহিকবর্গ আইনসভার কাছে দায়ী।

সমগ্র ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে একটা ঠাসবুনন, অথচ প্রয়োজনীয় অদল বদলের সুযোগও দেওয়া আছে। একথা বলা হয় যে, ভারতবর্ষকে যেমন যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রথায় নেওয়া যায়, তেমনি একক রাষ্ট্রীয় রূপেও নেওয়া যেতে পারে। সংকটের সময় (1965 ও 1971 সালের ভারত-পাক যুদ্ধ) রাজ্যগুলি কেন্দ্রের সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারে। কেন্দ্র যদি প্রবল হয়ে ওঠে, রাজ্যগুলিও অপরিহার্য, যদিও তারা সার্বভৌম নয় এবং যুক্ত ব্যবস্থা (ইউনিয়ন) থেকে বেরিয়ে যেতেও পারে না।

কেন্দ্র-রাজ্য সম্বন্ধীয় অধ্যায়ে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে প্রায়-যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা কেন গ্রহণ করা হল, তার কারণ দেখানো হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা

স্বাধীনতার সঙ্গেই এসেছিল দেশবিভাগ, দেশ জুড়ে হাঙ্গামা ও বিচ্ছিন্নতার আন্দোলন। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা ভাগভাগির কথা তখনই ভাবা হয়েছিল। গণপরিষদের সদস্য ও জাতির নেতৃবৃন্দ সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন, এই ধরনের সংকটে একটি কেন্দ্রানুগ নীতি অপরিহার্য। অতিরিক্ত কেন্দ্রীকরণের সম্ভাবনায় যারা শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল, আম্বেদকর তাদের কাছে সেই মৌলিক নীতির ব্যাখ্যা দিলেন, যার ওপর ভিত্তি করে কেন্দ্র ও রাজ্যের ক্ষমতা ভাগাভাগির সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায়। যেমন,

> রাজ্যগুলি কোনভাবেই কেন্দ্রের কাছে বিধান সম্বন্ধীয় ব্যাপারে বা কার্যনির্বাহ সংক্রান্ত কর্তৃত্বে নির্ভরশীল হবে না। রাজ্য ও কেন্দ্র এই ব্যাপারে সমান ক্ষমতা সম্পন্ন। যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রধান চিহ্ন হল আইন প্রণয়ন ও নির্বাহী ক্ষমতার মধ্যে বিভাগ সৃষ্টি, শাসনতন্ত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যের কাজে পৃথকীকরণ।[3]

যেসব ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে কেন্দ্রের বেশি ক্ষমতা, যেমন প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক প্রভৃতি তেমনি রাজ্য সরকারের সুযোগ পুলিশ-প্রশাসনে, কৃষি ও সেচ ব্যবস্থায়, সেগুলি বিভক্ত থাকা উচিত। মোটামুটি তিনটি তালিকায় কেন্দ্র ও রাজ্যের অধিকার-ক্ষেত্র ভাগ করা হয়েছে। এক নম্বর তালিকায় কেন্দ্রের ও দু' নম্বর তালিকায় রাজ্যের এবং তিন নম্বর তালিকায় সেই সব বিষয় যেখানে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েরই অধিকারসীমা কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে সংবিধানে নানা ব্যবস্থার বিশদ নির্দেশ আছে। সেগুলি এখানে দেখানো হল ঃ

1. জরুরী অবস্থার ক্ষমতা (সংবিধানেব 352-60 ধারা)।
2. একটিই বিচার ব্যবস্থা, এবং (দেওয়ানি বা ফৌজদারী) আইনের একরূপতা।
3. রাষ্ট্রপতি প্রত্যেক রাজ্যে মুখ্য শাসনকর্তাকে নিয়োগ করেন। সাধারণত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে ঐ শাসনকর্তাকে (Governor) নিযুক্ত করা হয়। গভর্নরের একটি বিরাট দায়িত্ব আছে; যখন তিনি বুঝতে পারেন যে রাজ্যে কোন একটি দলের পক্ষে মন্ত্রীসভা গঠন করা সম্ভব নয়, তখন রাষ্ট্রপতি শাসনের জন্য তাঁকে সুপারিশ করতে হয়। রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য তাঁর কাছে আইনসভার বিল পাঠানোর ক্ষমতাও তাঁর আছে।
4. কেন্দ্রের নির্বাহী ক্ষমতা আছে এমন যেকোন বস্তুর জন্য রাজ্যের ওপর কর ধার্য করতে পারে।
5. ভারত সরকারের আধাসামরিক বাহিনীকে (যেমন CRPF) রাজ্যের অসামরিক কর্তৃপক্ষের সাহায্যের জন্য পাঠানো যেতে পারে।
6. কেন্দ্রীয় সরকার যে সব সর্বভারতীয় চাকুরির সৃষ্টি করেছে, তার কর্মচারীরা রাজ্যে কর্মরত থাকে, কিন্তু কার্যকালের মধ্যে কেন্দ্রে আসে।
7. কেন্দ্র রাজ্যগুলিকে আন্তঃরাজ্য বিবাদে (যেমন নদীর জল বণ্টন) সাহায্য করে।
8. প্ল্যানিং কমিশন কোন শাসনতান্ত্রিক সমিতি নয়, তবু দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কেন্দ্রের লিখন উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে।
9. রাষ্ট্রপতি প্রত্যেক পাঁচ বছরে একটি ফাইনান্স কমিশন নিযুক্ত করে; কমিশন যে নীতি সুপারিশ করে তার ভিত্তিতে রাজস্ব বণ্টন করা হয় রাজ্যগুলিতে, এছাড়া সংবিধানের 275 ধারায় (Act 275) শর্ত অনুযায়ী যে অনুদান কয়েকটি অবস্থায় দেওয়া যায়, এবং পরিকল্পনা খাতে যে কেন্দ্রীয় সহায়তা, পরিকল্পনা খাতেও ব্লক লোন ও ব্লক গ্রান্ট হিসাবে দেওয়া হয়ে থাকে।

10. রাজ্যগুলির সঙ্গে আলোচনা করে 'ভাষা' সম্পর্কে নীতি স্থির করবে কেন্দ্র। 1994 সালের জুলাই মাসে প্রধানমন্ত্রী প্রস্তাব দিয়েছেন যে 'হিন্দী'-কে সংযোগ-রক্ষাকারী ভাষা রূপে তুলে ধরা হোক।

উল্লেখিত বিষয়গুলির প্রত্যেকটি ও আরও কিছু বিষয় তাঁদের আলোচনার গণ্ডিতে এনেছেন সরকারিয়া কমিশন (1983 সালে নিযুক্ত)। কমিশনে তার রিপোর্ট দিয়েছে 1987 সালের অক্টোবরে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এ ব্যাপারে কিছুই করা হয়নি।

একমাত্র এবং স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বিচারালয়

স্বাধীনতার পরেই বিচারব্যবস্থাকে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। ব্রিটিশ আমাদের হাতে যে বিচারব্যবস্থা তুলে দিয়েছিল, তার সুনাম ছিল সততার জন্য। কিন্তু অনেক সময়েই দেখা গিয়েছে যে নির্বাহক আধিকারিকেরা বিচারের কাজও সম্পন্ন করেছেন, যার ফলে বিচারকের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপের ছায়া পড়েছে। তাই আমাদের সংবিধানে সেই নীতিই গ্রহণ করা হয়েছে যার প্রতিপাদ্য বিষয় হল, শাসনকার্যকে বিচারকার্য থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করে রাখতে হবে। স্বাধীনতার পর উত্তরভারতে খুব কম রাজ্যই ছিল, যেখানে পুরানো ঔপনিবেশিক যুগের অনুবর্তনে উপমহাধ্যক্ষ তাঁর বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্বও বহাল রেখেছেন। এখন তা'ও পুরোপুরি অদৃশ্য। গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিচার বিভাগীয় প্রশাসন এবং পৌর ও পুলিশ প্রশাসনের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় সংসদীয় গণতন্ত্র

ব্রিটিশ ছাঁচে ঢালা সংসদীয় গণতন্ত্রকে আমরা গ্রহণ করেছি। কিন্তু ব্রিটেনে লোকসভাই সর্বোচ্চ শাসন পরিষদ, ভারতে তা নয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় গঠন হওয়ায় ভারতবর্ষে লোকসভায় আইন প্রণয়নের ক্ষমতা চূড়ান্ত নয়। তাছাড়া কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বিতর্ক উঠলে বিচার বিভাগের ক্ষমতা আছে তার নিরসনে পুনর্বিবেচনায় বিষয়টি আনা। সংবিধান সংশোধনের কয়েকটি শ্রেণী আছে, যা রাজ্যগুলির নির্দিষ্ট ন্যূনতম সংখ্যার সমর্থন না থাকলে কোন পরিবর্তনের মধ্যে আনা যায় না। তাই গ্রেট ব্রিটেনে গণ পরিষদ যেমন সার্বভৌম ক্ষমতার ধারক, ভারতে তা নয়। আরও আছে; সংবিধানের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ধারাগুলি, রাজ্যশাসনের নির্দেশজ্ঞাপক নীতিগুলি, এবং সংবিধানের মূল কাঠামো বলে যা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা স্বীকৃত—সেগুলিও লোকসভার ক্ষমতাকে সীমার মধ্যে রেখেছে।

মন্ত্রীসভা সমন্বিত সরকার

সংসদীয় গণতন্ত্রে থাকে একটি মন্ত্রীসভা সমন্বিত শাসন পরিষদ যার সভাপতি (রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যগুলিতে গভর্নর) শুধু নামেই বর্তমান। মন্ত্রীসভা লোকসভার কাছে শাসন পরিচালনার জন্য দায়ী থাকে।

লোকসভার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে; তার সম্পূর্ণতা ঘটে শাসনকার্য পরিচালকদের দ্বারা, যার মধ্যে থাকে রাজনৈতিক নির্বাহিক ও প্রশাসনিক আমলাতন্ত্রের দল। শাসনসংক্রান্ত সকল কার্য কেন্দ্রীয় সরকারের এলাকা হলে সভাপতি (বা রাষ্ট্রপতি) এবং রাজ্যের এলাকা হলে গভর্নরের নামে ঘোষণা করা হয়। শাসন-সংক্রান্ত যে কোন কাজ যা রাষ্ট্রপতির নামে দেওয়া হয়, তা সংবিধানের নিয়ম মেনে করা হয়ে থাকে। রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিতে এবং তার সহায়তার জন্য সংবিধানের ধারা অনুযায়ী মন্ত্রীসভা থাকে। আসলে এই মন্ত্রীসভাই সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী, লোকসভা ও রাজ্যসভাগুলির দায়িত্বের মধ্যে শাসন সংক্রান্ত যে কোন ব্যাপারে।

ভারতের রাষ্ট্রপতি

সভাপতি বা রাষ্ট্রপতিই হলেন রাষ্ট্রের প্রধান। তিনি নির্বাচিত হন পাঁচ বছরের জন্য, নির্বাচক মণ্ডলীতে থাকে লোকসভা ও রাজ্যসভার নির্বাচিত সদস্যরা এবং রাজ্য আইনসভাগুলি। সশস্ত্র বাহিনীর তিনিই প্রধান। শাসন-সংক্রান্ত সকল কাজ তাঁর নামেই করা হয়। তিনি সাংবিধানিক প্রধান, তাঁর অধিকার আছে মন্ত্রীসভাকে উপদেশ দেওয়া বা সতর্ক করার। কিন্তু মন্ত্রীসভার, বস্তুত প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারেই তাঁকে কাজ করতে হয়।

প্রধানমন্ত্রী-সরকারের মধ্যমণি

যদিও প্রত্যেক মন্ত্রীই ব্যক্তিগতভাবে তার দপ্তরের কাজের জন্য দায়ী, তবু প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা যুক্ত-দায়িত্বে কাজ করে। প্রত্যেক মন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে, মন্ত্রীসভায় ও লোকসভার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে তার কাজের হিসাব দিতে হয়। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা প্রভূত। তবু তাকে সতর্কভাবে তাঁর কাজ চালাতে হয়। তাঁর পছন্দ মত, ব্যক্তিকে তিনি মন্ত্রী নির্বাচিত করতে পারেন, কিন্তু নানা বিষয় জড়িয়ে থাকায় ও অনেক উদ্দেশ্যকে স্থান দিতে হয় বলে মন্ত্রী নির্বাচনের কাজ খুব জটিল হয়ে থাকে, বিশেষত যখন তাঁকে দেখতে হয় যে প্রত্যেকটি দপ্তরে উপযুক্ত ব্যক্তিকেই যেন বসানো হয়।

মন্ত্রী পরিষদ

মন্ত্রী পরিষদে থাকে ক্যাবিনেট পর্যায়ের পূর্ণ মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী। তাই মন্ত্রী

পরিষদের পরিসর ক্যাবিনেটের চেয়ে বেশি। সাধারণ ক্ষেত্রে পূর্ণ মর্যাদা সম্পন্ন ক্যাবিনেট মন্ত্রীরাই ক্যাবিনেটের সভায় উপস্থিত থাকতে পারে। সকল মন্ত্রীই প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত হন। 1858 খ্রীস্টাব্দে ভারতবর্ষের প্রথম ভাইসরয় লর্ড ক্যানিং যে দপ্তর পদ্ধতি চালু করেন, এখনও মন্ত্রীরা সেই পদ্ধতি ধরেই কাজ করেন। প্রত্যেক মন্ত্রী তাঁর অধিকারভুক্ত বিষয়ে নতুন পরিকল্পনা ও কর্মসূচির সূচনা দেন, সেগুলির রূপায়ণের জন্য ক্যাবিনেটের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। ক্যাবিনেটকে সাহায্য করার জন্য সচিবমণ্ডলী থাকে। সচিবমণ্ডলীর প্রধান, যাঁকে ক্যাবিনেট সেক্রেটারী বলা হয়, তিনি জনপালন কৃত্যকের (Civil Service) ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হন।

মন্ত্রীসভা

যুক্তরাষ্ট্র সরকার অথবা রাজ্যে—ক্যাবিনেট হল শাসনকার্য পরিচালনায় সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রীয় পোতকে চালিত করে ক্যাবিনেট। নীতি নির্ধারণ, আইন সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ, লোকসভা বা রাজ্য বিধানসভায় আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত খসড়া পেশ করা, এবং সাফল্যের পথে চালিত করা, আয়-ব্যয়ের বার্ষিক হিসাব প্রস্তুত করা প্রভৃতি কাজের জন্য দায়ী মন্ত্রীসভা। বিভিন্ন সাংবিধানিক পদে নিয়োগের জন্য যেমন অ্যাটর্নি জেনারেল (রাজ্যে অ্যাডভোকেট জেনারেল) ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য (রাজ্যে স্টেট পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য), সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতি, ও রাজ্যগুলিতে গভর্নর নিয়োগে ক্যাবিনেটের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়।

ক্যাবিনেটকে সাহায্য করে ক্যাবিনেট কমিটি, যেমন, রাজনীতি বিষয়ক কমিটি, অর্থনীতি বিষয়ক কমিটি, নিয়োগসংক্রান্ত কমিটি, সংসদীয় বিষয় সম্পর্কিত কমিটি। প্রধানমন্ত্রী এই কমিটিগুলির নেতৃত্বে থাকেন। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত কমিটিও হতে পারে। কোন ঊর্ধ্বতন ক্যাবিনেট মন্ত্রী তার প্রধান হতে পারেন।

কেন্দ্রের মত রাজ্যস্তরেও মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা থাকে। রাজ্য বিধান-সভায় যে দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে মুখ্যমন্ত্রী সেই দলের প্রধান বা নেতা। আইন প্রণয়নের যে সব প্রস্তাব হাতে থাকে, এবং ক্যাবিনেট যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, মুখ্যমন্ত্রী সে সবই গভর্নরকে জানাবেন; সে সম্বন্ধে গভর্নর কোন তথ্য চাইলে তাও মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে দেবেন। কোন মন্ত্রীর কোন সিদ্ধান্ত যদি মন্ত্রীসভায় আলোচিত না হয়ে থাকে তবে গভর্নর মুখ্যমন্ত্রীকে নির্দেশ দিতে পারেন এবং সে নির্দেশে মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীসভায় বিষয়টি আলোচনার জন্য পেশ করতে বাধ্য। তাঁর দলের নেতা হিসাবে, বিধানসভা ও শাসন পরিষদ এবং প্রশাসনের নেতা হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর সময় ও শক্তির অনেকখানি ব্যয় করতে হয়।

প্রশাসনিক কাঠামো

সংবিধানের বিধান অনুযায়ী কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সরকারী কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য (যেসব কাজ মন্ত্রীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়) করণীয় কাজের সঠিক তালিকা ও নিয়মাবলী (Business Rules) তৈরি করা হয়েছে। মন্ত্রীদের সহায়তা দিতে মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন দপ্তর রয়েছে তারা আবার সাহায্য পায় বিভাগীয় প্রধান, সংশ্লিষ্ট সংগঠন, এবং অধীনস্থ কার্যালয়গুলির কাছ থেকে। দপ্তরগুলির কাজের জন্য পর্ষদ, প্রতিষ্ঠান, ও সরকারী উদ্যোগে গঠিত সংস্থা রয়েছে। প্রয়োজন বিবেচনা করে উপদেষ্টা পর্ষদ ও সমিতি গড়া হয়েছে। সরকার ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপের বাইরে সাংবিধানিক কর্তৃত্ব স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বর্তমান; যেমন কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার, ও ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন।

রাজ্যপাল

রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনার প্রধান হলেন গভর্নর। তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। রাজ্যের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে যাঁর পদমর্যাদা ভারতের রাষ্ট্রপতির মতই। প্রকৃত কর্তৃত্ব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হাতে, যেমন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীই রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। ভারতবর্ষের শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে যেমন হয়, রাজ্য সরকারের ক্ষেত্রেও তেমনি সব কিছু কাজ গভর্নরের নামে করা হয়। তিনিই নিযুক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের, রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যদের, অ্যাডভোকেট জেনারেলকে এবং কোন কোন রাজ্যে উপাচার্যদের। হাইকোর্টের বিচারক নিয়োগের ব্যাপারেও রাষ্ট্রপতি তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেন। তিনি মন্ত্রীদের মধ্যে সরকারী কাজকর্মও ভাগ করে দেন; সরকারী কার্য পরিচালনার সুবিধার জন্য তিনি নিয়মকানুনও (Business Rules) তৈরি করে দেন (সংবিধানের 166 নম্বর ধারা)।

কেন্দ্র-রাজ্য সম্বন্ধ বিষয়ক অধ্যায়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারে গভর্নরের করণীয় কি, এবং সে ব্যাপারে তাঁর কি ক্ষমতা আছে, তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সংসদীয় দায়-দায়িত্ব পালনের জন্য গভর্নরকে কি ধরনের মানুষ হতে হবে, সে বিষয়েও উক্ত অধ্যায়ে বলা হয়েছে।

ভারতবর্ষে যোজনা-বিবর্তন

সংবিধানের সমবর্তী সূচিতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক যোজনা অন্তর্ভুক্ত। সাধারণ মানুষের কল্যাণমূলক কাজে উদ্দীপনা আনতে এবং দারিদ্র্য দূর করতে উন্নয়নের যে নূতন লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিল, স্বাধীনতার পর সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে উন্নয়ন পরিকল্পনাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সোভিয়েত পরিকল্পনার অগ্রগতি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, তার সুবিধাজনক শর্তগুলি তিনি ভারতবর্ষের জন্য গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়েছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি ভারতের

গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণ নিয়ে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। যোজনার (Planning) গুরুত্ব শাসন পরিচালনার কাজ ও দায়িত্ব প্রচুর বাড়িয়ে দিয়েছে; ফলে গত পঞ্চাশ বছরে সরকারী প্রশাসনের ধরন ও কার্যভার প্রভূতভাবে পরিকল্পনার সাফল্য চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

ভারতবর্ষের জন্য পরিকল্পনা রচনার কাজ ও সে বিষয়ে আলোচনা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি গঠনের অনেক আগেই স্বাধীনতা পাওয়ার পূর্ববর্তী কালেই শুরু হয়েছিল। 1944 সালে বোম্বে পরিকল্পনার খসড়া তৈরি হয়। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এই পরিকল্পনা দেশের আটজন অগ্রগামী ব্যবসায়ীদের দ্বারা সৃষ্ট; এর উদ্দেশ্যে 15 বছরে দশ হাজার কোটি টাকা মূলধন নিয়োগ করে মাথাপিছু আয় (Per Capita income) দ্বিগুণ করে তোলা। আরও কয়েকটি খসড়া তৈরি হয়েছিল, যেমন, এম এন রায়ের পিপলস প্ল্যান, গান্ধীয়ান প্ল্যান, বিশ্বেশ্বরার প্ল্যান ইত্যাদি।

1938 সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু যখন কংগ্রেস সভাপতি, তিনিই প্রথম একটি যোজনা কমিশনের প্রস্তাব আনেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে, দেশের পুনর্গঠনের জন্য খুঁটিনাটি বিষয়ে একটি বিশদ নকশা তৈরির কাজ আরম্ভ করার মতো সময় তখনও আসেনি, কিন্তু মূল নীতি ও প্রণালী কি হবে, তা ভাবা চলে। তিনি সমাজতান্ত্রিক ভাবধারাকে সামনে রেখে এগোতে চেয়েছিলেন, এবং দেশ পুনর্গঠনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা তৈরির জন্য একটি কমিশন বসাতে চেয়েছিলেন।

মুম্বাইয়ে 1938-এর ডিসেম্বরে ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির প্রথম অধিবেশনের উদ্বোধন করেন সুভাষচন্দ্র বসু। এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিবিদ, শিল্পপতি ও বিত্তশালী লগ্নীকারকেরা। তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন কংগ্রেস প্রভাবিত রাজ্যগুলি এবং দেশীয় রাজাদের কয়েকজন।

সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির কর্মসূচি উপ-সমিতি চেয়েছিলেন,

1. জীবনধারণে মান-এর দ্রুত উন্নতি।
2. পূর্ণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া এবং প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তির উন্নয়ন,
3. মানব সম্পদ ও পার্থিব সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারে উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটানো, মোট মূলধনের 45 শতাংশ শিল্পোন্নয়নে ব্যয়,
4. সামাজিক ন্যায়পরায়ণতার প্রতিষ্ঠা, আয় ও সম্পদের সমতাপূর্ণ বিভাগ, এবং
5. জাতীয় ও আঞ্চলিক স্বয়ম্ভরতার লক্ষ্যে পরিকল্পনাগুলিকে প্রসারিত করা এবং এইভাবে গ্রাম ও শহরাঞ্চলের বৈষম্যকে কমিয়ে আনা।

1946 সালের অক্টোবর মাসে 'পরিকল্পনা-উপদেষ্টামণ্ডলী'-র সৃষ্টি। তাদের সুপারিশ, পরিকল্পনার কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রয়োজন। উপদেষ্টামণ্ডলীর সুপারিশ অনুযায়ী স্ব-শাসিত প্ল্যানিং কমিশন/যোজনা কমিশন গড়া হয়। 1950 সালের মার্চ মাসে এক সরকারী প্রস্তাবে। পরিকল্পনা ও উন্নয়নের দিকে লক্ষ রাখতে এই অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দক্ষ কমিশনের সৃষ্টি। প্রধানমন্ত্রী চেয়ারম্যান রূপে এর নেতৃত্বে; সহায়ক একজন ডেপুটি-চেয়ারম্যান। সংবিধান বহির্ভূত এই কমিশনের সৃষ্টিকে সমালোচনার বস্তু হতে হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কেন্দ্রের হাতে এটি একটি অস্ত্র যার দ্বারা কেন্দ্র-রাজ্যগুলির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচিকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। স্বাধীনতার পর কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনাকে যখন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কৌশল বলে মনে করা হয়েছে, তখন এমন একটি কমিশন গঠনের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার সুবিধার দিক হল রাজ্যগুলির পক্ষে কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্যের সম্ভাবনা। প্ল্যানিং কমিশনের নির্বাহী দায়িত্ব কিছু নেই। রূপায়ণের কাজ কেন্দ্রে সরকারী বিভাগীয় কার্যালয়গুলির মাধ্যমে এবং রাজ্যগুলিতে। রাজ্যগুলির একটি মিলনভূমি আছে যেখানে তারা পরস্পরের মধ্যে মত বিনিময় করতে পারে। জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদে (National Development Council) আছেন মুখ্যমন্ত্রীরা, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা, এবং প্ল্যানিং কমিশনের সদস্যরা। সভাপতির কাজ করবেন প্রধানমন্ত্রী, যিনি প্ল্যানিং কমিশনের চেয়ারম্যান। রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে আলোচনার দ্বারা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়াস চালানো হয়। অনেক রাজ্যে স্টেটপ্ল্যানিং বোর্ড গড়া হয়েছে; রাজ্যে সম্পদ প্রাপ্তির পরিমাপ ও তার প্রয়োগের সুবিধা বিচার করে, রাজ্যের জন্য পরিকল্পনা রচনা করাই তার কাজ।

ভারতবর্ষে উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনার কাজ শুরু হ'য়েছে 1951 সাল থেকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে। মাঝে মাঝে কিছু বাধা এসেছে, পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট সময়ের বদল করতে হ'য়েছে, তবু পরিকল্পনায় পঞ্চবার্ষিকী নীতিকে মেনে চলা হ'য়েছে। এখন আমরা অষ্টম পরিকল্পনা কালের মধ্যে (1992-97) রয়েছি।

সরকারী উদ্যোগে শিল্প/ব্যবসায় সংস্থা

সরকারী উদ্যোগে চালিত শিল্প সংস্থার মধ্যে পড়ে জনহিতকর কার্যে নিযুক্ত এবং বিভাগীয় উদ্যোগে গ্রহণ করা কাজগুলি যেগুলির মালিকানা ও পরিচালনার ভার কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের হাতে। তাছাড়া অন্যান্য শিল্পোদ্যোগ যার জন্য সরকার মূলধন ও ঋণ দিয়েছে।

সরকারী উদ্যোগের একচ্ছত্র অধিকার রেল বিভাগের ওপরে। কিন্তু বায়ু যানের ওপরে আর নয়, বায়ুপথের কিছু কিছু ভার এখন বেসরকারী হাতেও

গিয়েছে। সরকারী উদ্যোগের কর্মক্ষেত্র এখন ঋণদান সংস্কার; কয়লা ও খনিজ সম্পদ আহরণে, বিদ্যুৎ উৎপাদনে, পেট্রোলিয়মজাত দ্রব্যের অনুসন্ধান ও আবিষ্কার ও পরিষ্কৃত করণ, ব্যাঙ্কিং ইনসিওরেন্স, ইস্পাত, পোতনির্মাণ ও পরিবহণ, যন্ত্রের কলকব্জা নির্মাণ, সার উৎপাদন, কীট পতঙ্গ-নাশক ঔষধ, পেট্রোকেমিক্যাল্স্ এবং ঔষধ ও বস্ত্র।

শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ইনফ্রাস্ট্রাকচার (যেমন, পথঘাট, বাড়ি, বিদ্যুৎ, জল, যানবাহন ইত্যাদি) তৈরি করার ব্যাপারেও সরকারের একটি বড় ভূমিকা। স্বাধীনতার আগেও (বিদেশী) সরকার মালিকানা নিয়ে চালু করেছিল বিভাগীয় উদ্যোগে কিছু সংস্থা, যেমন, রেলপথ, সেচ ও পূর্ত দপ্তরের কাজ; তাছাড়া কয়েকটি জনহিতকর কাজ যেমন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, বন্দর প্রভৃতি। স্বাধীনতার পরবর্তী কালে আর্থিক সম্পদ ও সামাজিক ন্যায়বিচারের কথা ভেবে শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ও সরকারী উদ্যোগে কাজের শুরু হ'য়েছে। স্বাধীনতার কুড়ি বছরের মধ্যেই এই সংস্থাগুলি অর্থনীতি জগতে উচ্চস্থান অধিকার করেছে। শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগ এবং সরকারী উদ্যোগে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান স্থাপনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ পরিকল্পিত পথেই করা হয়েছে এবং সে কথাই বলা হ'য়েছে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে ও 1948 ও 1956-র শিল্পনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবে।

সরকারী উদ্যোগে একটি নিগম বা সমিতি বিধানসভায় একটি বিশেষ আইনের বলে কোম্পানীজ্ অ্যাক্ট অনুযায়ী গড়ে ওঠে। বিধানসভা ঐ কোম্পানীর কাজকর্ম সম্বন্ধে বিবরণ চাইতে পারে। সরকারী উদ্যোগে সৃষ্টি ঐ কোম্পানীকে তার বার্ষিক আয় ব্যয় ও কাজের হিসাব পেশ করতে হয় বিধানসভার কাছে। সরকারী উদ্যোগে গড়া ঐ কোম্পানীগুলির কাজকর্মের হিসাব নিতে লেজিসলেচার কমিটি রয়েছে। এই ভাবেই সরকারী উদ্যোগে গড়া ইউনিটগুলির (PSUS) বাধ্যবাধকতা পালনের দায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। প্রত্যেক বছর বাজেট পেশ করার সময় গভর্নমেন্ট সবগুলি সরকারী উদ্যোগে গড়া সংস্থার (PSUS) রিপোর্ট তৈরি করে বিধানসভায় পেশ করে।

পূর্বে উল্লিখিত এলাকাগুলি ছাড়াও প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং-এর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। একটি বিশাল এলাকাজুড়ে; যেমন, কৃষি, হরিজন গিরিজনের মতো অবনত শ্রেণীর উন্নয়ন, দরিদ্রদের জন্য আশ্রয়স্থান, বাণিজ্য ও শিল্প, আর্থিক প্রকল্প ও ব্যাঙ্কিং, শিক্ষা ও গবেষণা, জনহিতকর প্রতিষ্ঠান, নাগরিকদের স্বাস্থ্যোন্নয়ন, পানীয়জল, দুধ ও অন্যান্য ডেয়ারিজাত খাদ্যের ব্যবস্থা ... কেন্দ্রীয় সরকারের মত রাজ্যসরকার সরকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে, তার জন্য বিধানসভায় স্বতন্ত্র ভাবে কোন আইন পাশ করার প্রয়োজন হয়নি।

সরকারী উদ্যোগ সম্পর্কিত বিভাগটি শিল্পমন্ত্রণালয়ের একটি অংশ। প্রথম দিকে ব্যুরো অব পাবলিক এনটারপ্রাইজেস্ (B.P.E.) সৃষ্টি করা হ'য়েছিল কাজের সমন্বয় সাধন ও মান নির্ণয়ের জন্য সরকারী উপ্যোগে পরিচালিত সংস্থাগুলির গুরুত্ব বিচার করে। এই বিভাগটি সরকারী (B.P.E.) প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য দেয় ও পরিচালিত করে নানাভাবে, যেমন, প্রযুক্তির পরিবেশ ও সাফল্যের সম্ভাবনা খুঁটিয়ে দেখতে, তথ্য সংগ্রহ করে, এবং সকলের স্বার্থে সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহের (ক্লিয়ারিং হাউস অব ইনফরমেশন) মাধ্যম রূপে কাজ করে। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির শীর্ষ আধিকারিকদের নির্বাচনেও পাবলিক সেকটর এন্টারপ্রাইজেস বোর্ডকে (P.S.E.B) দৃষ্টি দিতে হয়।

যোজনায় বিকেন্দ্রীকরণের চিন্তা

অনেক দিন পর্যন্ত যোজনা রচিত হ'য়েছে ওপর থেকে; স্থানীয় ও আঞ্চলিক উন্নয়নের কাজে বিকেন্দ্রীভূত যোজনার প্রয়োজন। জেলা ও ব্লক স্তরে উন্নয়ন পরিকল্পনার নকশা তৈরি করার অনেক চেষ্টা হ'য়েছে। সাম্প্রতিককালে সংসদীয় সংশোধনে জেলা ও তার নিচের স্তরে গ্রাম ও শহরাঞ্চলের স্ব-শাসিত অঞ্চলগুলির জন্য তিন স্তর বিশিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি হ'বে বা হ'চ্ছে।

সরকারী প্রশাসন নাকি উন্নয়নমূলক প্রশাসন?

কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য ও দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের চিন্তা সরকারী কাজের ধরন পুরো বদলিয়ে দিয়েছে। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষাই কোন শাসনতন্ত্রের একমাত্র কাজ নয়। একথা আরও সত্য যখন সেই দেশ অনুন্নত অথবা উন্নতিশীল। বর্তমান রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতিতে নাগরিক জীবনের মানোন্নয়নের চেষ্টা প্রতিমুহূর্তে কাজ করে যাচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় বৃহত্তর ক্ষেত্রে সমাজের হিতসাধন, তার পরিবেশ রক্ষা, তার বনসম্পদ, পশুপক্ষী ও বন্যজন্তুদের সংরক্ষণ, এগুলিও সরকারের কাজের মধ্যে এসে পড়েছে। দেশকে দূষণ মুক্ত করা, সম্পদ সংরক্ষণ ও তার বণ্টনব্যবস্থা, আর্থিক ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা, এ'সবগুলি নিয়েই এখন গভর্নমেন্টকে ভাবতে হ'চ্ছে। অ্যাডাম স্মিথের সময়ে মুক্ত বাজার ব্যবস্থা ও কোন ব্যাপারে হাত না দেওয়ার নীতি খুব ভাল ছিল। এখন অন্তহীন সমস্যা চার দিকে-দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা ও পরিবারিক কল্যাণ, অত্যাবশ্যক দ্রব্যের বণ্টনব্যবস্থা নারী, শিশু ও দুর্বল মানুষকে আশ্রয় দেওয়া প্রভৃতি বিষয়গুলি নিয়ে এখন ভাবতে হ'চ্ছে শাসন-কর্তৃপক্ষকে। প্রশাসন এখন শুধুমাত্র সরকারী ব্যাপার নয়, উন্নয়নমূলক দৃষ্টি থেকে কার্য পরিচালনা। উন্নয়নমূলক প্রশাসন ব্যবস্থায় মুক্ত ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন। উন্নয়নমূলক প্রশাসন অত্যন্ত জটিল কারণ কর্মসূচি এখন বহুমুখী, আধিকারিককুলও

বিভিন্ন দিকে ধাবিত। ওপর থেকে নিচে ও সমস্তরে সর্বত্র সমন্বয় দরকার। পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে যোগসাধনের কথা ভাবতে হয়। বর্তমানকালের প্রশাসকদের সহানুভূতিশীল হ'য়ে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করতে হবে। সরকারী কাজ এখন বহুমুখী হ'য়ে উঠেছে বলে প্রশাসকদের স্ববিবেচনার কাজ করার ক্ষমতাও বাড়াতে হ'য়েছে। সতর্ক হ'য়ে না চললে, এই ক্ষমতার অপব্যয় ঘটতে পারে, তখন তাদের কৈফিয়ত দেওয়ার সময় আসবে। ক্ষমতার অপব্যয় রোধ করার ব্যবস্থাও থাকা উচিত।

সংবিধান রচিত হওয়ার পর, জনসংযোগ বাধ্যতামূলক হয়ে উঠেছে; গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদের চিন্তাধারাও একইরকম; নীতিমূলক নির্দেশ ও মৌলিক অধিকার। পরিমাণ ও গুণগত দিক থেকে প্রশাসনের কাজ প্রচুর বদলে গিয়েছে। কাজের ধরন ও সরকারী কর্মচারীর সংখ্যাও বেড়েছে। সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিতেও শুধুমাত্র কল্যাণমূলক কাজ নয়, কাজ সম্বন্ধে জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা দরকার। আজ একজন সরকারী নির্বাহিককে তার পরিবেশ (রাজনৈতিক প্রভাব) নিয়ে ভাবতে হয়, তাকে উন্নয়নমূলক প্রশাসনের কাজে দক্ষ হ'তে হ'বে। উদারনীতি ও বিশ্বমুখীনতার সঙ্গে আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন জানা ও আদান-প্রদানের শর্ত বুঝবার দক্ষতা একটি বিরাট গুরুত্ব আরোপ করেছে তার কাজে যা' আগে অজানা ছিল।

নতুন অর্থনৈতিক অপরাধের সৃষ্টি হচ্ছে সেখানে সরকারী হস্তক্ষেপ দরকার। রাজনৈতিক স্থিরতা না থাকায় এবং আঞ্চলিক দল গড়ে ওঠায় সরকারী কর্মসূচিও অনেক বেড়ে গিয়েছে। আজ সারা পৃথিবীতে যা ঘটছে তার খবর রাখতে হ'বে। শাসন কর্তৃপক্ষকে বিপুল ধরনের কাজের ধরন ও গতি বুঝতে হ'বে।

সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দুটি ধারা—সরকারী ভূমিকাকে কমিয়ে আনা আবার বাড়ানো। আগেই বলা হ'য়েছে যে সব ক্ষেত্রে এই কমিয়ে আনার কাজ। শাসন কর্তৃপক্ষকে এখন আরও বেশি উদ্যমে কাজ করতে হবে, আইনকে প্রতিষ্ঠিত করে আইনের নিয়মকে তুলে ধরা, অপরাধ ও হিংসাত্মক ঘটনার বিরুদ্ধে লড়াই করা, ক্রেতা ও পণ্য-ব্যবহারকারীকে বাঁচানো, সাক্ষরতার প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি মেটানো, বিদ্যালয়শিক্ষার অভাব মোচন, এবং স্বাস্থ্য রক্ষা, পানীয় জল ও সকল মানুষের জন্য গৃহের ব্যবস্থা করার মধ্য দিয়ে।

তিন

অসামরিক, পুলিশ ও বিচারবিভাগীয় প্রশাসন

অসামরিক প্রশাসন

ইতিহাসের বিবর্তনের পথ ধরে ভারতের বিভিন্ন অংশে অসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ ঘটেছে। স্বাধীনতা হাতে আসার পর প্রশাসনকে তার ঘর সাজাতে হ'য়েছে। প্রথমেই যে কাজে হাত দিতে হ'য়েছে। তা'হল দেশবিভাগের ফলে উদ্বাস্তু হ'য়ে যাওয়া মানুষের পুনর্বাসন ব্যবস্থা, দেশীয় রাজ্যগুলিকে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা এবং স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনুযায়ী সরকারী নির্বাহিক ও কর্মচারীদের সংখ্যা বাড়ানো। একই সঙ্গে দৃষ্টি দিতে হ'য়েছে উন্নয়ন পরিকল্পনায় দীর্ঘমেয়াদী কাজগুলিতে এবং মানুষের হিতসাধনমূলক কাজে। যে সব সুবিধা ও কাজের মূল ধারাগুলি বর্তমান ছিল, সেগুলির ওপরে বিস্তার শুরু হ'ল। মহাকরণকে বড় করা হ'ল। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের আধিকারিকদের এবং নূতন সৃষ্ট ভারতীয় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের আধিকারিকদের ও রাজ্য সিভিল সার্ভিসের (IAS) আধিকারিকদের ডেকে আনা হ'ল মহাকরণে ও বিভাগীয় প্রধানের পদে। নতুন গণতান্ত্রিক কাঠামোর প্রয়োজন হ'ল বিভিন্ন স্থানে উপদেষ্টামণ্ডলী ও কমিটি বসানো। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিরও কর্মচারী সংখ্যা বাড়াতে হ'ল।

কেন্দ্রের মত রাজ্যগুলিরও রয়েছে মহাকরণ, সেখানে সচিব ও বিভাগীয় প্রধানেরা বসে। দপ্তরগুলির মধ্যেও বড় থেকে ছোট এবং জেলা থেকে ব্লকস্তর অবধি প্রসারিত। এই ব্লকগুলির সৃষ্টি 1952 সালে যখন কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম গড়ে ওঠে। জেলাস্তরের বিভাগীয় আধিকারিকেরাও তাদের কাজের হিসাব দেয় জেলা-সমাহর্তার কাছে যিনি জেলায় সরকারী প্রতিনিধি রূপে বিভিন্ন দপ্তরের কাজের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করেন। তিনি গ্রাম ও রাজ্যের মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী। জেলাকে রাজস্ব সংগ্রহের দিক থেকে মহকুমা, তালুক ও তহসিলে ভাগ করা হ'য়েছে উন্নয়নের দিক থেকে ব্লকস্তরে। এক বা একাধিক গ্রাম নিয়ে পঞ্চায়েত; আর গ্রাম হ'ল প্রশাসনের সবথেকে নিচের ইউনিট।

মহাকরণ বা সচিবালয়

ব্রিটিশ আমলে যে ভাবে ছিল এখনও সেই ভাবেই রয়েছে কেন্দ্রীয় মহাকরণ। ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় চারটি পর্ষদ গড়া হ'য়েছিল, যার প্রত্যেকটি একজন সচিবের অধীন ছিল। একজন মুখ্যসচিব তাদের কাজের যোগাযোগ রক্ষা করত।

1919 ও 1935 সালে রাজ্যগুলিকে অনেকটা স্বাধীনতা দেওয়া হ'লে তারাও কেন্দ্রের সঙ্গে নীতি ও নীতি রূপায়ণের দায়িত্বের অংশ পেয়েছিল। তবুও কেন্দ্রকেই দেখতে হ'ত প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপার, কারণ সেগুলি রাজ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (1939-1945) যখন আরম্ভ হ'য়েছিল, তখন সচিবালয়ের 50 জনের বেশি আধিকারিক ছিল না। যুদ্ধের ফলে নানা সমস্যার সৃষ্টি, তার মধ্যে ছিল স্বল্পতা ও তার জন্য খাদ্যাদি সংবিভাগের পদ্ধতি চালু করা হ'ল। স্বাধীনতা পাওয়ার পর শাসন কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য বদলে যাওয়ায় এবং উচ্চস্তরের আধিকারিকদের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায়, দপ্তর ও কার্যালয়গুলির বিপুল প্রসার ঘটল; সঙ্গে সঙ্গে আধিকারিক ও কেরানি উভয়স্তরেই সংখ্যার বিস্তৃতি দেখা দিল। সংখ্যার দিক থেকে এই বিস্তৃতি এতই বিপুল যে, গুণগত উৎকর্ষের কথা ভাবাই হয়নি। এই ব্যাপারকে সে সময়ের এক বিরাট দুর্ঘটনা বলে বর্ণনা করা যায়।

সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় সচিবালয় রাজ্যগুলির মধ্যে কাজের সমন্বয় সাধন করে। জাতীয় লক্ষ্যের অনুসরণে দেশের বিভিন্ন অংশে যে কাজ চলেছে, তার সূচনা দেওয়ার ও সমন্বয় সাধনের দায়িত্বও তাদেরই। কেন্দ্রীয় সচিবালয় ও রাজ্যসচিবালয়কে সেই সব কাজগুলি সম্পাদন করতে হয়, ম্যানেজমেন্ট পরিভাষায় যাদের বলা হয়—POSDCORB অর্থাৎ planning (পরিকল্পনা), organisation (সংগঠন), Staffing (কর্মচারী সংগ্রহ করা), Co-ordinating (সমন্বয়), Reporting (বিবরণী) ও Budgeting (আয় ও ব্যয়ের বার্ষিক আগাম হিসাব)। যথাক্রমে কেন্দ্র ও রাজ্যের বিষয়গুলির পরিচালনা তারা করে। কাজ সুসম্পন্ন করার জন্যে তাদের সঠিক সময়ে সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করে সেগুলি সঠিক জায়গায় দিতে হয়। মন্ত্রীদের নীতি ও পরিকল্পনা রচনায় এবং বিধানসভার কাজে এবং লোকসভা বা বিধানসভায় প্রশ্ন উঠলে তার উত্তর তৈরি করে দিতে সচিবালয়কে সব সময় তৈরি থাকতে হয়।

কেন্দ্র ও রাজ্যে উভয় স্থানেই নিছক নীতি রূপায়ণ ছাড়াও সচিবালয়ের অনেক বেশি দায়িত্ব এখনকার দিনে। তাই সচিবালয়/মহাকরণের আধিকারিকেরা উচ্চমর্যাদা যেমন পায়, অন্য বিভাগীয় কর্মচারী বা দপ্তরের প্রধানদের চেয়ে বেতনও তেমনি বেশি পায়।

সচিবালয়কে অনেক সাধারণ ব্যাপারে হাত দিতে দেখা যায়, যেমন নিচের স্তরের আধিকারিকদের পদাধিকার ও বদলির ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া। এর ফলে নীতি ও পরিকল্পনা রচনার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে তাদের মনোযোগ ও উৎসাহ অন্যদিকে সরে যায়। তার জন্য প্রায়ই প্রশ্ন ওঠে, যে তারা অকারণ জায়গা জুড়ে আছে তাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ার পরেও। যে দায়িত্বভার বাইরের অথবা কর্মরত আধিকারিকদের হাতে দেওয়া যায়, তা না দিয়ে, তারা শুধু কাজকেই পেছিয়ে দিচ্ছে।

মন্ত্রী ও তাঁর কর্মীবর্গের অধিকার ক্ষেত্র

মন্ত্রীদের ও তাঁদের কর্মীবর্গের মধ্যে কাজের যে বিভাগ করে দেওয়া হয়েছে কর্ম সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীতে, তার দ্বারাই চালিত হয় সচিবালয় ও তার দপ্তরগুলি। একজন মন্ত্রীর হাতে অনেকগুলি বিভাগ থাকতে পারে, যেমন কৃষি মন্ত্রণালয়ের হাতে পশুপালন ও বনবিভাগ থাকে। প্রত্যেকটি বিভাগের দায়িত্বে থাকেন একজন সচিব যাঁকে সহায়তা দেন অতিরিক্ত বা যুগ্ম সচিব, অধ্যক্ষ, সহ-সচিব, অবর-সচিব ও উপ-বিভাগ যা একজন পরিদর্শকের হাতে থাকে যাঁকে বলা হয় সেকশন অফিসার। এই পরিদর্শক/অধীক্ষককে কয়েকজন কেরানি ও টাইপিস্টের কাজ দেখতে হয়। কর্মসচিবদের নির্বাচিত করা হয় সাধারণত ভারতীয় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস (I.A.S.), সিভিল সার্ভিস, অথবা সরকারী কাজে যাদের যোগ্যতা বিশেষ ভাবে স্বীকৃত তাদের মধ্য থেকে। তাছাড়া আছে বিশেষ দায়িত্বে নিযুক্ত আধিকারিক (Ds. D.) যিনি যুগ্মসচিব, সহ-সচিব বা অধ্যক্ষ যে কোন পদমর্যাদার লোক হ'তে পারেন। অল্পদিনের জন্য কোন কাজে যাঁকে রাখার প্রয়োজন অথবা ভবিষ্যতের কোন দায়িত্বপূর্ণ পদের জন্য যাঁকে তৈরি করা হ'চ্ছে তেমন লোকই এই পদে বসেন। স্বরাষ্ট্র সচিব অথবা ক্যাবিনেট সেক্রেটারির পদেও O.S.D. (বা বিশেষ দায়িত্বে নিযুক্ত আধিকারিক) থাকতে পারেন, যখন ওই সচিবকে চলে যেতে হয়, এবং নতুন ব্যক্তিকে পুরোপুরি দায়িত্ব নেওয়ার আছে কাজ বুঝে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়।

উপ-বিভাগীয় অধীক্ষক ও বিভাগীয় কাজকর্ম

সেকশন বা উপবিভাগে থাকে একজন আধিকারিক ও তাঁর সহকারী কর্মীবর্গ। যে কোন কাগজ বা চিঠি এনে তার ওপর তাদের মন্তব্য পড়ে ও কাজ আরম্ভ হয়। চিঠি বা ঐ কাগজের বিষয়ের ওপরে পূর্বাপর ঘটনার বিশ্লেষণ করে অফিসের নিয়মকানুন অনুযায়ী মন্তব্য লেখা হয়। প্রয়োজনে উত্তরের খসড়াও তৈরি করে দেওয়া হয়। এই মন্তব্যসহ ফাইল আলাদা করে রাখা হয় চিঠিপত্রের ফাইলের সঙ্গে

যে ফাইলটি একটি লাল ফিতা দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। এই লাল ফিতার ফাইল থেকেই 'রেডটেপ' কথার উৎপত্তি। কেরানিকে পাতার ও প্যারাগ্রাফেরও নম্বর দিতে হয়: ফাইলের রেফারেন্স নম্বর ও ফাইল সাজানোর কাজ তাকে শিখে নিতে হয়। কেরানিদের এ'কাজ শেখানোর ভার অধীক্ষকের হাতে।

অধীক্ষক/পরিদর্শক-এর করণীয় কাজ ও সচিবালয় সংক্রান্ত কর্ম সম্পাদনের নিয়মাবলী একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে (manual) দেওয়া থাকে। ম্যানুয়ালে নথি সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলিও বলা থাকে। একটি উপবিভাগকে যখন নথিভুক্তি করণ, সংরক্ষণ ও ফাইল সাজিয়ে রাখার ভার নিতে হয়, তখন দেখা যায় যে, কোন বিভাগীয় প্রধান বা বিশেষ উদ্দেশ্যে নিযুক্ত কোন কমিটি বা কমিশনের অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন বিভাগের প্রত্যেকটি প্রস্তাবকে পরীক্ষা করে দেখে মন্তব্য লেখে উপবিভাগ বা সেকশন থেকে। এর ফলে ফাইল চালাচালিতে অনেক বিলম্ব ঘটে কাজে। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে এবং কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য মাঝে মাঝে চেষ্টা করা হ'লেও অবস্থার কোন উন্নতিই ঘটেনি।

কেন্দ্রীয় সচিবালয় কৃত্যকের মত রাজ্য সচিবালয় কৃত্যক আছে যার কর্মীবর্গকে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। কেন্দ্রীয় সচিবালয় কৃত্যক মহাকরণের (সচিবালয়) কর্মচারী নির্বাচনের কাজ করে সংশ্লিষ্ট অধীনস্থ অফিসের জন্যও। সেকশন অফিসারের গ্রেড থেকে গ্রেড-1 আধিকারিকদের বেছে নেন পার্সোন্যাল ডিপার্টমেন্ট। নতুন দিল্লিতে সেক্রেটারিয়েট ট্রেনিং ম্যানেজমেন্ট নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে তারা কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের সকল আধিকারিকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। প্রায় প্রত্যেক রাজ্যেই অনুরূপ প্রতিষ্ঠান আছে কর্মী প্রশিক্ষণের জন্য। 1972 সালে একটি নতুন উদ্ভাবন হ'ল কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে ডেস্ক অফিসার (D.O.) পদ্ধতির প্রবর্তন। ডেস্ক অফিসার হ'ল একজন উপবিভাগীয় (Section officer) আধিকারিক যে আরেকজনের সঙ্গে একত্রে একটি বিষয়ের ওপর কাজ করে অর্থাৎ দুজনের একটি টিম হ'য়ে কাজ করা, কাজের উদ্দীপনা, গতি ও মানকে তুলে ধরা।

সচিবালয়ের দায়িত্ব

বর্তমানের কেন্দ্রের ও রাজ্যে সচিব মন্ত্রণালয় ও বিভাগীয় দপ্তরের সংখ্যা অনেক। এই সচিবেরা মন্ত্রীদের নীতি প্রণয়নে ও রূপায়ণে সাহায্য করে। আইন ও নিয়ম গড়ার ব্যাপারে, পরিকল্পনা ও উন্নয়নে, আয়ব্যয়ের আগাম হিসাব ও কর্মসূচি তৈরি করার কাজে, অধীনস্থদের কাজের নির্দেশ দেওয়া ও তাদের কাজের মধ্যে সমন্বয় আনার ব্যাপারেও তাদের দায়িত্ব নিতে হয়। সংসদীয়/বিধানসভার নানাকাজে যেমন প্রশ্নোত্তরের ব্যাপারে, কল অ্যাটেনশন মোশান, পাবলিক অ্যাকাউন্টস্ কমিটি,

কনসালটেটিভ কমিটি এবং আইন সভার অন্যান্য কমিটির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের সহায়তা করে সচিবেরা। কোন কোন মন্ত্রণালয় বা দপ্তরকে কঠোর ও পরীক্ষামূলক বলে ভাবা হয়, যেমন স্বরাষ্ট্র ও অর্থদপ্তর (কোয়ালিশন মন্ত্রীসভায় এই দপ্তরের মন্ত্রী মুখ্য/প্রধানমন্ত্রীর নিজের দল থেকে রাখা হয়), প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্ক কয়েকটি আকর্ষক মন্ত্রিত্বের দপ্তরে, যেখানে থাকলে বিদেশ সফরে যাওয়া যায়, যেমন বাণিজ্যদপ্তর ও অর্থনৈতিক দপ্তরে আকৃষ্ট হয় উচ্চাভিলাষী ও গুণান্বিত আধিকারিকেরা। খুব কম লোকেই নিজের থেকে যেতে চায় সমাজসেবামূলক দপ্তরে। আইন বিভাগেও কিছু আধিকারিক আছেন যাঁরা আইন বিশেষজ্ঞ। তাঁদের আইন সংক্রান্ত খসড়া তৈরি করতে হয়, অন্যান্য দপ্তরে আইনি উপদেশও দিতে হয়।

অর্থমন্ত্রকের কাজের বিবরণ

মন্ত্রণালয়গুলি কিভাবে কাজ করে তা বুঝবার জন্য আমরা শুধু একটি মন্ত্রক, অর্থমন্ত্রকের কাজের বিবরণ নিয়ে আলোচনা করবো, ভারত সরকারের অর্থনৈতিক ব্যাপারগুলি (তার মধ্যে ব্যাঙ্কিং ও ইনসিওরেন্স আছে), সরকারের ব্যয় ও রাজস্বের হিসাব নিয়ে কাজ করে। অর্থমন্ত্রীকে সাহায্য করে সচিব, অতিরিক্ত যুগ্ম ও সহ-সচিবেরা এবং অন্যান্য কর্মচারীরা। মন্ত্রকের কাজ হ'ল, যাদের কাছে টাকা পাওয়ার কথা, তাদের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহের ব্যাপারকে নিশ্চিত করা, সেই অর্থ যে ভারত সরকারের অর্থভাণ্ডারে জমা পড়ছে সে দিকে দৃষ্টি রাখা, এবং সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত উদ্দেশ্যের জন্য ও সংসদ নির্দিষ্ট পথে ব্যয়গুলি ঘটছে কিনা দেখা।.

1857-র অভ্যুত্থানের পর গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলে জেমস্ উইলসন নামের এক বিচক্ষণ ধনিককে নিযুক্ত করা হয়। সেই হ'ল সরকারী দপ্তরে অর্থমন্ত্রকের সূচনা। অন্যান্য দপ্তর ও বিভাগের ওপর অর্থমন্ত্রকের প্রাধান্য ক্রমশ বিকাশপ্রাপ্ত হ'ল। 1919 সালের পুনর্গঠনে বিভিন্ন বিভাগের অর্থব্যয়ের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় অর্থমন্ত্রকের দায়িত্ব বাড়লো। এরপর অর্থমন্ত্রকের মর্যাদা বেড়ে গেল যখন সংসদীয় পাবলিক অ্যাকাউন্টস্ কমিটি এবং বিভিন্ন দপ্তরের কাজ অডিট করে দেখার জন্য কনট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের পদের সৃষ্টি হ'ল। কোন বড় রকমের খরচ করতে হ'লে কিংবা সরকারী অর্থ কোথাও বিনিয়োগ করতে হ'লে অন্য দপ্তরগুলিকে অর্থমন্ত্রকের অনুমতি নিতে হয় ঔচিত্যবোধের কথা ভেবে একজন সরকারী কর্মচারীকে সরকারী অর্থকে তার নিজের ভেবে সেই মত সতর্কতা গ্রহণ করতে হ'বে, সেই অর্থ কিভাবে ব্যয়িত হ'চ্ছে তার দিকে লক্ষ রেখে; নীতিগ্রাহ্যভাবে কোন স্বীকৃত অভিপ্রায়ে সেই খরচ করা হ'চ্ছে কিনা তা' তাকে নিশ্চিতভাবে জানতে হ'বে। অর্থ সরবরাহ ও তার ব্যয় এবং পরবর্তী সময়ে কনট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল এবং সংসদীয় পাবলিক অ্যাকাউন্টস্ কমিটির

দ্বারা অডিট ও অর্থমন্ত্রকের খুঁটিনাটি পরীক্ষা সরকারী অর্থের ব্যবহারের সততাকে সূচিত করে। অনেক সময় অর্থমন্ত্রণালয়ের নিশ্ছিদ্র পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ফলে যে বিলম্ব ঘটে তা অন্য বিভাগগুলিতে হতাশার সৃষ্টি করে, অনেক সময় কোন একটি প্রযুক্তির অনুমোদিত ব্যয়ও বেড়ে যায়, জিনিসের দাম বাড়ার ফলে। তবুও এই প্রক্রিয়ায় কোন শিথিলতা সুবিবেচনার কাজ হ'বে না। কারণ, অন্য মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য দপ্তরের একটা প্রবণতা থাকে অতিরিক্ত খরচ করে ফেলার।

বিভিন্ন বিভাগের আর্থিক আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে ঔচিত্যবোধকে সতর্ক করে দেওয়ার দরকার থাকে, আর সে কাজ করে অর্থদপ্তর। কোন অনুদান যদি কাজ সম্পন্ন করার জন্য যথেষ্ট না হয়, তাহ'লে অর্থদপ্তর একটি অতিরিক্ত ব্যয়ের হিসাব তৈরি করে আইনসভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করে। বছরের শেষ ব্যয় করতে না পারা অর্থের প্রত্যর্পণ অথবা মাঝপথে কোন প্রকল্পের কাজ বন্ধ হ'য়ে যাওয়া প্রায়ই ঘটে থাকে। তার জন্য আর্থিক ও আয়-ব্যয়ের হিসাবের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখে অর্থমন্ত্রক, যা' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক বিভাগের অ্যাকাউন্টস সেকশনকে সবল করে রাখতে অর্থদপ্তরের একজন আধিকারিককে নিযুক্ত করা হয় ঐ বিভাগের উপদেষ্টা রূপে। ঐ আধিকারিকটি অবশ্য বিভাগের প্রধান ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর অধীন।

অর্থমন্ত্রকের অর্থনীতি সম্বন্ধীয় দপ্তরের নিয়ন্ত্রণে আছে ব্যাঙ্কিং, ইনসিওরেন্স, বাজেট, বিনিয়োগ, বৈদেশিক ঋণ, এবং কারেন্সি ও মুদ্রা প্রস্তুতকরণ। এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে একটি হ'ল রাষ্ট্রের বার্ষিক বাজেট তৈরি করা। রাষ্ট্রের বাজেট এবং যদি কোন রাজ্য রাষ্ট্রপতির শাসনে থাকে তবে সেই রাজ্যর বাজেট (কেন্দ্রকেই প্রস্তুত করে সংসদে পেশ করতে হয়) সংসদে পেশ করেন অর্থমন্ত্রী। তাঁকে সেই কাজে সাহায্য করে তাঁর দপ্তর। বাজেট হ'ল প্রত্যেক অর্থবর্ষের (1 এপ্রিল-31মার্চ) রাজস্ব ও প্রশাসনিক ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব, সাধারণত ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই সংসদে পেশ করতে হয়। বিশেষ উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র করে রাখা অর্থের হিসাব ও অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের অডিট রিপোর্ট সংসদীয় পাবলিক অ্যাকাউন্ট্স্ কমিটির কাছে দিতে হয়। যদি কোন উল্লেখ্য আর্থিক অসঙ্গতি ও ব্যয়ের জন্য অনুমোদন না থাকে তবে অর্থদপ্তরকে তা জানাতেই হ'বে।

অর্থমন্ত্রকের ব্যয়বরাদ্দ বিভাগই ভারতসরকারের সম্পূর্ণ ব্যয়ের হিসাবের তত্ত্বাবধান করে। এই বিভাগ অন্যান্য দপ্তর ও আধিকারিকদের মেনে চলার জন্য নিয়মকানুন বেঁধে দেয়, প্রত্যেকের অর্থব্যয়ের ক্ষমতাও নির্দিষ্ট করে দেয়। এই বিভাগের হাতেই পরিকল্পনার অর্থ, রাজ্যগুলিকে অতিরিক্ত অনুদান, আর্থিক সাহায্য ও ঋণ, মন্ত্রণালয়গুলিতে ব্যয়ের হিসাব জানানো, সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে আয়ব্যয়ের হিসাব সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া ইত্যাদি।

রাজস্ববিভাগের দুটি আইনানুগ পর্ষদ, প্রত্যক্ষ কর সম্বন্ধীয় কেন্দ্রীয় পর্ষদ,

(CBDT) এবং অন্তঃশুল্ক ও রপ্তানী-আমদানীর ওপর শুল্ক সম্বন্ধীয় কেন্দ্রীয় পর্ষদ (CBEC)। এ'ছাড়া সংশ্লিষ্ট দপ্তর যেমন ইকনমিক ইনটেলিজেন্স ব্যুরো বা অর্থসম্বন্ধীয় গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ বিভাগ, ও নারকোটিক্স্ কনট্রোল বোর্ড, বা আফিম গাঁজা জাতীয় চৈতন্য বিলোপকারী ঔষধ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ ইত্যাদি। CBDT বা প্রত্যক্ষ কর সম্বন্ধীয় পর্ষদ প্রত্যক্ষকর সংগ্রহের দিকটি দেখে; CBEC বা অন্তঃ শুল্ক-বহিঃশুল্ক সম্বন্ধীয় পর্ষদ আমদানী ও রপ্তানীর ওপর শুল্ক আদায়ের নীতি তৈরি করে। অনুরূপ, চোরাচালান বন্ধ করা, অন্তঃ শুল্ক ও বহিঃশুল্ক সংগ্রহের প্রশাসনিক দিক দেখা, চৈতন্য বিলোপকারী ঔষধের (বা ড্রাগ) নিয়ন্ত্রণ, স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ব্যাপারগুলির তত্ত্বাবধান করে। অর্থ মন্ত্রকের আধিকারিকদের প্রত্যেকটি দপ্তরে রাখা হয় সেই সব বিভাগ/দপ্তরগুলিকে আর্থিক ঔচিত্যবোধ ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে সজাগ রাখার জন্য। রাজ্যগুলিতে অর্থমন্ত্রকের পরিচালনায় অনেকগুলি সাবট্রেজারি (বা রাজস্ব সম্বন্ধীয় কোষাগার); বর্তমানে অনেক রাজ্যে জেলার ট্রেজারির কার্যভার ব্যাঙ্কের হাতে দেওয়া হ'য়েছে। অর্থদপ্তরকে ঋণ সংগ্রহের দিকটিও দেখতে হয়। প্রতিদিনের আয়ব্যয়ের হিসাব দেখে উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা করতে হয়। অর্থ অলসভাবে ফেলে না রেখে তা থেকে আয়ের পথ বাড়ানোর কথাও তাকে ভাবতে হয়।

রাজ্যসরকারের আয়ব্যয়ের হিসাব রাখা ও পরীক্ষা করে দেখার ভার অ্যাকাউন্ট্যান্ট্ জেনারেলের (A.G.) ওপর, যিনি কনট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের রাজ্য প্রতিনিধি। বস্তুত হিসাব রাখা ও হিসাব পরীক্ষা (accounts and audit) স্বতন্ত্র করে রাখা দরকার যাতে স্বাধীন হিসাব পরীক্ষার ফলে হিসাবে গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। AG বা অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল রাজ্য সরকারের স্বতন্ত্র উদ্দেশ্যে রাখা টাকার হিসাবও তৈরি করে এবং (audit) পরীক্ষা করে অডিট রিপোর্ট দেয়। এই রিপোর্টগুলি (কন্ট্রোলার অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল) রাজ্যপালের কাছে পাঠায়, যিনি সংবিধানের 151(2)ধারা অনুযায়ী সে রিপোর্ট আইনসভার সামনে উপস্থাপিত করেন। (CAG) সি.এ.জি-এর বার্ষিক প্রতিবেদন ও তার সঙ্গে রাজ্যের ব্যয়ের (স্বতন্ত্র করে রাখা টাকার) হিসাব এবং এ.জি.-র হিসাব পরীক্ষার রিপোর্ট প্রতিবছরের শেষে রাজ্য বিধানসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস্ কমিটির কাছে পাঠানো হয়। পি.এ.সি. (বা পাবলিক অ্যাকাউন্টস্ কমিটি)-কে ব্যয়ের ঔচিত্য ও ন্যায্য সম্পর্কে এবং ওই ব্যয়ের অনুমোদন সম্পর্কে পরীক্ষা করার পর সন্তুষ্ট হতে হয়। তার জন্য অডিটর রিপোর্টের কিছু কিছু অংশের বিসয়ে সংশ্লিষ্ট সচিবের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর ও আলোচনায় বসারও দরকার হয়। এই পদ্ধতি হ'ল একটি অস্ত্র যার দ্বারা বিধানসভা নির্বাহিক বর্গকে শঙ্কার মধ্যে রাখতে পারে—শঙ্কা, কারণ ঠিক সময়ে বিচক্ষণতার কাজ করতে না পারলে প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে।

রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থা কেন্দ্রের মতো একই ভাবে সাজানো হয়। রাজ্যেও একটি সচিবালয়, যা' অনেকগুলি বিভাগে/দপ্তরে বিভক্ত। রাজ্যগুলিতে স্বরাষ্ট্র, আইন ও অর্থ দপ্তরের বাইরে অন্য দপ্তরগুলি হ'ল—রাজস্ব, পূর্ত, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, শ্রম, শিল্প, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেচ, পরিকল্পনা, জনকল্যাণ, উপজাতি ও অনুন্নত শ্রেণীর কল্যাণ ইত্যাদি। প্রতি বিভাগের প্রধান হ'য়ে থাকেন একজন আই.এ এস. আধিকারিক যিনি গভর্নমেন্টের সচিবের মর্যাদা পান। মুখ্য-কর্মসচিব রাজ্যের অসামরিক কর্মচারীদের নেতৃত্বে থাকেন। তিনি ক্যাবিনেটের সচিব। কেন্দ্রের ক্যাবিনেট সচিব'-এর মতো তিনিও রাজ্যে সমান ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী। তিনি রাজ্যের সবগুলি দপ্তর, বিভাগ ও উপবিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন।

বিভাগীয় প্রধান

প্রশাসন কর্তৃপক্ষের (government) নীতি রূপায়ণের জন্য কার্যসম্পাদনকারী প্রতিনিধিদের বিভাগীয় প্রধান বলা হয়। কাজের সহায়তা দিতে তাদের অধীনে অন্যান্য কর্মচারী ও কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী কার্যালয় থাকে। তাদের দায়িত্ব প্রতিদিনের কাজের তালিকা ধরে কাজ করে যাওয়া; নিজের নিজের দপ্তরের উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ দেখা, এবং যে সম্পদ (asset) সৃষ্টি হ'য়েছে তার হিসাব রাখা। বিভাগীয় প্রধান, আধিকারিকেরাই সচিবালয় ও বাস্তব কর্মক্ষেত্রের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে। কখনও কখনও তাদের বিভাগের সচিব হিসাবে এক্স-অফিসিও মর্যাদা দেওয়া হয়. যখন তাদের গুরুত্ব মেনে নেওয়া হয়, আর যখন তাদের হাতে যে কাজ দেওয়া আছে সেই কাজ বেশি লেখালেখি না করে' খুব অল্প সময়ে সম্পন্ন করা দরকার।

বিভাগীয় আধিকারিকদের হাতে যে ক্ষমতা দেওয়া হ'য়েছে, তা সবসময়ে খতিয়ে দেখা দরকার। প্রয়োজন হ'লেই তা বাড়িয়ে দিতে হ'বে, যাতে সাধারণ মানুস ঐ বিভাগীয় কার্যালয় থেকে যা চায়, তা পেতে পারে; সময়মতো কাজ হওয়াটা একটা বড় জিনিস। একই সঙ্গে লক্ষ রাখতে হ'বে যে, সরকারের স্বার্থরক্ষার কাজে যেন ত্রুটি না থাকে।

জেলাস্তরে ও তারও নিচে

এই পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে জেলা সমাহর্তা ও জেলা প্রশাসনের বিবর্তনের রূপ দেখানো হ'য়েছে। অনেক রাজ্যে নির্বাহিক ক্ষমতা সমাহর্তার হাতেই দেওয়া হ'য়েছিল। তাঁর হাতে শুধু অপরাধ নিবারণ নয়, শাস্তি দানের ক্ষমতাও ছিল। আজ কোন সমাহর্তাই বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী নয়, তাই নির্বাহিক ক্ষমতা ও বিচার বিভাগীয় ক্ষমতার পৃথকীকরণ সম্পূর্ণ। সমাহর্তাকে রাজস্ব সংগ্রহের কাজে সহায়তা দেন উপ-সমাহর্তারা; তাঁরা সমাহর্তাকে রাজস্ব আদায়

ছাড়াও জেলার কোষাগার পরিচালনা, সাধারণের মধ্যে বণ্টনব্যবস্থা, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন প্রভৃতি কাজেও সাহায্য করেন। সমাহর্তা জেলার উন্নয়নমূলক কাজগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন তাঁর বিভাগীয় আধিকারিকদের সাহায্যে। যাঁদের মধ্যে আছেন জেলার শিক্ষা-আধিকারিক, কৃষি আধিকারিক, শিল্পোন্নয়ন আধিকারিক, জেলা শ্রম-বিভাগীয় আধিকারিক, জনস্বাস্থ্য ও পূর্তবিভাগের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ও বাস্তুকার প্রভৃতি। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তাঁকে সাহায্য করে আরক্ষা বিভাগের অধীক্ষক ও তাঁর আধিকারিকেরা। জেলায় অনেক উপদেষ্টা ও উন্নয়নমূলক কমিটি আছে জেলা সমাহর্তা যেগুলির চেয়ারম্যান।

অনেক রাজ্যে সমাহর্তার কাজ পরিদর্শনের জন্য রাজস্ব পর্ষদ রয়েছে। অনেকে মনে করেন যে, প্রশাসন ব্যবস্থার ক্ষতি না করে এই পর্ষদকে তুলে দেওয়া যেতে পারে।

সমাহর্তার অধীনে কার্যব্যবস্থা এই রকম—জেলায় মহকুমাগুলির কার্যালয়, তরুণ আই.এ.এস. ক্যাডারের আধিকারিকেরা কাজ শেখার জন্য অথবা রাজ্য দেওয়ানি কৃত্যকের আধিকারিকেরা, যাদের বলা হয় রাজস্ব বিভাগীয় আধিকারিক যেখানে অধিষ্ঠিত হয়, এবং তারপর তালুক বা তহসিল। এগুলির ভার পড়ে তহসিলদারদের হাতে। মহকুমাকে ভেঙে তালুক বা তহসিল। তাদের কাজ রাজস্ব আদায় ও অন্যান্য নানাধরনের ব্যাপার। 1952 সালে যখন **কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম** চালু করা হয়, তখনই তহসিলের স্থানে উন্নয়নমূলক সমাজ পরিকল্পনার জন্য ব্লক সৃষ্টি করা হয়। অনেকগুলি গ্রাম একত্র করে একটি পঞ্চায়েত হ'য়েছে, প্রশাসনের সবচেয়ে নিচের ধাপে রয়েছে গ্রাম। গ্রামপ্রধান (মাদ্রাজে বলে কার্নাম, বোম্বেতে কুলকার্নি, অন্য কোন কোন রাজ্যে পাটোয়ারি) অত্যন্ত ক্ষমতাশালী এক ব্যক্তি। সে গ্রামবাসীদের বন্ধু ও উপদেষ্টা; গ্রামে এমন কিছু ঘটে না যা' তার জানা নয়। বিভাগীয় উন্নয়নমূলক প্রযুক্তির কর্মচারীদের গ্রামাঞ্চলে আসার পর থেকে গ্রাম-প্রধানের সেই মর্যাদা চলে গিয়েছে। গ্রমে নিযুক্ত আধিকারিক এখন গ্রামবাসীদের নথিপত্রের রক্ষক, তিনিই এখন আয় ও যৌথ অধিকারের প্রমাণপত্র দেন।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা এখন প্রবর্তিত হ'তে চলেছে। জেলা ও তার নিচের স্তরের প্রশাসনের ভার এখন গ্রহণ করবে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। 7 ম পরিচ্ছেদে সে বিষয়ে আলোচনা করা হ'য়েছে।

রাজ্যশাসন প্রণালী কি আরও ভাল হতে পারে

উল্লিখিত সবরকমের সুবিধা ও কাজ চালাবার নিপুণ যন্ত্রপাতি থাকা সত্ত্বেও চারদিকে সমালোচনা দেখা দিয়েছে যে, প্রশাসনের কাছ থেকে সহানুভূতিশীল ব্যবহার পাওয়া যায় না; সময়মতো কোন উত্তর পাওয়া যায় না। সিদ্ধান্ত নেওয়া

হয় অনেক দেরিতে, কোন কাজ পেতে হ'লে ওপর থেকে নিচে পর্যন্ত সকলের পায়ে তেল ঘষতে হয়। বস্তুত একথা সকলেরই জানা, যে, দ্রুত কাজ পেতে বড় ব্যবসায়ীরা মোটা টাকার ব্যবস্থা করে রাখে। আমাদের আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটি প্রবাদ বাক্য এই যে, উঁচুতলার মানুষের মাথাতেই যত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সঞ্চয়, আর মইয়ের নিচের দিকে যারা আছে তাদের তা নেই, তাই তাদের পরামর্শের কখনও প্রয়োজন হয় না।

রাজনীতিকেরা তাদের অভিযোগের আঙুল তুলে ধরেছে প্রশাসকদের দিকে। আমরা আগেই বলেছি যে, বিভাগের প্রধানদের হাতে এবং সংশ্লিষ্ট কার্যালয়গুলিকে যদি আরও ক্ষমতা দেওয়া যায় তাহ'লে ভাল ফল পাওয়া যাবে। কিন্তু আমাদের রক্তেই রয়েছে দোষ, সামান্য কাজের জন্যও আমরা সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষের কাছে ছুটি। কাজেই ছোট বড় প্রত্যেক ব্যাপারের সিদ্ধান্ত ওপরের তলাতেই—এবং এই প্রবণতা বেড়েই চলেছে। দপ্তরের প্রধান যিনি তিনিও তাঁর অধীনে যারা কাজ সম্পন্ন করে, তাদের হাতে ন্যূনতম ক্ষমতা ছেড়ে দেন। অন্য দপ্তর বা বিভাগীয় প্রধানকে কার্যভার ও ক্ষমতা অর্পণ করার ব্যাপারে অর্থদপ্তরই সবচেয়ে বেশি দ্বিধাগ্রস্ত। যে আধিকারিক কৃষি বা শিল্প দপ্তরের প্রশাসনে কাজ করেছে, এবং অর্থদপ্তরের আধিকারিকদের সমালোচনায় রত থেকেছে, সেই যখন অর্থদপ্তরে আসে, তখন তার হাতের মুঠো দিয়ে আর কিছু বেরোতে চায় না, তার আঙুল আর নড়েনা। অর্থদপ্তরের আধিকারিকরাও মনে করে যে, তারাই সবচেয়ে বড় বোদ্ধা, তারাই শুধু জানে কিভাবে টাকার ব্যবহার হয়। আমলাতন্ত্রে ক্ষমতার সমান্তরাল বিন্যাস যত খারাপ, উঁচু থেকে নিচু বা লম্বাভাবে বিন্যাসও ততখানি; অনেক লোক তখন প্রত্যেকটি ফাইল দেখার সুযোগ পায়। আর যদি সংশ্লিষ্ট আধিকারিক বা কেরানি অনুপস্থিত থাকে, ছুটিতে বা ট্যুরে গিয়ে থাকে, তাহ'লে অসহায় অবস্থা অফিসের। নির্বাহী আধিকারিকেরা তখন সেই মুহূর্তে যা জরুরী তাই নিয়েই ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সরিয়ে রাখা হয় ভবিষ্যতের জন্য। সেগুলি হয়তো চাপা পড়ে যায় অনেক সময়। তখন মন্ত্রী ও তাঁর দপ্তরের মধ্যে অভিযোগ পালটা অভিযোগ শুরু হয়; রাজনীতিক ও প্রশাসকদের মধ্যে এমনই একটা ভাববার প্রবণতা থাকে যে, দোষটা হ'চ্ছে অন্যের।

এমন অনেক দায়িত্ব নেওয়া হয়, যার সঠিক জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা প্রশাসনের থাকেনা। সরকারী কর্মীরা তাদের স্বল্পজ্ঞান নিয়ে কাজ চালায়, অথবা বেসরকারী কিংবা পেশাদারী সংস্থার হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়।

আমলাতান্ত্রিক বৈষম্যকে ছেঁটে ফেলে এবং কাজের চাপকে সেই পরিমাপে কমিয়ে এনে যা' অন্য কোন সংস্থা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারেনা, আমাদের দেখতে হ'বে যে, যা অপ্রয়োজনীয় সেগুলিকে বাদ দেওয়া যায় কিনা। যেগুলি

নিচের স্তরে করা যায়, সে কাজগুলি ওপরের স্তরে না যাওয়াই ভালো। প্রত্যেক দপ্তরকে ভেবে দেখতে হ'বে, যে, কি পদ্ধতিতে কাজ করলে দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌছনো যায়। যেমন, বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে গড়া কমিটি থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কৌশল। 1975 সালে নারীর অবস্থান সম্পর্কে একটি নিযুক্ত কমিটির প্রতিবেদন ও সুপারিশগুলি খুঁটিয়ে দেখেছিল একটি 'Empowered Committee'। এই বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটিতে শ্রম, আইন, কৃষি, শিল্প, সমাজকল্যাণ, এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের প্রতিনিধিরা ছিলেন। তারা অধিবেশনগুলিতে উপস্থিত হ'য়েছেন সুপারিশগুলি সম্পর্কে তাদের শেষ কথা বলতে। এরপর আর কোন চিঠিপত্র দরকার হয়নি। সন্দেহ স্তরে বিভাগীয় আধিকারিক প্রশ্নটি আর একবার ভেবে নিয়ে পরের অধিবেশনে তার কথা বলবার জন্য আসেন।

অসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন দরকার। রাজ্য সরকারের নিচের স্তরে প্রশাসনকে যোগ্যতাসম্পন্ন, সহানুভূতিশীল ও নাগরিক দৃষ্টিকোণ থেকে দায়িত্বশীল করতে হ'বে। এই বিষয়গুলির গুরুত্ব বিবেচনা করে, বিষয়গুলি নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে পরের অধ্যায়গুলিতে আলোচনা করা হ'ল।

পুলিশ/আরক্ষা বিভাগ

দেশকে উন্নতির পথে নিয়ে যেতে হ'লে প্রথমেই দরকার শান্তির পরিবেশ। সেনাবাহিনী ও আরক্ষা বিভাগ যৌথভাবে দেশে শান্তির পরিবেশ রক্ষা করে। সেনাবাহিনী দেশকে রক্ষা করে বাইরের আক্রমণ থেকে; দেশের অভ্যন্তরীণ গোলমাল থামানোর ভার থাকে পুলিশের হাতে। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও সাধারণ মানুষের সাংবিধানিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব পুলিশের। একাজ করতে না পারলে দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব হয়না। যে সব দেশের মধ্যে অন্তর্ঘাত ও বিশৃঙ্খলার বিস্তার ঘটেছে, সে সকল দেশের সমাজজীবনে কোন সময়েই শান্তি ও সদ্‌ভাবনার পরিমণ্ডল গড়ে ওঠেনা। সেই সব দেশের অবস্থা এ'কথাই প্রমাণ করে যে, সামাজিক সুস্থিতির জন্য প্রয়োজন শান্তির পরিবেশ ও শান্তিরক্ষার সুদৃঢ় ব্যবস্থা। এ' কাজের ভার থাকে আরক্ষা বিভাগের হাতে। তাই সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থায় আরক্ষা বিভাগের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। জনজীবনে মাঝে মাঝে বিশৃঙ্খলা এতই প্রবল হ'য়ে ওঠে যে, শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সেনাবাহিনীর সাহায্য নিতে হয়। তাই পৌর-কর্তৃপক্ষের কাছে সেনাবাহিনীকে শেষ আশ্রয় হিসাবে রাখা হয়।

পুলিশ/আরক্ষা বাহিনীর দায়িত্ব

সাধারণ মানুষের রক্ষাব্যবস্থা পুলিশের হাতে থাকে। তাই আরক্ষা বিভাগ কখনও

সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিচ্যুত হ'য়ে থাকতে পারেনা।

> আইনগ্রাহ্য অধিকার ও মানুষের ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্য পুলিশই হ'ল প্রাথমিক নির্ভর। দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অপরাধ ও নির্যাতন রোধে পুলিশের যেমন রক্ষণমূলক ভূমিকা, সকলস্থানে ও সকল সময়েই তেমনি আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষায় তার সীমাহীন দায়িত্ব। ঘরে বা বাইরে সর্বত্রই আরক্ষাবাহিনীর লোক নাগরিক জীবনের সুরক্ষার ভার নিয়ে থাকে। প্রত্যেক পুলিশের মধ্যেই রয়েছে এক বাস্তব চরিত্র যাকে বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায়। তার পক্ষপাতশূন্য ব্যবহার, কর্মদক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার ওপরে নির্ভর করে আইন সাধারণ মানুষের কাছে কি মর্যাদা পায় তারই পরিমাপ।[1] (মেলভিল লী)

অপরাধমূলক ঘটনা যাতে না ঘটে, এবং আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের কোন সুযোগ যাতে না থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব আরক্ষা বিভাগের। অপরাধমূলক কাজ বন্ধ করার জন্য কখনও কখনও তাদের বিপজ্জনক ও দুঃসাহসিক কৌশল অবলম্বন করতে হয়। এর জন্য গোপন ও সমাজবিরোধী ঘটনার সংবাদ সংগ্রহ করতে তাদের গোয়েন্দা বিভাগ গড়তে হ'য়েছে এই প্রক্রিয়ায় আরক্ষাবিভাগের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকেরা সমাজ ও আইনবিরোধী কাজকর্ম সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারে, যার ফলে দুষ্কৃতীদের যেসব চেনা যায়, দুষ্কৃতিমূলক কাজ নিবারণ করাও তেমনি সম্ভব হয়।

আরক্ষাবিভাগের তৎপর বুদ্ধি ও সংবাদ সংগ্রহের কৌশলে দুরভিসন্ধিমূলক কাজ থেকে অনেক নেতা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে বাঁচানো সম্ভব হ'য়েছে। কিন্তু যদি গোয়েন্দাবিভাগের (Inteligence branch) কাজের অবনতি ঘটে অথবা ইনফর্মার বা সংবাদ সংগ্রাহকের চিন্তা একপেশে হয়, তা হ'লে আঙুলের ফাঁক দিয়ে যেমন জল গলে যায়, অপরাধের সংবাদ তেমনি অগোচরে থেকে যায়। পুলিশকে তাই জানতে হয়, অপরাধ কি ভাবে সংগঠিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে অপরাধ জগতের সবরকম খবরাখবর তাকে রাখতে হয়। পুলিশ অফিসারের জীবন সর্বদা বিপদে পূর্ণ; একথা আরও সত্য সেই সব দেশে যেখানে অস্ত্র রাখা বা বহন করার জন্য লাইসেন্স নিতে হয় না। পুলিশের কাজে তীক্ষ্ণ অনুভব শক্তি থাকা দরকার । অন্য কাজের তুলনায় পুলিশকে বেশি মাত্রায় সচেতন থাকতে হয় বিপদের সংকেত বুঝে নেওয়ার জন্য।

দ্বিতীয় কথা, অপরাধমূলক ঘটনাগুলিকে খুঁজে বার করতে হয়। অপরাধকে নির্দিষ্ট করে দেখাতে হয়। আইনের পরিধিতে তাদের আনতে হয়। পুলিশের কাজ এতবেশি প্রত্যক্ষ, এবং সাধারণ মানুষ, রাজনীতিক ও তাদের নিজেদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে এত বেশি সমালোচিত হয়, যে, তারা যে তাদের কাজের ফল দেখাতে এবং সাফল্যের পরিচয় দিতে ব্যস্ত হবে তা স্বাভাবিক ভাবেই বোঝা যায়। এরজন্য পুলিশের হেফাজতে থাকা মানুষকে কখনো কখনো অপ্রীতিকর ও নির্দয় ঘটনার মুখোমুখি হ'তে হয়; এমন কি জেরার সময় অত্যাচারে তার মৃত্যুও ঘটে থাকে। পুলিশের কয়েদ থেকে বন্দী নিখোঁজ হ'য়ে যাওয়ার কথাও শোনা যায়। এমন

একটি ঘটনা 1975-77 সালে জরুরী অবস্থার সময়ে ঘটেছিল। সেই ঘটনার ফলে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হ'য়েছিল। পুলিশ বর্বরতার একটি সাম্প্রতিক ঘটনা—ভাগলপুরে জেলের মধ্যে বন্দীদের অন্ধ করে দেওয়া। থানায় আটক হ'য়ে থাকা নারীর অবস্থা আরও বিপজ্জনক। এই অবস্থার নিরসনে প্রয়োজন বেশি সংখ্যায় নারীপুলিশ ও নারী পুলিশ পরিচালিত থানার। বিপন্ন নারীরা পুলিশের আশ্রয়ে যেতে সাহস পায়না বলেই এই ব্যবস্থা চালু হওয়া উচিত।

এর পরের কাজ, পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে দোষী ব্যক্তিদের আইনের প্রযোজ্য ধারায় অভিযুক্ত করে বিচারের জন্য আদালতে পাঠানো যায়। এ'কাজে তাকে সরকারী উকিলের সহায়তা পেতে হ'বে। অনেক ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে ফেলার তাড়ায় কাজের উৎকর্ষ থাকে না, বরং ভুল ঘটে যায়। দেখা যায়, নিরপরাধ ব্যক্তি শাস্তি পেয়েছে, অথচ খুনী যে, সে ছাড়া পেয়েছে।

শিক্ষা ব্যবস্থা

উপরোক্ত কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য পুলিশকে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। পুলিশের চাকরিতে যারা আসে, তাদের কঠিন শারীরিক ব্যায়ামের শিক্ষা নিতে হয়। তার কাজের উপযোগী জ্ঞান যেমন থাকা দরকার, তেমনি চাই দক্ষতা ও কৌশল। উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা হয় হায়দরাবাদে ন্যাশনাল পুলিশ একাডেমিতে। একাডেমির অধ্যক্ষ ডাইরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ-এর সমমর্যাদাসম্পন্ন একজন আধিকারিক। নিচের স্তরের কর্মচারীদের জন্যও বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। কিন্তু আরক্ষাবিভাগের কর্মীসংখ্যার বিপুলতার তুলনায় বর্তমান শিক্ষাকেন্দ্রগুলি যথেষ্ট নয়।

আরক্ষাবিভাগ রাজ্যের অন্তর্গত; সংবিধানের সপ্তম তালিকায় (List-State) সেই ভাবেই দেখানো হ'য়েছে।

আইন ও শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্ব : রাজ্য ও কেন্দ্রের ভূমিকা

কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে কোন আরক্ষাবাহিনী নেই। তার হাতে রয়েছে আধাসামরিক বাহিনী যেমন, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (C.R.P.F.), সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স সিকিউরিটি ফোর্স (C.I.S.F.), বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (B.S.F.) প্রভৃতি। এগুলি সংবিধানের 355 নম্বর ধারা অনুযায়ী সংসদে বিধিবদ্ধ।

কেন্দ্রের অধীন সশস্ত্র বাহিনী এগুলি। এদের কাজ শুধু রাজ্যস্তরে; উদ্দেশ্য শৃঙ্খলা রক্ষা ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে রাজ্যকে সহায়তা দেওয়া। পুলিশ বিভাগের মতো নির্দিষ্ট কোন কাজের দায়িত্ব এদের নেই। ইন্ডিয়ান পুলিশ অ্যাক্ট (1861) এ'দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। প্রত্যেক রাজ্যেই একটি পুলিশবাহিনী থাকে, যার

তত্ত্বাবধান করেন পুলিশ (বা স্বরাষ্ট্র) মন্ত্রী। অধীক্ষক ও তার উর্ধ্বতন স্তরের আধিকারিকদের ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস (I.P.S.)-এর সদস্য হ'তে হয়। অন্যান্য পদে যারা থাকে, তাদের নিযুক্ত করে রাজ্যের পাবলিক সার্ভিস কমিশন। বড় বড় শহরের দায়িত্বে থাকেন একজন মহাধ্যক্ষ (পুলিশ কমিশনার), জেলাগুলিতে আরক্ষা অধীক্ষক (Superintendent of Police)। তাঁর কাজ পরিদর্শন করেন জেলাশাসক। অবশ্য এই ব্যবস্থা ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসের আধিকারিকদের কাছে অপ্রীতিকর। এই অস্বস্তি আরও এই জন্যে যে, প্রশাসন সংস্কার কমিটির (Administrative Reforms Committee-1966) সুপারিশ স্থিতাবস্থা রক্ষা করে চলা এবং সেই অনুযায়ীই এই ব্যবস্থা। কতকগুলি জেলা নিয়ে একটি মণ্ডলী যার দায়িত্বে থাকেন একজন ডেপুটি ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল। প্রত্যেক জেলাতেই কতকগুলি থানা (পুলিশ স্টেশন); বড়গুলির দায়িত্ব নেন একজন পুলিশ-ইন্‌স্‌পেক্টর, ছোটগুলির সাব-ইন্‌স্‌পেক্টর। তাদের অধীনে থাকে হেড-কন্‌স্টেব্‌ল্ ও কন্‌স্টেব্‌ল্ কয়েকজন। গুরুতর ও সংকটজনক অবস্থা সামলাতে রাজ্য আর্মড্ পুলিশ ব্যাটেলিয়ন ও জেলা আর্মড্ রিজার্ভ পুলিশ রাখা হয়।

পুলিশি কাজকর্মের বাস্তব দিক

স্বাধীন ভারতবর্ষে আরক্ষাবিভাগের কাজের চাপ ও জটিলতা অনেক বেড়ে গিয়েছে। শহরাঞ্চলের প্রসারের সঙ্গে বেড়েছে অপরাধের ঘটনা। বেড়েছে শ্রমিক বিক্ষোভ, ভূমিসংক্রান্ত বিবাদ ও ছাত্র-আন্দোলন; অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিধিনিয়মের সুষ্ঠু প্রয়োগ, নানাদিকে উত্তেজনা ও অশান্তি এবং একই সঙ্গে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জগতের বিপর্যয় ও পরিবর্তন। সাম্প্রতিক কালে দেশের কোন কোন অংশে সন্ত্রাসমূলক কাজ ও হিংসাত্মক ঘটনার প্রকোপ বেড়ে চলেছে, তার ফলে বেআইনি অস্ত্র ও বিস্ফোরক পদার্থের ছড়াছড়ি চারিদিকে। এই ধরনের ক্রিয়াকলাপের মুখোমুখি হওয়া এবং ভি.আই.পি.-দের (অর্থাৎ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের) জীবন রক্ষার দায়িত্ব নেওয়াও এখন আরক্ষাবাহিনীর কাজ। বহুমতের সমষ্টিতে গড়ে উঠেছে আমাদের সমাজ। আর্থসামাজিক ন্যায় বিচারের প্রতিষ্ঠায় আইন ও শৃঙ্খলার অবস্থারও পরিবর্তন। ব্রিটিশ শাসনে প্রশাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন লক্ষ করতে গিয়ে আমরা দেখেছি সাম্রাজ্য রক্ষা করতে তারা কিভাবে পুলিশকে ব্যবহার করেছে। স্বাধীনতার যুদ্ধে সংগ্রামীদের দমন করতে লোহার রোলার চালানো হ'য়েছে। তখন আরক্ষা বিভাগের ওপর তলার আধিকারিকেরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ছিল ব্রিটিশ, আর নিচের কর্মীদের নেওয়া হ'ত দেশীয় মানুষদের মধ্যে থেকে। তার শিক্ষায় যেমন অগ্রসর ছিলনা, তেমনি কর্মদক্ষও ছিলনা; তাদের বেতনও অল্প ছিল। তাদের অবস্থা ছিল করুণ ও দুঃখজনক অন্তত কাগজপত্র থেকে যেমন

জানা যায়। ঔপনিবেশিকতার পরিবর্তনের পরে অনেক দুঃখভোগের সঙ্গে তাদের ওপর রয়েছে 1861 সালের ইন্ডিয়ান পুলিশ অ্যাক্ট। এখনও তা কার্যকরী। 1966 সালের প্রশাসন সংস্কার কমিশনের অভিমত, 1861 সালের পর পুলিশের ভূমিকার কোন পরিবর্তন হয়নি। 1977 সালে ভারত সরকারের দ্বারা স্থাপিত ন্যাশনাল পুলিশ কমিশন একই কথা বলেছে যে, 1861 সালের পর পুলিশের চরিত্রের কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি, প্রশাসন ও সাধারণ মানুষ উভয়ক্ষেত্রেই এ'কথা সত্য । এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এদিকে অবিলম্বে সরকারের দৃষ্টি পড়া উচিত। ইতিহাসের পটভূমিতে পুলিশের ভাবমূর্তি ও আত্মমর্যাদার প্রশ্ন বড় হ'য়ে দেখা দিয়েছে। আমাদের গণতান্ত্রিক কাঠামোতে পুলিশের দৃষ্টিভঙ্গিও মানবমুখী হওয়া দরকার। কিন্তু সাধারণের চোখে পুলিশ নির্দয়, দুর্নীতিগ্রস্ত ও যোগ্যতাহীন। কাজের পরিমাণ যেমন বাড়ছে সেই মতো পুলিশের শুধু সংখ্যা বাড়ালেই হবেনা, পুলিশের কর্মধারায় ও শিক্ষায় যা অবশ্য প্রয়োজনীয় সেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির প্রবর্তন ও প্রযুক্তিবিদ্যার অনুশীলনও পুলিশের ভাবমূর্তিকে তুলে ধরার জন্য যথেষ্ট নয়। ন্যাশনাল পুলিশ কমিশন তার প্রথম প্রতিবেদনে (1979) বলেছে ঃ

> বর্তমানে পুলিশি ব্যবস্থার প্রাথমিক ও মৌলিক সমস্যা হ'ল, যে, কিভাবে পুলিশকে আজ দক্ষ ও আইনি ব্যবস্থার নিরপেক্ষ প্রবর্তকরূপে দাঁড় করানো যায়, যাতে পুলিশ হ'বে পুরোপুরি উদ্দেশ্যমুখী, সাধারণের সেবার লক্ষ্যে পরিচালিত, এবং মানুষের সংবিধানিক অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার আদর্শে উদ্দীপ্ত।[3]

সাধারণ সকল মানুষের জন্যই নিরাপত্তার বোধ সৃষ্টি করতে হ'বে। জনসাধারণের প্রতি হ'তে হ'বে সংবেদনশীল; তাদের প্রয়োজন ও অসন্তোষের কারণ অনুভব করতে হ'বে। ন্যাশনাল পুলিশ কমিশনের প্রথম প্রতিবেদনে (1979) বলা হ'য়েছে—

> ''অপরাধমূলক কাজের ঘটনা প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যাওয়া ছাড়াও দ্রুত বর্ধমান সমাজব্যবস্থার প্রয়োজনে পুলিশের কর্মদক্ষতার বৈশিষ্ট্যেও বিশেষ পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। সংবিধানে সামাজিক পরিবর্তনের যে রূপ দেখানো হ'য়েছে, তাকে রূপায়িত করার চেষ্টায় সংসদে প্রতিবছরেই নতুন আইনকানুন ও রীতিনীতির সৃষ্টি হ'য়ে চলেছে। জাতীয় অর্থনীতি ও আর্থিক উন্নতির ধারাকে অব্যাহত রাখতে নানারকম আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হ'য়েছে অপরাধীদের বিরুদ্ধে যারা রাজস্ব নীতিকে ফাঁকি দিতে ব্যস্ত। শহরাঞ্চলের দ্রুত প্রসার এবং শহরে পরিবহণযোগ্য যানবাহনের দ্রুত বৃদ্ধিতে ট্রাফিক সংক্রান্ত বিধিনিষেধ লঙ্ঘনের ঘটনাও ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। পূর্বে যারা আইন মেনে চলত, তারাই এখন আইন লঙ্ঘন করছে। পুলিশ জড়িয়ে পড়ছে যেমন সামাজিক ও অর্থনীতি সংক্রান্ত অপরাধের ঘটনায়, তেমনি ট্রাফিক্ ল বা যানবাহন চলাচল সংক্রান্ত বিধিনিষেধ লঙ্ঘনের ব্যাপারেও। অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিভিন্ন চরিত্রের অপরাধীদের সঙ্গে এখন তাদের কাজ। তারা আগের মতো শুধু সাধারণ বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে বা গ্রাম্য গুণ্ডামী সম্পর্কিত অপরাধে' দোষী নয়, তাদের

থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক ভিন্নচরিত্রের অপরাধী। যে পুলিশবাহিনী পূর্বের সাধারণ অপরাধীদের সঙ্গে ব্যবহারে অভ্যস্ত, এখন এই নতুন ধরনের অপরাধের মোকাবিলায় তাদের কাজের রীতি ও কৌশলের পরিবর্তন ঘটাতে হ'বে। নতুন পরিস্থিতিতে প্রত্যেক ব্যাপারে তাকে ধীরভাবে বুদ্ধি প্রয়োগ করে চলতে হ'বে। সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হ'বে যে, আইনের ধারাগুলি যেন রক্ষিত হয়। পুলিশের তরফে কনস্টেবলদেরই মুখোমুখি হ'তে হয় আইন ভঙ্গকারী এই বিপুল সংখ্যক অপরাধীর সঙ্গে। সেদিক থেকে দেখলে বোঝা যায় যে, কনস্টেবলদের কাজের ধরন কতখানি বদলাতে হ'য়েছে।"[3]

সাম্প্রতিককালে আরক্ষাবাহিনীর করণীয় কার্যভার ও তার প্রকৃতি

সাম্প্রতিক কালে পুলিশের হাতে যে সব কাজের ভার এসে পড়েছে তার ধরনগুলি আবার ভেবে দেখতে পারি। যে সব ব্যক্তি V.I.P. বলে চিহ্নিত, যাদের জীবন মূল্যবান মনে করা হয়, এবং যাদের জীবনের ওপর আক্রমণ হ'তে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়, তাদের সংখ্যা এখন প্রচুর। তাদের নিরাপত্তা রক্ষার ভার পুলিশের হাতে। বিতর্কিত ভূখণ্ডের ওপর দৃষ্টি রাখা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে বিক্ষোভ আন্দোলন দেখা দিলে সেখানে উপস্থিত হওয়া, ট্রাফিক ব্যবস্থা, হসপিটাল বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে গোলমাল দেখা দিলে তা থামানোর ব্যাপারে সক্রিয় হওয়া এবং সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক সংঘর্ষে গোলমাল মেটানো এখন পুলিশের কাজ। পুলিশই এখন আইন ও শৃঙ্খলার রক্ষাকর্তা। যে প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্মীদের কাজ বাধ্যতমূলক, এবং যে সব সংস্থা স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত কর্মীদের দ্বারা গঠিত সর্বত্রই পুলিশকে দাঁড়াতে হয় প্রয়োজন হ'লে। ডিরেক্টর জেনারেল অথবা ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অব পুলিশের মতো উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের জন্য তাঁদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হয় এবং তার জন্য হস্তশিল্প বিষয়ক সরকারী উদ্যোগ এবং অন্যান্য সরকারী সংস্থায় গিয়ে দাঁড়াতে হয়, যদিও সাধারণ ভাবে সেগুলি প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত হ'লেও পুলিশের অধিকার ক্ষেত্রে পড়েনা। মানুষ যতই সজাগ হ'য়ে উঠছে ততই তার দৃষ্টি গোচরে আসছে নানা ধরনের অপরাধ,—নারীর বিরুদ্ধে অপরাধ, নিচুবর্ণের জাতির প্রতি উপজাতি-সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি অপরাধ। রাজনৈতিক উত্তেজনা যেমন জাঠা, মিছিল, সত্যাগ্রহ ও ডাকাতির স্থানে পুলিশের উপস্থিতি দরকার। কয়েকটি নতুন ধরনের অপরাধ, যেমন, চোরাচালান (Smuggling) মাদকদ্রব্য পাচার, প্রভৃতি এখন ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। প্রত্যেকটি ধর্মের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ধর্মের অনুষ্ঠান ও উৎসব। মুসলমান ও হিন্দুদের উৎসবগুলি প্রায় একই সঙ্গে পড়ে। তখনও পুলিশকে সতর্ক থাকতে হয় সাম্প্রদায়িক গণ্ডগোল থামাতে। এই সব অতিরিক্ত ও নূতন সৃষ্টি হওয়া কাজে পুলিশের কর্মদক্ষতার হানি ঘটে। ন্যাশনাল পুলিশ কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হ'য়েছে—

1962 সালে বিভিন্ন আদালতে নিষ্পত্তির জন্য যেখানে 1,90,000 মামলা আটকে ছিল, 1975 সালে সেখানে জমে থাকা মামলার সংখ্যা হ'ল 19,70,000 (19,7 lakhs)। তদন্ত সাপেক্ষ অপরাধের উল্লেখযোগ্য ও দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে যোগ করা যেতে পারে আদালতে জমে থাকা মামলাগুলি, যেগুলির তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের অনেক বেশি সময় দিতে হয়। ফলে অনুসন্ধান ও তদন্তের জন্য অনেক বেশি পাহারাওয়ালা নিয়োগের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে; 1902 সালে নিযুক্ত কমিশনে যা কল্পনাতেও আনতে পারেনি।[4]

আইনের নিয়ম হ'ল, পুলিশ কর্মচারীদের কাজ করতে হ'বে আইনের কাঠামোর মধ্যেই এবং উদ্দেশ্যমুখী হ'য়ে। তবু প্রায়ই তাদের লক্ষ্য বিক্ষিপ্ত হ'য়ে যায় রাজনৈতিক নেতাদের হস্তক্ষেপে। তাদের কাজের প্রকৃতি এমনই যে, সবসময়ে তারা সাধারণ মানুষের কাছে প্রীতির পাত্র হ'তে পারেনা। কিন্তু আচরণ ভদ্র ও সৎ হ'লে মানুষের শ্রদ্ধার দৃষ্টি তার দিকে পড়বেই। নিচের স্তরের পুলিশ কর্মচারী উপরি টাকা নেওয়া যাদের জীবনের ধারা, তাদের মনোভাব কেমন, তা একটু বলি—

পুরানো দিনগুলিতে বঙ্গদেশের ধর্মভীরু বৃদ্ধারা তরুণ ছেলেদের আশীর্বাদ করতেন 'দারোগা হও' বলে, যার অর্থ একটি থানার মুখ্য আধিকারিক পদের জন্য সদিচ্ছা প্রকাশ। এ'কথার ইঙ্গিত দারোগা পদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির দিকে তাকিয়ে নয়, দারোগার উপরিপাওনা অর্থাৎ অতিরিক্ত লাভের দিকে লক্ষ্য রেখে জনজীবনে দুর্নীতি গভীরভাবে প্রবেশ করেছে। এই উপরি পাওনার প্রতি এখন মানুষের ঘৃণার কোন প্রকাশ নেই। এই জিনিসকে জীবনের অঙ্গ হিসাবেই ধরা হয়।[5]

অতিরিক্ত

শুধু আরক্ষাবিভাগে নয়, প্রশাসনের অন্যান্য বিভাগেও এই ঘুষ দেওয়া-নেওয়ার মতো নৈতিক অপচার জড়িয়ে রয়েছে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি ক্ষমতার প্রয়োগ বা অপপ্রয়োগের সুযোগের সঙ্গে। আইনের ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে পারার ক্ষমতা হাতে থাকায় সেই প্রাচীন কাল থেকেই আরক্ষা বিভাগ ক্ষমতার অপব্যবহারের রীতি ও দুর্নীতিকে বহন করে এনেছে। পুলিশ কমিশনের (1902-03) চোখে পুলিশ বিভাগের এই ব্যাপক দুর্নীতির চিত্র ধরা পড়েছে। নৈতিক চরিত্রের অপচার সারাদেশেই থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকদের মধ্যে প্রকট হ'য়ে উঠেছে। সৎ ও সদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত আধিকারিকদের দিয়ে যদি পুলিশ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে হঠাৎ পরিদর্শন ও কার্যকরী তদারকির ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে এই দুর্নীতিমূলক অভ্যাসগুলির অনেকখানি কমিয়ে আনা যায়। পুলিশের কার্যক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হ'লে কড়া আইন ও নীতি প্রয়োগের চেয়ে তদারকি ব্যবস্থার উৎকর্ষসাধন অনেক বেশি কার্যকর হ'তে পারে।

আমরা যে নীতির ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে চাই, তাহ'ল এই যে, আরক্ষাবিভাগে সততা রক্ষা ও দুর্নীতিমূলক অভ্যাস নির্মূল করার দায়িত্বভার পরিদর্শক স্তরেই থাকা উচিত। আর তাদের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া উচিত যাতে দায়িত্ব পালনে তারা সমর্থ হয়। এই কাজে অসৎ ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা যেন কোনভাবেই নষ্ট না হয়। সেই সঙ্গে সৎ ও যোগ্য কর্মচারীদের গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল পদে বসানোর ব্যাপারে যেন কোন বাধাসৃষ্টি করা না হয়।

প্রতিকারের জন্য উপযুক্ত কর্মপন্থা

পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত সমস্যাগুলির সৃষ্টি যে ক্ষেত্রগুলিতে, সেগুলি এবং প্রতিকারের জন্য উপযুক্ত কর্মপন্থার সুপারিশ এখানে দেওয়া হ'ল।

ক) গুণগত উৎকর্ষ, সংগ্রহব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ ও বেতনের হার, যা নিচুস্তরের কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য, তা' এখন অতীতের ব্যাপার। কাজের প্রকৃতিতে যে বিরাট পরিবর্তন এসেছে তাদের সামনে, সন্ত্রাস সৃষ্টি, নাশকতা, বিদ্রোহ, অপহরণ, ধর্ষণ, ও নানাধরনের অর্থনৈতিক অপরাধের সঙ্গে মোকাবিলার যে বিরাট চ্যালেঞ্জ এসেছে তাদের কাছে সে কথা ভেবে তাদের গুণগত উৎকর্ষের ব্যাপারে নতুন করে ভাবতে হ'বে।

খ) তাদের ভূমিকা, কর্তব্যকাজ, ক্ষমতা ও দায়িত্ব 1861 সালে যা ছিল তারপর কি দাঁড়িয়েছে, তার নতুন করে ব্যাখ্যা দিতে হ'বে।

গ) সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সহজ ও স্বেচ্ছাপ্রসূত সহযোগিতার অভাব থাকায় নিয়মপ্রণালীকে নতুন করে সাজাবার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সেই সহযোগিতা পাওয়া যায়; সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে তাদের আনতে হ'বে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে বন্ধুত্বপূর্ণ করতে।

ঘ) প্রত্যেকটি ব্যক্তির উন্নয়ন ব্যবস্থা ও তাদের কর্মজীবনের ভবিষ্যৎ বিষয়ে পরিকল্পনার কাজ অবহেলার গভীরে পড়ে আছে। আরক্ষাবিভাগের কর্মীদের জন্য কর্মী উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি হওয়া দরকার।

ঙ) দেশের বেশির ভাগ রাজ্যেই পদোন্নতি, পদ নির্দিষ্ট করা, অন্যত্র বদলি করা ইত্যাদিতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ঘটছে। এগুলিকে একেবারে বন্ধ করতে পারলেই ভাল। অন্তত এ'ধরনের হস্তক্ষেপ কমানোর প্রয়োজন তো আছেই। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, পোষকতা বা ঔদাসীন্য পুলিশ কর্মীদের নীতিবোধ, দায়িত্বজ্ঞান ও কৃষ্টিবোধ নষ্ট করে দিচ্ছে।

চ) স্বাধীনতা যখন পেয়েছি তখনকার তুলনায় আইনের সংখ্যা এখন অনেক বেশি, আর এই আইনগুলির সঠিক প্রয়োগের প্রয়োজন আছে। কিন্তু এ কাজে সাধারণ মানুষের সহযোগিতা ও সাহায্য দরকার। বধূহত্যা, পণপ্রথা, ধর্ষণ, নিচুবর্ণের জাতের ওপর অত্যাচার, এ ধরনের অপরাধমূলক ঘটনায় পুলিশকে সতর্ক হ'য়ে কাজ করতে হ'বে। পুলিশবাহিনীর সকল স্তরেই শিক্ষণ ব্যবস্থায় সামাজিক পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল মনোভাব প্রকাশের নীতি রাখতেই হ'বে।

ছ) শাস্তি ও পুরস্কার দেওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে হ'বে।

আনন্দস্বরূপ গুপ্ত তাঁর একটি নিবন্ধে (পুলিশি ব্যবস্থার সংস্কার প্রসঙ্গে)

বলেছেন, "যদি সত্যকার পরিবর্তন আনা আমাদের কাম্য হয়, তাহলে আরক্ষা বিভাগে সম্পূর্ণ ও যুক্তিযুক্ত পরিবর্তন ঘটানোর দরকার আছে। বিশেষত বিভাগের কাঠামো ও সংগঠন, ও তাদের অবস্থান ও বেতনক্রম নিয়ে একটি বাস্তবমুখী পরিমাপ।"[7] ডেসবরো কমিটির (Desborough Committee of England 1919) প্রতিবেদন প্রায় সকল দেশে এবং সকল সময়ে প্রযোজ্য (যদিও আমাদের দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্বতন্ত্র। ঐ প্রতিবেদনে বলা হ'য়েছে ঃ

"পুলিশ পদপ্রার্থী ব্যক্তিকে শুধুমাত্র দৈহিক স্বাস্থ্যের একটি নির্দিষ্ট মানে পৌছলেই চলবেনা, তার শরীর ও মনের গঠন সবদিক দিয়েও সবল হওয়া দরকার। পুলিশের করণীয় কাজগুলি নানাধরনের তার মধ্যে কিছু অসঙ্গত দাবিও থাকে; সেই কাজগুলি ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে, বৈচিত্র্যে ও জটিলতায় হয়তো আরও বাড়বে। কোন ব্যক্তিই পুলিশ হিসাবে সাফল্য পেতে পারেনা, যদি তার সাধারণ জ্ঞান, স্মৃতি ও পর্যবেক্ষণ শক্তি সাধারণের চেয়ে বেশি না হয়। তার চরিত্র কলঙ্কশূন্য হবে। তাকে হতে হবে মানবিক ও ভদ্র। সাধারণ ভাবে সে হবে নৈতিক, মানসিক ও দৈহিক শক্তির সমন্বয়ে গঠিত যা অন্য কর্মীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাছাড়া যখন সে একজন কনস্টেবল হয়ে উঠেছে তাকে ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে যা' অন্যের স্বাধীনতার ওপর হাত বাড়াতে পারে। তাই তাকে সকল সময়েই তৈরি থাকতে হ'বে তার নিজের দায়িত্ববোধে ও প্রেরণায় কৌশলী হ'য়ে কাজে নামতে। ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ ও বিচক্ষণতার যে বোঝা একজন কনস্টেবলের কথার ওপর থাকে, তা' অন্য যে কোন সরকারী সমশ্রেণীভুক্ত কর্মীর চেয়ে বেশি।

সমাজের সঙ্গে একটি বিশেষ সম্পর্কে যুক্ত হ'য়ে থাকতে হয় একজন পুলিশ কর্মচারীকে। নিযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেক কনস্টেবল সমগ্র নাগরিক সমাজের পক্ষে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার ও দায়িত্ব হাতে পায়। সকল প্রকার অপরাধের সন্ধান ও নিবারণের প্রধান শক্তিই হ'ল সে। সাধারণ ভাবে তার অবস্থান হ'ল বিশ্বস্ততার সূত্রে জড়িত, সেই বিশ্বস্ততাকে সে বাঁচিয়ে রাখবে, এটাই তার কাছে কাম্য। আমরা মনে করি যে, সাধারণ মানুষের কাছে তাদের কর্তব্যবোধ থাকা অত্যন্ত জরুরী ব্যাপার। এই ব্যাপারগুলি যে আমরা বিবেচনার জন্য উল্লেখ করছি তার কারণ, পুলিশের পদমর্যাদা ও বেতনের হার সম্পর্কে আমরা যে ধারণা পোষণ করছি, তা বোঝার পক্ষে এগুলি অপরিহার্য।

... নানা দিক দিয়ে একজন কনস্টেবল তার চাকুরিসূত্রে সামাজিক দুর্বলতা, ও অক্ষমতার অংশীদার। তাছাড়া সবসময়েই, সে কর্মরত থাকুক বা না থাকুক, তাকে ব্যক্তিগত ভাবে তার পদের উপযুক্ত মর্যাদা রক্ষা করে চলতে হ'বে। এরজন্য তার ওপর বাধা নিষেধের চাপ এসে পড়ে, যা অন্য চাকুরির ক্ষেত্রে থাকে না। জরুরী অবস্থায় তাকে যে কোন সময়েই কাজে ডাকা হতে পারে; যাতে প্রয়োজনের সময়ে এই অপ্রত্যাশিত ডাকেও তাকে পাওয়া যায়, তার জন্য তার বাসস্থান কোথায় হ'বে না হ'বে, সে বিষয়েও বাধানিষেধ থাকতে পারে। বিশেষ প্রলোভনে যে কনস্টেবলেরা আকৃষ্ট হতে পারে, তা স্বাভাবিক। এ'বিষয়ে তার চারিত্রিক শ্লথতার জন্য কঠোর শাস্তি হতে পারে। এই জন্যই তার বেতন এমন হওয়া উচিত যে, অল্প বেতনের জন্য উদ্বেগ ও অক্ষমতা তার প্রলোভনকে যেন উদ্দীপ্ত না করে।"[8]

ব্রিটেনে আরক্ষাবিভাগের কর্মচারীদের বেতনহার অসামরিক সরকারী চাকুরির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ। এই দিক থেকে এবং ডেসবরো কমিটির প্রতিবেদনে উল্লিখিত অন্যান্য বিষয়ের কথা ভেবে আমাদের এখনো অনেক পথ যেতে হ'বে।

বিচারকমণ্ডলী ঃ বিচারালয়

সরকারী কর্মচারীরা তাদের সাংবিধানিক অধিকারকে তুলে ধরবার জন্য প্রয়োজন হ'লে যেখানে গিয়ে দাঁড়াতে পারে, তা হ'ল বিচার বিভাগ যার নেতৃত্বে রয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। একই ভাবে সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে সাধারণ মানুষের যে মৌলিক অধিকারগুলিকে মানা হ'য়েছে, সেগুলিকে মান্য করাতে হ'লে বিচারবিভাগের দ্বারস্থ হ'তে হবে। এই বিচার বিভাগের উর্ধ্বে রয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ও রাজ্যগুলিতে হাইকোর্ট।

প্রত্যেক রাজ্যে এই হাইকোর্টগুলিকে সহায়তা দেয় অধীনস্ত আদালতগুলি।

সুপ্রিম কোর্ট

বিচার ও ন্যায় অন্যায় নির্ণয়ের স্থানেরও প্রয়োজন আছে দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর নিরাপত্তার জন্য। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে অথবা দুই বা ততোধিক রাজ্যের মধ্যে মতপার্থক্য ঘটলে মতের সে বৈষম্যকে মেটাতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের অধিকারক্ষেত্র এই সব জায়গাতেই। পারস্পরিক বিবাদ বা রাজ্য ও রাজ্যের মধ্যে কিংবা রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে মতান্তর ঘটলে তার মীমাংসা করে সুপ্রিম কোর্ট। তাই একে যুক্তরাষ্ট্রীয় সুপ্রিম কোর্টও বলা যায়। সুপ্রিম কোর্টের মৌলিক বিচার ও পুনর্বিচারের ক্ষমতা আছে। তাছাড়া নিজের দেওয়া রায়ের পুনর্বিচার করার ক্ষমতাও তার আছে। যেমন সরকারী কর্মচারীদের অধিকার রক্ষার জন্য, সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষা করতে ও কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারে।

আমাদের শাসন পদ্ধতিতে সুপ্রিম কোর্টের একটি অনুকরণীয় স্থান আছে। জনস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধানে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের উপদেশ চান। নিম্ন-আদালতের দেওয়া রায় বা বিচার-সিদ্ধান্ত পুনর্বিচারের ক্ষমতা তো আছেই, তার ওপরে সংবিধানের ব্যাখ্যা দেওয়ার ক্ষমতাও সুপ্রিম কোর্টের। সংসদীয় বিতর্কে সুপ্রিম কোর্টের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাদি কৃষ্ণস্বামীর দেওয়া ব্যাখ্যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

"ভবিষ্যতে ভারতীয় সংবিধানের বিবর্তন অনেকখানি নির্ভর করবে সুপ্রিম কোর্টের কাজের ওপরে এবং সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া নির্দেশের ওপরে। মাঝে মাঝে সংবিধানের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কোর্ট মুখোমুখি হবে সামাজিক ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে বিপরীতমুখি শক্তির সঙ্গে। যদিও তার কাজ সংবিধান সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেওয়া, সুপ্রিম কোর্ট তার কর্তব্য সম্পাদনে উপেক্ষা করতে পারেনা সমকালের সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক চিন্তার প্রবণতাকে; কারণ ঐগুলিই হ'ল সকল ঘটনার পশ্চাৎপট। আপাতদৃশ্য বিপরীতমুখি শক্তিগুলির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার কাজ সুপ্রিম কোর্টের। সংবিধানের ধারা বিশেষের ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রক্রিয়ায় কোন কোন ক্ষেত্রে ইউনিয়নকেই শক্তিশালী করে, আবার অন্য ক্ষেত্রে কোর্ট রাজ্যগুলির স্বশাসন ক্ষমতা ও আঞ্চলিক গুরুত্বকেই তুলে ধরে। একসময়ে কোর্ট ব্যক্তি স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দেয় সমাজ অথবা রাজ্যের নিয়ন্ত্রণের উর্ধ্বে। আবার

অন্যসময়ে সামাজিক ও রাজ্যের নিয়ম ও প্রথাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে; সুপ্রিমকোর্ট হ'ল এক মহাবিচারালয় যাকে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ভেদরেখা টানতে হয়।"[9]

ফৌজদারী বা দেওয়ানি মামলায় পুনর্বিচার শুনানির সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব সুপ্রিম কোর্টের। ব্রিটিশ শাসনের সময় এই ক্ষমতা ছিল প্রিভি কাউন্সিল-এর। এখন সে জায়গায় এসেছে সুপ্রিম কোর্ট।

A Single Judicial System

আমাদের একটাই সুপ্রিম কোর্ট এবং একটাই বিচার পদ্ধতি। এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে (1) অধিকার-ক্ষেত্রগত একত্ব (2) একটিই বিচারকমণ্ডলী; একটি হাইকোর্ট থেকে আর একটি হাইকোর্টে বিচারককে স্থানান্তরিত করার মধ্যে জাতীয় সংহতির প্রকাশ। প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করে রাষ্ট্রপতি বদলির আদেশ দেন। প্রত্যেক হাইকোর্টে বিচারকদের সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ ও প্রধান বিচারপতিকে রাজ্যের বাইরে থেকে নিতে হবে। বৃহত্তর আঞ্চলিক এলাকার মধ্যে থাকার নিম্ন আদালতগুলিতে পদোন্নতির সুযোগ অনেক বেশি। আইন, সংবিধান এবং দেওয়ানি ও ফৌজদারী মামলার ব্যাপারে একটি বিচার বিভাগ সমগ্র দেশের আশ্রয়স্থল হ'য়ে আছে।

শক্তিশালী ও স্বাধীন একটি বিচারবিভাগের প্রয়োজনীয়তা

আইনের নিয়মকে তুলে ধরার ও গণতান্ত্রিক নীতিগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য একটি শক্তিশালী ও স্বাধীন বিচার বিভাগের প্রয়োজন রয়েছে। সংবিধান বহির্ভূত আইনের সৃষ্টি এবং শাসন কার্য পরিচালকদের স্বেচ্ছামূলক ক্রিয়াকলাপের হাত থেকে দেশের মানুষকে বাঁচায় এই বিচারবিভাগ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে ল' কমিশনের একটি প্রতিবেদনে ইউ.কে-র প্রধানমন্ত্রী উইনস্টল চার্চিল বলেছিলেন,—

"শাসন কার্য পরিচালকদের হাত থেকে বিচারবিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতার নীতি আমাদের জীবনে অনেক কিছু চিন্তার ভিত্তি রচনা করেছে। বিচারককে শুধু একজন মানুষের সঙ্গে আরেকজনের সম্পর্কের মধ্যে ন্যায়ের নীতিকে দেখলেই হয়না, তাকে নাগরিক ও রাষ্ট্রের মধ্যে ন্যায়ের নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাকে নিশ্চিত হ'তে হ'বে যে, প্রশাসন আইন মেনে চলছে। ক্ষমতার নির্বাহিকদের হাতে ক্ষমতার প্রয়োগ আইনসম্মত হ'ল কিনা, তাও দেখতে হ'বে তাকে।"[10]

আবার কে. এম. মুন্সী বিচার বিভাগের স্বাধীনতার পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেছেন—

"গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রে একজন নাগরিকের সঙ্গে আর একজন নাগরিকের, একটি রাজ্যের সঙ্গে আর একটি রাজ্যের, এমনকি ভারত সরকারের সঙ্গে রাজ্যগুলির বৈষম্য ও মতপার্থক্যকে মেলাবার জন্য বিচারবিভাগের অবস্থিতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যদি সেই স্বাধীনতাকে রক্ষা করা না যায়, আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি যে, আমরা দ্রুত এক সর্ব কর্তৃত্বময় শাসনতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাব। আমি

জানি যে, দেশ একটি সংকটজনক অবস্থার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে, স্বভাবতই শাসনকার্য পরিচালক নির্বাহিকবর্গকে জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য হাতে প্রভূত শক্তি রাখতে হ'বে। কিন্তু একই সঙ্গে জাতীয় সংহতি রক্ষায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও রাষ্ট্রের একমাত্র শাসনতান্ত্রিক দল রূপে কার্যকরী থাকার পদ্ধতির মাঝের ভেদরেখা যেন দৃষ্টির বাইরে চলে না যায়, সে ক্ষেত্রে বিচারালয়ই গণতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে দেবে।"[11]

লোকসভার আর একজন সদস্য নাজিরুদ্দিন আহমদ বলেছেন,—

"বিচারালয়ের স্বাধীনতার ওপর কোন হস্তক্ষেপ হবে না, শুধু তাই যথেষ্ট নয়, এ ধরনের হস্তক্ষেপের সম্ভাবনাও যেন না থাকে। একই ভাবে বলা যায় যে, প্রশাসনকে শুধুমাত্র নিরপেক্ষ হ'লেই চলবে না, সে যে নিরপেক্ষ তা বোঝাতেও হবে। স্বাধীন বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে আর একটি মত হ'ল, বিচারকদের বিচারের কাজে নির্ভীক হতে হবে—শাসনপরিচালক কর্তৃপক্ষের ভয় বা অনুগ্রহের বশীভূত না হয়ে।

বিচারালয়ের স্বাধীনতার নিরাপত্তাব্যবস্থা

বিচার বিভাগকে অনন্য নির্ভরশীল বা স্বাধীন করে রাখার বিতর্কে, গণপরিষদ অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল ঔপনিবেশিক শাসনের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে।[12] বিচারকদের নিযুক্তি ও অপসারণ, তাদের অবস্থানকাল, পারিশ্রমিক স্থির করা ও তার নীতি, বিচারকের পদে নিযুক্ত হওয়ার জন্য সর্বনিম্ন যোগ্যতা ও গুণাবলী এবং অন্য কোন আদালতে আইনব্যবসায়ী রূপে অবতীর্ণ হওয়াকে নিষিদ্ধ করা (অবশ্য একজন বিচারককে রাষ্ট্র বিশেষ ধরনের কোন কাজে নিযুক্ত করতে পারে) ইত্যাদি ব্যাপারে নির্বাহিকদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া অথবা কোন প্রলোভনে পড়ার সম্ভাবনা নেই, একথার নিশ্চয়তা থাকা দরকার।

সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতিদের নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি তবে এ'ব্যাপারে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে তাঁর আলোচনা করা বাধ্যতামূলক। রাষ্ট্রপতি সুপ্রিমকোর্টের অন্যান্য বিচারপতিদের সঙ্গে ও হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে এ'বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন। কোন বিচারপতিকে অপসারিত করতে হ'লে সংসদের দুটি সভাতেই প্রস্তাব পাশ করাতে হবে এবং সে প্রস্তাবে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন থাকা চাই। (তার আগে লোকসভা এই ভাবে কার্যপ্রণালী স্থির করতে পারে—যে, একটি ভাষণে ঐ বিচারকের অক্ষমতা বা অন্যায় ব্যবহারের প্রমাণ ও তদন্তের কথা উল্লেখ করা হবে।)

একজন বিচারকের অবসর গ্রহণের বয়স 65 রাখা হয়েছে, যদিও সুপ্রিম কোর্টের কোন অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে ভারতের প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্টেই বসার জন্য ডাকতে পারেন। তবে তার জন্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি চাই। (128 নং ধারা)। পারিশ্রমিক স্থির করে আইনসভা; প্রত্যেক বিচারপতি

পান বাড়ি ও অতিরিক্ত সুবিধাগুলি। তাঁর নিযুক্তির পর অসুবিধাজনক কোন ব্যতিক্রম হতে পারেনা। বেতন দেওয়া হয় ভারত সরকারের নির্দিষ্ট ফান্ড থেকে। সংবিধানের দ্বিতীয় তালিকায় সংসদীয় বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গকে বেতন/পারিশ্রমিক দেওয়ার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আছে। ঐ তালিকায় আছে রাষ্ট্রপতি, গভর্নর, লোকসভা ও বিধানসভার প্রধান, বিচারকেরা এবং কনট্রোলার ও অডিটর জেনারেল। আরও একটি সুবিধা, যে, বিচার বিভাগের বিচারকদের নিজস্ব কর্মচারীবর্গের বেতন এবং গৃহ ও অন্যান্য ব্যয়ের টাকাও দেওয়া হয় কনসোলিডেটেড ফান্ড অব ইন্ডিয়া থেকে। সুপ্রিমকোর্টের আধিকারিক ও কর্মচারীদের নিয়োগ করেন প্রধান বিচারপতি বা তাঁর নির্দিষ্ট করে দেওয়া অন্য কেউ।

'আদালতের অবমাননা' নামে একটি বিষয় আছে। কেউ সাহস করেনা সমালোচনা, বা আদালতের নির্দেশ অমান্য করার মতো কাজে বিচারকদের ক্রোধ সৃষ্টি করতে। কারণ তাহ'লে তাকে আদালত অবমাননার জন্য শাস্তি পেতে হ'তে পারে। আদালতের মর্যাদা সবসময়েই রক্ষা করে চলতে হ'বে।

উচ্চ/প্রধান আদালত (হাইকোর্ট)

রাজ্যস্তরে হাইকোর্টের ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের মতই। যেমন হাইকোর্টকে কোর্ট অব রেকর্ড বলা হয় অর্থাৎ কোর্টের অবমাননাস্থলে তার নিজেরই শাস্তি দেওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু নিজের বিচার পুনর্বিবেচনা করার অধিকার তার নেই, যা সুপ্রিমকোর্টের আছে। (137 নং ধারা) সাধারণ ও পুনর্বিচারের অধিকার ক্ষেত্রের অতিরিক্ত আরও কিছু ক্ষমতা আছে হাইকোর্টের। যেমন কোন ব্যক্তির নামে পরোয়ানা জারি করার ক্ষমতা, নিজের অধিকারের সীমার মধ্যে সরকারের/শাসন কর্তৃপক্ষের নামেও পরোয়ানা জারি করা, কোন ব্যক্তিকে আটক রাখার কারণ নির্ণয়ের জন্য আরক্ষাবিভাগ অথবা বিশেষ কোন শাসন কর্তৃপক্ষের নামে পরোয়ানা পাঠানো, নিম্ন আদালতের নামে হুকুমনামা পাঠানো ... ইত্যাদি।

সুপ্রিম কোর্টে কাজের চাপ বেশি থাকায় এই কাজগুলির দ্বারা তাকে সহায়তা দেওয়া হয়, এবং নাগরিকদেরও যাতে তারা নিজেদের প্রদেশের মধ্যেই প্রতিকারের পথ পেতে পারে।

সংবিধানের 227 নম্বর ধারা অনুযায়ী হাইকোর্ট তার অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে অন্যান্য আদালত ও ট্রাইব্যুনালের কাজ পরিদর্শন করতে পারে। কোন রাজ্যের মধ্যে হাইকোর্ট সেই রাজ্যের বিচার বিভাগীয় কর্মচারীদের চাকুরির নির্দিষ্ট পদ,

স্থানান্তরিতকরণ, পদোন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে। বিচারবিভাগের ঐ সব ব্যক্তির নিয়োগ করেন গভর্নর; তিনি পরামর্শ করেন স্টেট পাবলিক সার্ভিস কমিশন ও রাজ্যের প্রধান বিচারালয়ের সঙ্গে।

জেলাকোর্টগুলিতে বিচারক নিয়োগ করেন এবং তাদের পদোন্নতি মঞ্জুর করেন রাজ্যের গভর্নর, কিন্তু তাঁকে ঐ নিয়োগের ব্যাপারে আলোচনা করতেই হয় রাজ্যের প্রধান বিচারপতি সঙ্গে। জেলার বিচারপতি নিযুক্ত হতে হলে কোন ব্যক্তিকে অন্তত সাত বছর আইনজীবী (advocate) হিসাবে কাজ করতে হবে এবং প্রধান বিচারালয়ের মনোনয়ন লাভ করতে হবে।

আগের একটি অধ্যায়েই বলা হয়েছে যে, 1847 সালের বিদ্রোহের পরেই বিভিন্ন প্রদেশে উচ্চ আদালতগুলি বসানো হয় রয়াল ওয়ারেন্টের চার্টার অনুযায়ী। নিজেদের ক্ষেত্রের মধ্যে তারা প্রধান। স্বাধীন বিচারালয় রূপে তাদের কাজ। প্রশাসনের দিক থেকে তারা সুপ্রিম কোর্টের অধীন নয়। তবুও সমগ্রদেশে একটিই অখণ্ড বিচারব্যবস্থা। সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারকদের নিয়োগ, অপসারণ ও চাকুরির অন্যান্য শর্ত নীতির দিক থেকে এক। শাসন কর্তৃপক্ষ বা আইনসভা কেউই হাইকোর্টের ওপর হাত বাড়াতে পারেনা, কোন নিয়ন্ত্রণও রাখতে পারেনা। প্রত্যেক উচ্চআদালত বা হাইকোর্টে একজন প্রধান বিচারপতি ও কয়েকজন বিচারক (সংখ্যা রাজ্য হিসাবে বিভিন্ন হয়) থাকে। রাষ্ট্রপতি রাজ্যের গভর্নর ও ভারতের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করে এবং রাজ্যের প্রধান বিচারপতির সম্মতিক্রমে বিচারপতি নিয়োগ করেন। বিচারকেরা 62 বছর বয়স পর্যন্ত (পূর্বে ছিল 60) চাকরিতে থাকতে পারেন। কেবলমাত্র ভারতীয় নাগরিকের অধিকার আছে বিচারপতি পদে নিযুক্ত হওয়ার। তবে তাঁর হাইকোর্টের আইনজীবী হিসাবে অথবা বিচার বিভাগীয় আধিকারিক রূপে দশ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা চাই। (সুপ্রিম কোর্টে নিয়োগের ব্যাপারে যোগ্যতার মান ও শিক্ষাগত গুণ একই থাকবে। তবে দুটি বিকল্প—হাইকোর্টে বিচারপতি পদে দশবছর কাজের অভিজ্ঞতা—দেশের কোন বিচারালয়ে অন্তত পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা অথবা রাষ্ট্রপতির অভিমত অনুযায়ী একজন বিশিষ্ট জুরিস্ট।)

হাইকোর্টে বিচারক অবসর গ্রহণের পরে অন্য রাজ্যের হাইকোর্টে অথবা সুপ্রিম কোর্টে আইন ব্যবসায়ে নামতে পারেন। হাইকোর্টের বেতনাদি বা অন্যান্য ব্যয় রাজ্যের কনসোলিডেটেড ফান্ড থেকে দেওয়া হয়। রাজ্যের আইনসভার সে বিষয়ে কিছু করার নেই। বিচারপতিদের বেতন বা চাকরির শর্ত ইত্যাদি পরিবর্তনের কোন অধিকার বিধানসভার নেই, শাসনকার্য পরিচালকদেরও নেই। হাইকোর্টের

আধিকারিক বা ভৃত্যদের চাকরির শর্ত স্থির করেন প্রধান বিচারপতি বা তাঁর মনোনীত ব্যক্তি। কিন্তু বেতন, ছুটি, পেনশন প্রভৃতি সম্পর্কিত নিয়মাবলীর জন্য গভর্নরের সম্মতি চাই। এর উদ্দেশ্য—একই ধরনের কর্মচারীদের যারা রাজ্যের নির্বাহিকদের কাছে অথবা বিধানসভার কার্যালয়গুলিতে কর্মরত তাদের সঙ্গে সমতা রক্ষা করা।

বিচারবিভাগে স্বাধীনতার চেতনা

রাজ্যগুলির কর্মনীতির নির্দেশ দিয়ে সংবিধানে (Article 50 of part IV) বলা হ'য়েছে, রাজ্যের সরকারী কাজকর্মে বিচার বিভাগকে শাসনকার্য পরিচালনা থেকে স্বতন্ত্র করে রাখবার জন্য রাজ্য ব্যবস্থা নেবে। গণপরিষদ এই নির্দেশ অলঙঘনীয় বলে মনে করেছে। নিম্ন আদালতগুলি সম্পর্কেও তারা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে আলোচনা করেছে, যাতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ওপর থেকে নিচে অবধি প্রবাহিত থাকে। বিচারকদের পুনর্নিয়োগ প্রশ্নে এবং অবসর গ্রহণের পর গণপরিষদে কর্মরত হওয়ার ব্যাপারে পরিষদ সদস্য এইচ.ভি. কামাথ বলেছেন,

> "রাজ্য বা কেন্দ্র যেখানেই থাকুন, আমাদের বিচারকেরা বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা রক্ষার ব্যাপারে— তাঁদের কাজে ও বিচারের রায়ে রাজ্য বা কেন্দ্রের শাসন কর্তৃপক্ষের ভয় বা অনুগ্রহ লাভের পরোয়া না করে আদর্শ সৃষ্টি করবেন, যে আদর্শ তাদের অবশ্য রক্ষণীয়।"[13]

জওহরলাল নেহরুও একই কথা বলেছেন,—"একথা মনে রাখা প্রয়োজনীয় যে, এই বিচারকেরা শুধু যে প্রথম শ্রেণীর হবেন, তাই নয়, তাঁরা যে দেশের মধ্যেও প্রথম শ্রেণীর এবং সততার আদর্শ, সে ভাবেই তাঁদের গণ্য হ'তে হবে। প্রয়োজন হলে তাঁদের এমন মানুষ রূপে পরিচয় দিতে হবে যাঁরা, যাই হোক না কেন, নির্বাহিক শাসন বিভাগের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেন।"[14]

আজ পর্যন্ত আমাদের অভিজ্ঞতা

এই পৃথকীকরণ এবং পরিবেশকে আলোচনার উর্ধ্বে রাখার ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ করার পর এতদিন ধরে আমাদের অভিজ্ঞতা কি? বিচার বিভাগের স্বাধীনতা স্বীকৃতি কি আদর্শানুগ হয়েছে? শাসন কর্তৃপক্ষ বা আইনসভার প্রভাব থেকে দূরে থাকার চেষ্টায় বিচারকেরা কি সক্ষম হয়েছেন?

বলা যেতে পারে যে, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও বিচার বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ—এই দুটি বিষয়ের মধ্যে হস্তক্ষেপ ঘটেছে ইতিমধ্যেই। আইনের শাসনকে বাঁচিয়ে রাখতে হ'লে নির্বাহিকবর্গের ওপরে বিচারবিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ রাখতেই হবে। শাসনকার্য পরিচালনায় নির্বাহিক বর্গকে (Excutives)

জটিল পরিস্থিতিতে ও সমস্যার সৃষ্টি হ'লে নিজস্ব বিবেচনা প্রসূত ক্ষমতার প্রয়োগ করতে হয়। সেই ক্ষমতার প্রয়োগ যাতে অপপ্রয়োগে গিয়ে না দাঁড়ায় অথবা স্বেচ্ছাচারে না পৌছয়, সেই দিকে নিশ্চিত হওয়ার জন্যই বিচার-বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন। তার জন্য ন্যায়বিচারের পথ যার মধ্য দিয়ে সবকিছু স্বচ্ছভাবে দেখা যায়। বিচার বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিধির বাইরে যাওয়ার পথও খুঁজে বার করেছে বিধানসভা বা শাসন পরিষদ, তাও দেখা গিয়েছে কখনও কখনও। একটি উদাহরণ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা বাতিল করে' জমিদারি অধিগ্রহণের ব্যাপারে। আদালতের হস্তক্ষেপ ছাড়াই যাতে তা করা যায় তার জন্য সংবিধান সংশোধন করে 31এ ও 31বি ধারা দুটিকে সংযোজিত করা হয়। নবম তালিকায় সেই সব আইনগুলি দেখানো আছে—যেগুলি বিচারবিভাগের বিবেচনার মধ্যে নেই। (1975-77) জরুরী সময়ে মানুষের মৌলিক অধিকারগুলিকে উপেক্ষা করা হয়েছিল।

লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল সৃষ্টির জন্য আইন প্রণয়ন করেছে। উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস্ ট্রাইব্যুনাল, ওয়েজ বোর্ড, কাবেরী ওয়াটার্স ট্রাইব্যুনাল, এবং সেন্ট্রাল অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটিভ্ ট্রাইব্যুনাল (CAT) স্টেট অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটিভ্ ট্রাইব্যুনাল প্রভৃতি। শেষ দুইটি ট্রাইব্যুনালের উদ্দেশ্য অসামরিক সরকারী কর্মচারীদের অভিযোগ ও বিক্ষোভের বিষয়। এগুলি অবশ্য আদালতের সঙ্গে সমান আসনে অবস্থান করতে পারে। আদালতের জমে ওঠা বোঝার কিছুটা লাঘব করা ছাড়াও (ইনকাম ট্যাক্সের মতো) জটিল ব্যাপারগুলি বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে বিচার করার অভিজ্ঞতা এদের আছে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে কয়েকটি চাঞ্চল্যকর মামলার বিবরণ ঃ

1) বিখ্যাত গোলকনাথ মামলায় বিচারবিভাগ ও আইনসভার ঠোকাঠুকি বিবাদ বেধে ছিল। লোকসভা মনে করেছিল যে সংবিধানের কোন অংশের সংশোধন করার ব্যাপারে এমনকি মৌলিক অধিকারের ব্যাপারেও লোকসভার ক্ষমতা সর্বোচ্চ। সুপ্রিম কোর্ট এই দাবিকে নাকচ করে দিয়েছে, ঘোষণা করেছে যে, মৌলিক অধিকারগুলির অঙ্গহানি করার কোন অধিকার লোকসভার নেই। এই অধিকারগুলি চিরকালের জন্য সংরক্ষিত।

2) বিচারালয়, শাসনকার্য পরিচালকবর্গ ও আইনসভা, কেউই ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ ও রাজাদের রক্ষিত তহবিল সম্পর্কে একমত হ'তে পারেনি। 11 জন বিচারপতি সমন্বিত সুপ্রিম কোর্টের একটি বেঞ্চ ব্যাঙ্কিং কোম্পানীজ (অ্যাকুইজিসন অ্যান্ড ট্রানসফার অব আন্ডারটেকিং)

অ্যাক্ট বাতিল করে দেয়। অনুরূপ 11 জন বিচারপতির একটি বেঞ্চ রাষ্ট্রপতির 6 সেপ্টেম্বর, 1970 সালের আদেশ, যার দ্বারা দেশীয় রাজাদের স্বীকৃতি তুলে নেওয়া হয়, সেই আদেশ নাকচ করেছে।

পরবর্তী কালে লোকসভা সংবিধানে নির্দিষ্ট মৌলিক অধিকারের সংশোধনের (24th Constitution Amendment Act, 1971) অধিকার ফিরে পেয়েছে। সংবিধানের যে কোন ধারার সংশোধনের অধিকার উপরোক্ত Amendment দ্বারা মেনে নেওয়া হ'য়েছে। সুপ্রিম কোর্ট অবশ্য এখনও সংবিধানের মূলভিত্তির ধারণায় স্থির রয়েছে।

ভারতবর্ষের বিচারপদ্ধতি তার গঠনরীতি ও স্বাতন্ত্র্যরক্ষায় পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখতে পারে, তবু লক্ষ লক্ষ মামলা জমে থাকায় ও বিলম্বিত ব্যবস্থায় প্রচণ্ড চাপের মধ্যে রয়েছে। 'বিলম্বিত বিচারের অর্থ বিচারকে অস্বীকার করা' এই প্রবচনটি সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট ও নিম্ন-আদালতগুলিতে বছরের পর বছর ধরে অগণিত মামলা যে ঝুলে আছে, তার একটি কারণ হ'ল যে, মানুষ এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি সচেতন, এবং আদালতের মাধ্যমে প্রতিকার চায় প্রায় সবসময়েই। স্ত্রী পুরুষ সম্পর্ক ভেদে মানুষের আগ্রহ বেড়ে যাওয়ায়, এ'দিক থেকেও মামলার চাপ, (ভরণ-পোষণ, ডাইভোর্স্, সন্তানদের রক্ষণদায়িত্ব, এবং বিবাহ ব্যাপারে) প্রচণ্ড বেড়েছে। সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে মামলা মোকদ্দমাও তার সঙ্গে যোগ করা যায়। বিচারকমণ্ডলীও এখন অভিযোগের সকল ব্যাপারে এবং বিভিন্ন স্তরে মামলা গ্রহণ করার সময়, পুনর্বিবেচনা ও পুনর্বিচারের আবেদনে মামলা শুনানির সময়েও বারবার মামলা রাখা ও বিরতির আদেশ নির্দ্বিধায় দিয়ে থাকেন। একথা বলা অতিশয়োক্তি হবে না, যে, আপনাদের সারল্যবর্জিত বঙ্কিম বিচার ব্যবস্থাকে অনেকখানি বিকৃতির পথে নিয়ে যেতে পেরেছে যারা আইনকে অগ্রাহ্য করে তারাই। বিশেষ ধরনের মামলার নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ আদালতও বসানো হয়েছে যেমন, পারিবারিক আদালত। কিন্তু এগুলি সমুদ্রে একবিন্দু বারির মতো। বিচার পদ্ধতিকে দ্রুত করে তোলা দূর আকাশের স্বপ্ন হয়ে আছে।

দ্রুত পরিবর্তনের তালের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে বিচারকদের যে নানা অসুবিধার মুখোমুখি হ'তে হচ্ছে তা বুঝতে পারা যায়। সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক স্তরে প্রতিদিন পরিবর্তন ঘটে চলেছে, সেই পরিবর্তনের সঙ্গে চলতে গিয়ে চিন্তাধারা ও মনোভাবকে নমনীয় করে রাখার দরকার হয়। তার ওপর নানাধরনের প্রশ্ন আজ আদালতের হাতে এসে পড়ছে যার উত্তর

দিতে বিশেষজ্ঞের জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন। বাস্তবিক পক্ষে বিচারকদের আজ মহামানব বা মহামানবী হওয়া দরকার,—তাদের হাতে এসে পড়ছে অযোধ্যার ঘটনা, বিশেষজ্ঞের চোখেও যা যথেষ্ট জটিল, আর একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যে প্রতিষ্ঠান স্থিরত্ব ও রক্ষণশীলতার দুর্গ বিশেষ, এই সমস্যা অভূতপূর্ব জটিলতার প্রতীক। কিন্তু সময়ের সঙ্গে পা ফেলে তাদের চলতেই হবে, সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবর্তনকে জানা ছাড়া অন্য বিকল্প কিছু নেই। তা যে সম্ভব তাও দেখা গিয়েছে, সাম্প্রতিক কালে দেওয়া রায়গুলি থেকে। নয়টি রাজ্য সংবিধানের 356 ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করার ব্যাখ্যা, আত্মহত্যার প্রয়াস যে শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয় এবং তিন তালাকের প্রশ্ন থেকেই আদালতের মনোভাবের পরিবর্তন বোঝা যায়।

চার

কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক

কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক

"যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মূল নীতি হ'ল এই যে, কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আইনপরিষদ ও নির্বাহিক বা শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষমতা দুভাগে বিভক্ত হয়। এর জন্য কেন্দ্রকে কোন আইন প্রণয়ন করতে হয়না, সংবিধানেই এই বিভাগের নির্দেশ থাকে... রাজ্যগুলি কোনভাবেই কেন্দ্রের প্রতি নির্ভরশীল নয়, তাদের সংসদীয় বা শাসনকার্য পরিচালনার কর্তৃত্বের জন্য। এ বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সমস্তরে অবস্থিত।"[1] **আম্বেদকর।**

ভারতবর্ষের যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা অপূর্ব, যদিও তাকে আমেরিকা কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করতে হয়েছে। যে সাংগঠনিক একত্ববোধের ভারতবর্ষ দাঁড়িয়েছে, সেই একত্বের জন্যই তার প্রয়াস, একরূপ দেখাবার জন্য নয়। তার অর্থ এই যে প্রত্যেক রাজ্যই স্বশাসিত ও সার্বভৌম; (প্রত্যেকেই সহযোগিতা করে মাথা নিচু করো।) কিন্তু সমগ্র জাতির সঙ্গে তার সার্বভৌমত্বের চিন্তা মিশে আছে। সংবিধানে শুধু একজাতীয়তার স্বীকৃতি। কেন্দ্রের কাছ থেকে রাজ্যের সরে যাওয়ার শক্তি নেই।

আমাদের যুক্তরাষ্ট্র প্রথা সেই ঔপনিবেশিক যুগ থেকে প্রদেশে প্রদেশে এবং প্রাদেশিক স্বশাসনের মধ্যে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মধ্য দিয়ে বিবর্তনের পথ ধরে এগিয়েছে। 1870 সালের ডিসেম্বরে লর্ড মেয়ো তাঁর উল্লেখ্য সিদ্ধান্ত স্কিম অব ফাইন্যানসিয়াল ডি-সেন্ট্রালাইজেশন (অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের পরিকল্পনা)-এর খসড়া চিত্র তুলে ধরেছিলেন, যার দ্বারা কতকগুলি দপ্তরের প্রশাসন ব্যবস্থা প্রাদেশিক শাসন পরিষদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সেই দপ্তরগুলি হল—শিক্ষা, পুলিশ, চিকিৎসা, রাস্তাঘাট এবং সরকারী ভবন। এর জন্য রাজস্ব বিভাগ (Imperial Revenue) ঐ সব দপ্তরের প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের জন্য কুড়ি লক্ষ পাউন্ড বার্ষিক অনুদান হিসাবে মঞ্জুর করা হয়। এর পরেও ঐ পরিকল্পনা ও অনুদানের সমালোচনা করা হ'য়েছিল। গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1919, 1929

সালে সাইমন কমিশন, সর্বশেষে গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1935 খুব সংক্ষিপ্ত আকারে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো গঠনের কথা উল্লেখ করেছে। যাইহোক, এধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা কল্পনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, এবং একতরফা ছিল এই যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা। এই ব্যবস্থায় প্রদেশগুলিই বলা হ'য়েছিল কেন্দ্রের মোটা ঘাটতি মেটাতে। কারণ এই ব্যবস্থায় ভূমিরাজস্ব, বনবিভাগ ও আদালতের স্ট্যাম্প ইত্যাদি আয়ের পথগুলি কেন্দ্রের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। (গভঃ অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1919)। সে সময় এগুলিই ছিল রাজস্ব সংগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ উপায়, প্রাদেশিক প্রশাসন ব্যবস্থার সবচেয়ে অপ্রীতিকর দিক ছিল দ্বৈত-শাসনব্যবস্থা। যাতে কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেমন, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, স্বতন্ত্র করে রাখা হয়েছিল রাজ্যপালের হাতে (এ ব্যাপারে তাঁর ক্ষমতা ছিল অপ্রতিহত) স্থানিক প্রয়োজনের কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি প্রদেশ সরকারের অধীনে নির্বাচিত অংশের জন্য রাখা হয়েছিল, এই বিষয়গুলিকে বলা হয়েছিল transferred subjects. ভারত সরকার ও প্রদেশ সরকারের মধ্যে অর্থনীতির উন্নয়নের মতো উভয় পক্ষের কাছেই প্রয়োজনীয় বিষয় কোন গুরুত্ব পায়নি: উভয়পক্ষের কাছেই সমস্যা সৃষ্টিকারী বিষয়গুলি সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য সমাধানের কোন পথখোঁজার চেষ্টাও করা হয়নি। সংসদীয় ক্ষমতাও ছিল নামমাত্র, বিচারব্যবস্থা সবে মাত্র গড়ে উঠছে। একমাত্র নিশ্চিত বস্তু ছিল নির্বাহিক আমলাতন্ত্র, যাদের ওপর হুকুম আসতো ব্রিটেন থেকে, আর তারা সেই হুকুমের জোরে সর্বত্র কাজ চালু রাখতো।

পরবর্তীকালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে দেওয়া নেহরু রিপোর্ট বলতে চেয়েছে যে, আমাদের শাসনতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রথায় হওয়া উচিত। সুপ্রিমকোর্ট ও আইনসভার কাজ হ'বে ভাগাভাগি করে। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে (1932) কংগ্রেস সর্বভারতীয় 'যুক্তরাষ্ট্র' প্রথার সমর্থনে প্রস্তাব গ্রহণ করল।

1946 সালে ক্যাবিনেট মিশন এই যুক্তরাষ্ট্র প্রথাকে অনুমোদন করল—যার প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ ও বৈদেশিক সম্পর্ক থাকবে কেন্দ্রের হাতে বাকি বিষয়গুলির কর্তৃত্ব রাজ্যের হাতে।

সংবিধান রচনা করেছেন যাঁরা, তাঁদের মন অভিভূত হয়েছিল পরিবেশগত ঘটনার চাপে, তাঁরা জোর দিলেন একটি শক্তিশালী কেন্দ্র গড়ে তোলার ওপর। তাদের চারদিকে তখন জমা হ'য়েছে ঘটনার পর ঘটনা, সাম্প্রদায়িক হিংসা, দুরন্ত খাদ্যাভাব (শস্য উৎপাদনকারী ভূমিখণ্ডগুলির বেশি অংশই পড়েছে পাকিস্তানে), হায়দরাবাদ ও বঙ্গদেশে আইন-শৃঙ্খলার অভাব, ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিতে দেশীয় রাজ্যগুলির দ্বিধান্বিত মনোভাব, কাশ্মীরে পাকিস্তানের বিনাপ্ররোচনায় আক্রমণ, সদ্য গড়ে ওঠা রাজ্যগুলিতে প্রশাসনের নূতন পরীক্ষা এবং সর্বোপরি দেশবিভাগ,—এই সবকিছু মিলে তখন জাতীয় সংহতি ও একত্ববোধ গড়ে তোলার

ওপর ঝোঁক। সংবিধানে নিশ্চয়তা দেওয়া হ'ল যে রাজ্যগুলির কোন ক্ষমতা থাকবে না কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত হওয়ার। এই দৃষ্টিভঙ্গিই প্রবল হ'য়ে উঠল যে, ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশে যে দেশের নানা বৈচিত্র্য, সেদেশে গণতান্ত্রিক কাঠামোয় শক্তিশালী কেন্দ্র সহ যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থাই গ্রহণযোগ্য।

এই বিষয়টির সঙ্গে যুক্ত হ'ল অর্থনৈতিক বৈষম্যের বাস্তবতা।

অর্থনৈতিক একত্ব সৃষ্টির অনেকগুলি দিক আছে। দুটি প্রশ্ন তারমধ্যে উল্লেখ্য, একটি হ'ল, কেমন করে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ও রাজস্ব সম্বন্ধীয় একত্ব চিন্তাকে গড়ে তোলা যায়, যাতে সমগ্র ভারতবর্ষের স্বার্থের অনুকূল অর্থনৈতিক কার্যসূচিগুলি চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, অথচ ভারতের একত্ববোধে ক্রমবর্ধমান চাপ না পড়ে; একথা আরও উল্লেখযোগ্য এই জন্য যে, ভারতবর্ষের অর্থনীতি উন্নতিশীল। দ্বিতীয় প্রশ্ন হ'ল, অনুন্নত অঞ্চলগুলির উন্নয়নের কার্যসূচি কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে, বহু অগ্রাধিকার ও বিভেদসূচক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি এড়িয়ে?

সরকারিয়া কমিশন রিপোর্ট, 1987

অর্থনৈতিক ও কাঠামোগত পরিবর্তন এবং বহুজাতিক সমাজে রূপান্তর তখনই সম্ভব হয় যখন একটি শক্তিশালী কেন্দ্রকে গড়ে তোলা যায়।

আমাদের কি একক নিয়মে বাঁধা, সুবিধার জন্য দর কষাকষি করা অথবা সহযোগিতামূলক বহুরাষ্ট্রিক ব্যবস্থা যা ঐকমত্য হয়ে কাজ করে? গত চার দশকে এই তিন ধরনের উদাহরণ আমরা পেয়েছি। কেন্দ্রের হাতে রয়েছে সংসদীয় কর্তৃত্ব, তাছাড়া কেন্দ্রের হাতে আছে একগুচ্ছ কমিটি, যার কোনটা আইন দিয়ে গঠিত, কোনটা তা নয়, আছে নানা ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ যার দ্বারা সংকটের সময় তার নির্দেশকে বাধ্যতামূলক করতে পারে। সংবিধানের একটি ধারা অনুযায়ী আন্তঃরাজ্য পর্ষদ গড়া যায়। বাস্তবপক্ষে এমন একটি পর্ষদ গড়া হয়েছিল 1990 সালে, কিন্তু উদ্বোধনী সভার পর তার আর কোন প্রকাশ নেই। ইতিমধ্যে রাজ্যগুলি চঞ্চল হয়ে উঠছে কয়েকটি বিষয় নিয়ে : তারমধ্যে প্রধান হ'ল চিরকালের জন্য বৈধ হ'য়ে থাকা সেই বিষয়, যা রাজ্যগুলিতে শঙ্কা জাগিয়ে রেখেছে। বিষয়টি হ'ল সংবিধানের 356 ধারায় রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করা। অন্য বিষয়গুলি হ'ল এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে মাল পাঠানোর ওপর ধার্য করা কর, ইলেকশন কমিশনের ক্ষমতা ও গঠন, খনিজ পদার্থ সম্বন্ধীয় নিষেধাজ্ঞা সম্প্রতি পরিবেশ মন্ত্রক থেকে যা কার্যকরী করা হয়েছে ইত্যাদি।

সংবিধানের 261 ধারায় বলা হ'য়েছে যে, সরকারী কাজকর্ম নথিপত্র ও বিচারবিভাগীয় রায়, কেন্দ্র বা রাজ্য যেখানেই হোক, ভারতবর্ষের সর্বত্রই তার স্বীকৃতি হবে। দেওয়ানি আদালতের বিচারের রায় দেশের যে কোন স্থানেই দেওয়া

যেতে পারে।

262 নম্বর ধারা ঃ বিভিন্ন রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীর জলবণ্টন ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিতর্ক ও বিবাদ সংসদ আইনের বলে বিচারের জন্য ব্যবস্থা নিতে পারে। 1956 সালের আন্তঃরাজ্য রিভার ওয়াটার্স ডিসপিউট্ অ্যাক্ট-এর মর্মার্থ হ'ল যে, এই ধরনের বিতর্ক-বিবাদ মেটাতে কেন্দ্র ট্রাইব্যুনাল সৃষ্টি করতে পারে। ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিশন ও ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল-এর মাধ্যমে, কেন্দ্রও রাজ্যগুলির সঙ্গে কাজ করে। রাজ্যের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কেন্দ্রের কাজ দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন। সহযোগিতামূলক কাজে, প্রয়োজন হ'লেই কেন্দ্র ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী বা অন্য মন্ত্রীদের মধ্যে অধিবেশন বসে। এছাড়া রয়েছে জোনাল কাউন্সিল ও উপদেষ্টামণ্ডলী যেগুলির সৃষ্টি 1956 সালে রাজ্য পুনর্গঠনের (Reorganisation of states in India) পর যে সব ক্ষেত্রে পারস্পরিক সাধারণ স্বার্থ জড়িত সেই সব ক্ষেত্রে। যেমন, অর্থনীতি, সমাজ পরিকল্পনা, সীমান্ত বিরোধ, ভাষার ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও অন্তঃরাজ্য যানবাহন।

Chapters I and II of Part XI of the Constitution

সংবিধানের একাদশ খণ্ডে প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিধান ও প্রশাসন সম্বন্ধে সম্পর্কগত ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে রাজস্ব বণ্টনের ব্যবস্থাও দ্বাদশ খণ্ডে (Part XII) বর্ণনা করা হ'য়েছে। কোন বিষয়ে সাহায্যের জন্য অনুদানের ব্যবস্থা যেমন সংবিধানে আছে তেমনি সংবিধানের বাইরেও—প্ল্যানিং কমিশন ও ভারত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক ও দপ্তরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেওয়া যেতে পারে।

সংবিধানে জরুরী অবস্থার তিনটি বিভিন্ন পর্যায়ের বর্ণনা আছে (352-360) নম্বর ধারা যখন যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থার বদলে একক ব্যবস্থায় চলে আসে শাসন পরিষদ। এগুলি হ'ল—যুদ্ধ সংক্রান্ত জরুরী অবস্থা*, সংসদীয় জরুরী অবস্থা (উভয় ক্ষেত্রেই লোকসভা ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারও কতকগুলি বিষয়ে মৌলিক অধিকারের দাবিকে বাতিল করে দিতে পারে) ও অর্থনৈতিক জরুরী অবস্থা।

যখন কোন রাজ্যে সংসদীয় ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, এবং রাজ্যপাল দেখেন যে বিধানসভায় কোন নেতা নেই যিনি উপযুক্ত সমর্থন পেয়ে দাঁড়াতে পারেন এবং

পাদটিকা

* যুদ্ধসংক্রান্ত জরুরী অবস্থা তিনবার ঘোষিত হ'য়েছে। প্রথম 1962 সালে চীন আক্রমণের সময়ে, দ্বিতীয় 1965 সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়ে এবং তৃতীয় বার 1972 সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের (যখন বাংলাদেশ জন্ম নিল) সময়ে। সংসদীয় জরুরী অবস্থার ঘোষণা হয়েছিল 1975 সালে।

যাঁকে সরকার গঠনের জন্য আহ্বান করা যেতে পারে, তখন রাজ্যপাল বিষয়টি রাষ্ট্রপতির দৃষ্টিতে আনেন। সেই অবস্থায় রাজ্যটিতে জরুরী অবস্থা জারি করে' রাষ্ট্রপতির শাসনে আনা যায় 356 নম্বর ধারা অনুযায়ী। 1950 সাল থেকে এমন ঘটনা 80 বার ঘটেছে। গণপরিষদের সদস্য টি.টি. কৃষ্ণমাচারির মতে এই ধারার প্রবর্তন একটি প্রয়োজনীয় অনিষ্টের সৃষ্টি।

1975 সালে জরুরী অবস্থা ঘোষণা অনেকের মতে স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর খড়্গাঘাত। 1978 সালে সংবিধানের একটি সংশোধন করে স্থির করা হয় যে, রাষ্ট্রপতির কাছে ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের লিখিত প্রতিবেদনের বলেই শুধু রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন।

এখন জরুরী অবস্থা জারি হতে পারে, কেবলমাত্র তখনই, যদি যুদ্ধের পরিস্থিতিতে দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, যদি বাইরের থেকে আক্রমণ আসে বা সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটে; কিন্তু আভ্যন্তরীণ গোলযোগের অজুহাতকে দাঁড় করানো চলবে না। এই ধরনের ঘোষণাকে একমাসের মধ্যে লোকসভায় অনুমোদিত করাতে হ'বে। এই অনুমোদনকে লোকসভার সদস্যসংখ্যার মেজরিটির দ্বারা এবং লোকসভায় উপস্থিত সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের দ্বারাও সমর্থিত হতে হবে।

একথা মনে রাখতে হ'বে যে, সংবিধানে কেবল একটাই বিচার ব্যবস্থা এবং দেওয়ানি ও ফৌজদারী বিষয়ক মৌলিক আইনগুলির একরূপ হওয়ার ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করেছে।

রাজ্যপাল

কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল রাষ্ট্রপতির দ্বারা রাজ্যপালের নিয়োগ। রাজ্যে রাজ্যপালের ভূমিকা হ'ল কেন্দ্রের চোখ ও কানরূপে কাজ করা। সাধারণত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার পর রাজ্যপাল নিযুক্ত হন। অনেকসময় কোন আলোচনা হয় না, শুধু নিয়োগের সংবাদ দেওয়া হয়। কখনও কখনও এর ফলে দেখা গিয়েছে রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে সম্প্রীতি নেই। কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্যপালের বড় একটি ভূমিকা আছে; এটা বিশেষভাবে দেখা যায় রাজ্যপাল যখন রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন সুপারিশ করেন অথবা যখন সংখ্যাগুরুত্ব না থাকা সত্ত্বেও বিধানসভায় একজন নেতাকে মন্ত্রীসভা গঠন করার জন্য তিনি আহ্বান জানানোর সিদ্ধান্ত নেন কিংবা রাজ্যসভার কোন সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য তিনি ধরে রাখেন। যদিও বলা হয় রাজ্যপালের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, নামমাত্র ও আলঙ্কারিক, তবুও উপরোক্ত ক্ষমতাগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। 1967 সালে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের আগে পর্যন্ত কেন্দ্রে ও রাজ্যে শাসন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি দলই থাকায় কোন সমস্যার উদ্ভব হয়নি। কিন্তু তারপরই

অন্যদলগুলির আবির্ভাব ঘটল। সম্মিলিত শাসনসভা বাস্তব ঘটনা হ'য়ে দেখা দিল; রাজ্যপালের উদ্দেশ্য কখনও কখনও সন্দেহজনক মনে হল। যাই হোক, সরকারিয়া কমিশনের সুপারিশ মতো, অনেক চিন্তাভাবনা করে রাজ্যপালের পদে কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয়, তাহলে রাজ্যপাল পদের মর্যাদা ও বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষা করা যেতে পারে। রাজ্যের বাইরে এক বিশিষ্ট ধারা ও যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ হবেন তিনি। কিছুটা নিরাসক্ত চিত্ত, রাজ্য রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন, এবং সাধারণভাবেও রাজনীতিতে বড় কোন ভূমিকা যাঁর ছিল না।

সংবিধানের 258(1) ধারায় রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতা দেওয়া আছে, তিনি যে বিষয়গুলিতে কেন্দ্রকে নির্বাহ করার ক্ষমতা দেওয়া হ'য়েছে, সেইগুলির কার্য নির্বাহিক ক্ষমতা তিনি রাজ্য সরকারকে দিতে পারেন।

258(2) ধারা অনুযায়ী লোকসভা রাজ্য সরকারের হাতে কিছু আইনসম্মত ক্ষমতা দিতে পারে এবং রাজ্যসরকারের সম্মতি ছাড়াই সরকারের নির্বাহিক আধিকারিক বা শাসন কর্তৃপক্ষের হাতে কিছু করণীয় কাজের দায়িত্ব দিতে পারে।

258(A) ধারাতে ঠিক বিপরীত পরিস্থিতির কথা। রাজ্য সরকারের নির্বাহী ক্ষমতা আছে এমন কিছু কাজের দায়িত্ব রাজ্য ভারতসরকারের হাতে তুলে দিতে পারে।

কেন্দ্র-রাজ্য সম্বন্ধের আরও কিছু বিষয় বলা হয়েছে 355 নম্বর ধারাতে। ভারত সরকারের আধা-সামরিক বাহিনীকে (যেমন CRPF) রাজ্যের অসামরিক (পৌর) কর্তৃপক্ষের সাহায্যের জন্য পাঠানো যেতে পারে।

আইন প্রণয়নের ক্ষমতার বিভাজন

ইউনাইটেড স্টেটস-এ আইনপ্রণয়ন সংক্রান্ত একটি তালিকাই আছে ইউনিয়নের হাতে। বাকিগুলি রাজ্যের পরিধিতে পড়ে। কানাডাতে দুটি তালিকা ঃ একটি কেন্দ্রের জন্য অন্যটি প্রদেশগুলির। যা বাকি থাকে তা কেন্দ্রের দায়িত্বে পড়ে। ভারতবর্ষ কানাডাকেই অনুসরণ করেছে শুধু একটি বিষয়ে পার্থক্য ঃ কেন্দ্রের হাতে একটি তালিকা, রাজ্যের হাতে আরেকটি, তাছাড়া একটি সহযোগী তালিকা—কেন্দ্র বা রাজ্যের জন্য, অস্ট্রেলিয়ায় যেমনটি করা হয়।

আইন প্রণয়নের এই তিনটি তালিকা সংবিধানের সপ্তম তালিকায় দেওয়া হয়েছে (Schedule vii)। ইউনিয়ন বা কেন্দ্রের তালিকাটি সবচেয়ে বড়, তার মধ্যে আছে জাতির সাধারণ স্বার্থের সঙ্গে জড়িত 99 দফা বিষয়, যেগুলির সঙ্গে পুরো দেশের সমরূপ থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। কেবলমাত্র লোকসভাই পারে এই সব বিষয়ে আইন তৈরি করতে। এই তালিকাতে আছে—প্রতিরক্ষা, সশস্ত্র বাহিনী, বৈদেশিক সম্পর্ক, নাগরিকত্ব, যুদ্ধ ও শান্তি, যোগাযোগ ব্যবস্থা, অ্যাটমিক শক্তি, মুদ্রা ও বৈধ মুদ্রাপত্র,

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ঐতিহাসিক সৌধ, নির্বাচন ব্যবস্থা, ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন, আয়কর, আমদানী রপ্তানী ও বহির্বাণিজ্যের ওপর কর, সুপ্রিম কোর্ট প্রভৃতি।

রাজ্যতালিকায় আছে 62 (প্রথমে ছিল 66টি) আইটেম যথা ঃ সাধারণের মধ্যে শৃঙ্খলা, আরক্ষা, ন্যায়বিচারের প্রবর্তন, জেল, শিক্ষা, রাজ্যের সরকারী চাকরি ও স্টেট পাবলিক সার্ভিস কমিশন ইত্যাদি। রাজ্য তালিকায় উল্লিখিত বিষয়গুলিতে আইন প্রণয়নের পূর্ণ অধিকার আছে রাজ্যসরকারের।

রাজ্য তালিকার অন্তর্গত বিষয়গুলির ওপর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা 249 ও 250 ধারার দ্বারা সীমাবদ্ধ। রাজ্যসভা দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যা-গুরুত্বে প্রস্তাব নিয়ে যে কোন বিষয়ে আইন করতে পারে যদি মনে করা হয় জাতীয় স্বার্থে তার গুরুত্ব আছে। এই প্রস্তাবটি একবছরের জন্য বৈধ থাকে। জরুরী অবস্থার সময়ে লোকসভা রাজ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে সংবিধানের 250 ধারা অনুযায়ী।

সহযোগী তালিকায় সেই বিষয়গুলিই আছে যাতে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েরই আইন করার স্বার্থ জড়িত। উদাহরণ দেখানো যায়—বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ, ভেজাল, অত্যাবশ্যক দ্রব্য, বিদ্যুৎ, সংবাদপত্র, পুস্তকাদি, মুদ্রণ যন্ত্র ও স্ট্যাম্প ডিউটি। সহযোগী তালিকার কোন বিষয়ে সংসদীয় আইনের অধিকার-সীমা রাজ্যের আইনের ওপরে। তবু রাজ্যের পাশ করা একটি আইন লোকসভায় পূর্বে অনুমোদিত একটি আইনের অধিকারসীমা ছাড়িয়ে যায় যদি রাষ্ট্রপতির বিবেচনাধীন থাকে রাজ্যের বিধানটি এবং পরিশেষে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করে। এর বাইরের আইন প্রণয়নের বিষয়গুলি সব কেন্দ্রের হাতে।

কতকগুলি সাংবিধানিক ধারাকে বিচার করলে রাষ্ট্রকে যুক্তরাষ্ট্র মনে না হয়ে একক বা একরাষ্ট্র বলে মনে হতে পারে; সমতা রাখবার চেষ্টা করা হ'য়েছে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে, যেমন, শিক্ষা ও কৃষিকে রাজ্যর হাতে দিয়ে। অনেকে বলেন যে, আমাদের সংবিধান অর্ধ-যুক্তরাষ্ট্রীয় অথবা আরও পরিষ্কার করে বলতে হ'লে, সাধারণ সময়ে যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু জরুরী অবস্থায় একরাষ্ট্র। সরকারী প্রশাসনের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ কে. সি. হোয়ার-এর (K.C. Wheare) মতো ব্যক্তিরা বলেন, এ হল একরাষ্ট্র নীতিতে পরিচালিত, যদিও সঙ্গে রয়েছে সহকারী যুক্তরাষ্ট্রসম্বন্ধীয় নীতি।[2] আইভর জেনিংস্ বলেছেন,—ভারতবর্ষ একটি যুক্তরাষ্ট্র যার মধ্যে রয়েছে কেন্দ্রীভূত করে রাখবার এক সবল অভিপ্রায়।[3] কৃষি বা শিল্পের মত কিছু কিছু ক্ষেত্রে যা একমাত্র রাজ্যের অধিকারেই পড়ে, কেন্দ্র নিজের অধিকারে নিয়ে এসেছে সেই কাজগুলি যা' জাতীয় স্বার্থে অথবা সমত্ব বজায় রাখতে তার হাতে থাকা দরকার। রাষ্ট্র বা ইউনিয়নের তালিকার 52 নং এনট্রির বলে লোকসভা

পাশ করালো ইন্ডাস্ট্রিস (ডেভেলপমেন্ট্ অ্যান্ড রেগুলেশন) অ্যাক্ট যার বলে একটা বিশাল সংখ্যার শিল্পপ্রতিষ্ঠান ইউনিয়নের নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

একই আইন কেন্দ্রের আইনের আওতায় এনেছে কৃষিজাত পণ্য, যেমন, চা ও কফি। লোকসভা একই ক্ষমতার বলে বিধিবদ্ধ করেছে সাইন্স অ্যান্ড মিনারেলস (ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রেগুলেশন) অ্যাক্ট, 1957।

অত্যাবশ্যক দ্রব্য সম্বন্ধীয় আইন 'দি এসেনসিয়াল কমোডিটিজ অ্যাক্ট্, 1955' বিধিবদ্ধ হয়েছিল সহকারী তালিকার এনট্রি 33-এ থাকার জন্য কেন্দ্রের অধিকার-সীমায় পড়েছিল ব'লে। এই আইনের উদ্দেশ্য দ্রব্য সমেত অন্যান্য অত্যাবশ্যক দ্রব্যের ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য।

যোজনা কমিশন

এসব ছাড়াও কেন্দ্র যোজনা কমিশনের মাধ্যমে তার ক্ষমতাকে ব্যবহার করে। কৃষি, মাছের চাষ, মাটি ও জল সংরক্ষণ, সেচ, পল্লীউন্নয়ন এবং আরও একই ধরনের অনেক কাজ যা সমভাবে রাজ্যের অধিকার সীমাতেও পড়ে, সেগুলির দ্রুত উন্নয়নের জন্য 1950 সালে পরিকল্পনা বা (Planning) কমিশনের সৃষ্টি।

পরিকল্পিত পথে উন্নয়নের জন্য রাজ্যসরকারগুলিকে প্রচুর টাকা পাইয়ে দিয়েছে পরিকল্পনা কমিশন। কেন্দ্রে অনুসৃত কাজের ছক ধরে কমিশন রাজ্য নীতিকে অনেকটাই প্রভাবিত করতে পেরেছে। পরিকল্পনা সম্পর্কে সর্বোচ্চ সিদ্ধান্তমূলক সংস্থা হ'ল জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ (বা National Development Council or NDC-1952) পর্ষদের চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী নিজে, অন্যান্যদের মধ্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা আছেন। জাতীয় উন্নয়নের বিষয়ে নীতি ও কার্যসূচি তৈরি করা এর কাজ।

যদিও এই প্রতিষ্ঠানগুলি ও তাদের কর্মধারা প্রশাসন ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত করণের দিকেই নিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়, তবু রাজ্যগুলির কাছে বিশেষ ভাবে যে সব রাজ্য অনগ্রসর ও যাদের ক্ষেত্রে দৃষ্টি দেওয়া দরকার, তাদের কাছে এই পর্ষদগুলির কাজের মূল্য অনেক। রাজ্যগুলিতে উন্নয়নমূলক কর্মধারার নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় থাকার জন্য কেন্দ্র'র প্রযুক্তিগুলির স্থান নির্বাচনে রাজ্যগুলিকে আভ্যন্তরীণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার হাত থেকে মুক্ত রাখতে পেরেছে। কেন্দ্রীয় প্রযুক্তিগুলির মধ্যে ইস্পাত ও জাহাজের ডক ইত্যাদি ব্যাপারে, Steel plants ও Ship-building yards প্রত্যেক রাজ্যের মধ্যেই আগ্রহের সৃষ্টি করে থাকে। সংসদীয় কার্যাবলীতেও ভূমিসংস্কারের মতো বিষয়ে বিল আনতে হলে রাজ্য সরকারের পরিবর্তনের ছক প্লানিং কমিশনের ভূমিসংস্কার বিভাগকে দিয়ে দেখিয়ে নিয়ে ঐ বিভাগের অনুমোদন পেতে হবে। অনুমোদনের পর ঐ বিষয়ের বিলটি রাজ্য বিধানসভায় তোলা যাবে।

প্রশাসনিক সম্পর্ক

বস্তুত রাজ্যপালের ভূমিকা ও কর্মধারা (যা দেখানো হয়েছে সংবিধানের চতুর্থ খণ্ডে), সর্বভারতীয় সরকারী চাকুরির শর্ত সম্পর্কে লোকসভার অনুমোদন, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য রাজ্যের অসামরিক কর্তৃপক্ষকে আধাসামরিক বাহিনী পাঠানো (রাজ্যগুলির জন্য কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে এই আধাসামরিক বাহিনীর সৃষ্টি 355 নম্বর ধারায়), আন্তঃরাজ্য জলবণ্টন ও সীমানা সংক্রান্ত বিবাদে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যবস্থা ও ধরন, (262 নম্বর ধারা অনুযায়ী) এবং বিবাদ বিতর্ক সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে আন্তঃরাজ্য পর্ষদ (Inter State Council for Resolution of Conflicts, Act.263) গঠন.... প্রভৃতি বিষয়গুলি কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে প্রশাসনিক সম্বন্ধের অন্তর্গত বলে বর্ণনা করা যায়। যদিও এগুলি সংবিধানের বিভিন্ন খাতে তালিকাভুক্ত হয়ে আছে।

সংবিধানের 256 নম্বর ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক রাজ্যের কার্যনির্বাহের ক্ষমতা লোকসভায় গৃহীত বিধানের অনুবর্তী হ'তে হ'বে। কেন্দ্রের কার্যনির্বাহ সংক্রান্ত সমিতিও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থার নির্মাণ ও রক্ষণের ব্যাপারে এবং রেলপথের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে রাজ্যসরকারকে নির্দেশ দিতে পারে।

সর্বভারতীয় চাকুরি সৃষ্টির শর্তগুলির কথাই ধরা যাক; চাকুরিতে নিযুক্ত ব্যক্তিরা রাজ্যে এবং কেন্দ্রে (শর্ত অনুযায়ী অথবা রাজ্য বা কেন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত হয়ে) কর্মে নিযুক্ত হয়। লোকসভা দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের সংখ্যাধিক্যে (রাজ্যসভায়) নূতন সর্বভারতীয় চাকুরির শর্তাবলী তৈরি করতে পারে। সমস্ত দেশের জন্য এমন চাকুরি সৃষ্টির অর্থ, এর দ্বারা জাতীয় সংহতির চেতনা বাড়ে এবং পক্ষপাতদুষ্টতা ও সঙ্কীর্ণচিত্ততার অবসান ঘটায়। প্রত্যেক রাজ্যে এই ধরনের চাকুরিতে অন্য রাজ্য থেকে শতকরা 50 জন অন্তত লোক থাকে। তাদের মধ্যে থেকে কয়েকজন কয়েকটি রাজ্য থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেলেও বেশির ভাগ মানুষকেই স্থানীয় ভাষা শিখতে হয়।

সমগ্র দেশ থেকে চাকুরিতে লোক সংগ্রহ করার এই নীতির ফলে দেশের শ্রেষ্ঠ মেধাবী লোকগুলিকে সরকারী চাকুরিতে পাওয়া যেতে পারে। নির্বাচন, প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন ও পদোন্নতির নীতি ও পদ্ধতি একই রীতিতে করা হয়। এই সর্বভারতীয় চাকুরি নীতির যাঁরা সমালোচক তাঁরা মনে করেন, এর ফলে রাজ্য ভিত্তিতে চাকুরির সংখ্যা কমে যায়; উচ্চ পর্যায়ের সরকারী চাকুরিতে রাজ্যের প্রার্থীদের চাকুরি পাওয়ার সুযোগ বাতিল হ'য়ে যায়, এ'ব্যবস্থা রাজ্যের শাসন ক্ষমতার ওপরেও হস্তক্ষেপ। অন্যান্য ব্যাপারেও রাজ্যগুলি চেষ্টা করেছে তাদের নিজেদের মতো কাজ করে যেতে। তারা মনে করে যে, কেন্দ্রের মনোভাব প্রভুত্বকামী ও অভিভাবকসুলভ।

দুটো উদাহরণ এখানে দেখানো যায়—

1. 1967 সালে কেরালার মুখ্যমন্ত্রী ভয় দেখিয়েছিল কেন্দ্রকে যে, যদি কেন্দ্র কেরালায় যথেষ্ট খাদ্যশস্য না পাঠায় তাহ'লে চীনের সঙ্গে ব্যবস্থা করে চীন থেকে আমদানীর ব্যবস্থা করবে কেরালা।
2. পশ্চিমবঙ্গ মনে করেছে যে, রাজ্যপালের নিয়োগ কেন্দ্রের হাতে একটি অস্ত্র হ'য়ে উঠেছে অ-কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাকে উৎখাত করার জন্য, তাই তারা দাবি করেছে (1969 সালে) যে, তাদের ওপর বসিয়ে দেওয়া রাজ্যপাল ধরমবীরকে দিল্লী ফিরিয়ে নিয়ে যাক।

আন্তঃরাজ্য বিবাদ

আন্তঃরাজ্য মতান্তর মেটাবার জন্য কেন্দ্র অনেক চেষ্টা করেছে তবু সংশ্লিষ্ট পক্ষের মত হ'ল, যে এবিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়নি। উদাহরণ কৃষ্ণার জল নিয়ে মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের মধ্যে কলহ, কাবেরীর জল নিয়ে তামিলনাড়ু ও কর্ণাটক আর নর্মদা নদী নিয়ে গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও রাজস্থানের বিবাদ। কর্ণাটকও মহারাষ্ট্রের সীমানা বিরোধ নিয়ে বিতর্কে সমাধানের জন্য মহাজন কমিশনকে বসানো হ'য়েছিল। এগুলি হ'ল—বিবাদমান রাজ্যগুলির মধ্যে কেন্দ্র কিভাবে মধ্যস্থ হয়ে বিবাদ মেটাবার চেষ্টা করেছে।

কেন্দ্রের আধা-সামরিক বাহিনী

কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত পুলিশ বাহিনী (CRPF) 1949 সালে এক বিশেষ আইনের বলে গঠিত। CRPF নিয়মাবলী তৈরি হয়েছিল উক্ত আইনের 182 নম্বর ধারা অনুযায়ী রাজ্য তালিকার (Entry 2 of the list II) ব্যাখ্যা অনুযায়ী সি. আর. পি. এফ -কে পুলিশ বলা যায় না, এ'হল কেন্দ্রের হাতে সশস্ত্র বাহিনী, রাজ্য সরকারের অনুরোধে রাজ্যের অসামরিক পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে সাধারণ মানুষের মধ্যে শৃঙ্খলা আনতে ও তার রক্ষণের জন্য পাঠানো হয়। সি. আর. পি. এফ.-এর লোকেদের হাতে বিশেষ কার্যভার দেওয়া হয়। কেন্দ্রের অন্যান্য সশস্ত্র বাহিনীর সৃষ্টি 1962 সালে। ইন্দো-টিবেট বর্ডার পুলিশ 1967 সালে, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স 1969 সালে, দি সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স 1985 সালে। রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (Railway Protection Force)-কেও সশস্ত্র বাহিনী করে দেওয়া হ'য়েছে।

কেন্দ্রের নির্দেশে কোন বিশেষ ব্যবস্থার জন্য রাজ্যগুলিকে যে অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহন করতে হয়, তার জন্য ক্ষতিপূরণের নির্দেশ সংবিধান দিয়েছে। চারটি রাজ্যসরকার সাময়িকভাবে 11টি সশস্ত্র পুলিশ ব্যাটেলিয়ন গড়ে তুলেছিল 1971 সালে। উদ্বাস্তু ও নকশাল সমস্যা সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এ'কাজের নির্দেশ

দিয়েছিল রাজ্য সরকারগুলিকে। এখন মাত্র দুটি রাজ্যে রিজার্ভ ব্যাটেলিয়ন রয়েছে। এ'গুলির আনুপাতিক ব্যয়ভার বহন করে কেন্দ্রীয় সরকার।

যুক্তরাষ্ট্র বিষয়ক তত্ত্ব ও নীতি

যুক্তরাষ্ট্র প্রথার শক্তি কোথায় তা চিহ্নিত করতে গিয়ে অনেকে যা দেখতে পান তা হল এই যে, এই পদ্ধতি নমনীয় এবং গতিসম্পন্ন; যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি এককভাবে চলবার শক্তি লাভ করে। অন্যেরা দেখেন, কতকগুলি রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি ক'রে রাজ্যের অধিকারে কেন্দ্র হস্তক্ষেপ করে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ দেখানো হয় যে, চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর নয়টি বিধানসভাকে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল; ঐগুলিতে 1977 ও 1980 সালে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করা হয়। তার ফলে সমালোচনা ওঠে যে, 356 নম্বর ধারাকে (যার দ্বারা রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করা যায়) কেন্দ্র রাজনৈতিক অস্ত্র রূপে ব্যবহার করেছে। 1968 সালে কেরালায় কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা ধর্মঘট করে। তখন রাজ্য সরকার কোন অনুরোধ না করলেও আধাসামরিক বাহিনীকে নামিয়ে দেওয়া হয় এই যুক্তিতে যে, তারা কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যালয়গুলিতে পাহারা দেবে। এই উদাহরণগুলি রাজ্যের ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করণের দ্বারা খর্ব করা ও রাজ্যগুলিকে বশবর্তী করে রাখার প্রয়াস, এমন আশঙ্কাকেই বাড়িয়ে দেয়। যখন দেশের সর্বত্র একটি দলই ক্ষমতায় আসীন ছিল, তখন কোন সমস্যাই ছিল না, কিন্তু অন্য দলগুলির আবির্ভাব ও 1967 সালে সম্মিলিত শাসন কর্তৃত্ব বিভিন্ন দল ও ব্যক্তির মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি করল। তারই ফলে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলির স্বশাসন কর্তৃত্বে হস্তক্ষেপ করার মতো কারণ খুঁজে পেয়েছে, অধিকাংশ লোকই এই ধরনের কথা ভাবে।

আর্থিক সম্পর্ক

কেন্দ্ররাজ্য-সম্পর্কের এক চূড়ান্ত পর্যায়ে এবার পৌঁছচ্ছি; রাজস্ব থেকে সংগৃহীত আয় যেখানে যুক্ত ভারত রাষ্ট্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করার ব্যবস্থা। 1870 সালে লর্ড মেয়ো যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তারপর যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব নীতি সম্পর্কে দুটি কি তিনটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। 1877 সালে লর্ড লিটনের সংশোধনী সিদ্ধান্তে ভূমিরাজস্ব, আবগারী, স্ট্যাম্প এবং আইন ও ন্যায়বিচার প্রাদেশিক সরকারের হাতে দেওয়া হয়। একমাত্র মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে পুরানো নিয়মই বলবৎ রইল।

বলা হয়ে থাকে, যে, 1882 সালের পঞ্চবার্ষিকী বন্দোবস্ত (পাঁচবছর পরপর পুনর্বিবেচ্য) প্রদেশগুলিতে অর্থনৈতিক স্থিরত্বের বদলে অপব্যয় ও অস্থিরতার পথে নিয়ে এসেছিল। তবু, এটা ছিল নতুন এক চিন্তাধারার আরম্ভ, যা এখনও চালু

আছে। তা হ'ল রাজস্বের যে দফাগুলির জাতীয় গুরুত্ব আছে, যেমন, আবগারী, রেলওয়েজ, ডাকবিভাগ ও বৈদেশিক মুদ্রা, সেগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে; আর যেগুলির স্থানিক বা আঞ্চলিক প্রকৃতি (যেমন, পুলিশ, শিক্ষা ইত্যাদি) সেগুলি যাবে প্রদেশের হাতে।

1904 সালে আর একদফা সংশোধন, (যা 1912 সালে লর্ড হার্ডিঞ্জের হাতে স্থায়ী হয়ে গিয়েছে) যার দ্বারা প্রদেশগুলির জন্য রাজস্বের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ এবং সেই সঙ্গে একটি নূতন প্রণালী—বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আহরিত রাজস্ব, যেমন, ভূমিরাজস্ব, আবগারী, স্ট্যাম্প, আয়কর ও বনজ সম্পদের ওপর ধার্য কর কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেওয়া।

ইন্ডিয়ান ট্যাক্সেসান এনকুয়িরি কমিটির (1924) সুপারিশ—আয়করকে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ব্যবহার করা উচিত; আর স্ট্যাম্প্ ও আফিম থেকে প্রস্তুত বিদেশী মদের ওপর আবগারী শুল্ক পুরোপুরি যুক্তরাষ্ট্রের হাতে যাওয়া উচিত।

আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কাঠামো তৈরি করে দিয়েছে 1935 সালের গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট—যার মধ্যে আছে 321টি সেকসান ও 10টি তালিকা। অ্যাক্টের সপ্তম অংশে অর্থ সম্বন্ধীয় ধারাগুলি। সংবিধানের 268 থেকে 272 ধারার বিকাশের সূচনা পাওয়া যাবে সেখানেই; শুল্ক সংগ্রহের এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে তা ভাগ করে দেওয়ার রীতি স্থির করা হয়েছে যে নীতিতে।

অটো নিমেয়ারের (Sir Otto Niemeyer's Report in 1936) প্রতিবেদনে প্রাদেশিক ঋণগুলিকে বাতিল করে দিতে বলা হয়েছে, সে জায়গায় সহায়ক অনুদান ব্যবস্থা নিতে হবে। 1947 সালের সরকার কমিটি সুপারিশ করেছে একটি ফাইন্যান্স কমিটির। ইন্ডিয়ান স্টেট্স্ ফাইন্যান্স এনকোয়ারি কমিটি (1948-49) আর্থিক বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রিক সংহতিকে।

সংবিধানের আইন প্রণয়ন সম্পর্কিত তালিকায় (lists I and II) কেন্দ্র ও রাজ্যের জন্য শুল্ক ধার্যের ব্যাপারে স্বতন্ত্র বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে; কর ধার্য করার ব্যাপারে কোন সহযোগী অধিকার-সীমা দেখানো হয়নি। কর ধার্য করার ব্যাপারে যে বিষয়গুলি তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, সেগুলি কেন্দ্রীয় ক্ষমতার অধিকারে। রাজ্যগুলিকে দেওয়া উল্লিখিত তালিকাগুলির পুরোটা এবং অন্য কতকগুলির ক্ষেত্রে অংশভাগ।

এই ব্যবস্থার অনুমোদন রয়েছে সংবিধানের নিচের ধারাগুলিতে (articles)

1. 268 নং ধারা : কর ধার্য করা হয় কেন্দ্রের দ্বারা, আদায় করার ভার রাজ্যের হাতে।

2. 269 (1) নং ধারা : কর ধার্য করা ও সংগ্রহ করা কেন্দ্রের হাতেই, রাজ্যের হাতে দেওয়া হয় আদায়ের ভিত্তিতে।
3. 270 নং ধারা : কর ধার্য করা ও আদায় করা কেন্দ্রের হাতেই, কিন্তু রাজ্যের সঙ্গে ভাগাভাগি করা হয়।
4. 272 নং ধারা : কর সংগৃহীত হয় রাজ্যের দ্বারা, রাজ্যই তার ফলভোগ করে।

সংবিধানের 280 নম্বর ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক পাঁচ বছরে একজন চেয়ারম্যান ও চারজন সদস্য নিয়ে একটি অর্থ কমিশন (Finance Commission) গঠিত হয়। এই কমিশনের কাজ রাষ্ট্রপতির কাছে জানানো মোট সংগৃহীত শুল্কের অর্থ কিভাবে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ভাগাভাগি হবে; সেই অর্থের ভাগ নিজের নিজের অংশ অনুযায়ী রাজ্যগুলি কিভাবে পাবে, তাও জানাতে হ'বে। কমিশনের ওই সুপারিশের মধ্যে থাকবে ভারতবর্ষে রাখা মোট অর্থভাণ্ডার থেকে (out of Consolidated Fund in India) রাজ্যগুলির রাজস্ব সংগ্রহের অনুদান দেওয়ার নিয়মাবলী; তাছাড়া শক্তিশালী আর্থিক নীতির স্বার্থে রাষ্ট্রপতি কমিশনের কাছে অন্য যে কোন তথ্য চাইতে পারেন, তাও।

275 নম্বর ধারায় রাজ্য ও কেন্দ্রের কাছে কতকগুলি শর্তে অনুদান পেতে পারে, যেমন রাজ্যের তফসিলি উপজাতির কল্যাণের উদ্দেশ্যে তৈরি কোন পরিকল্পনার জন্য অথবা তফসিলি অঞ্চলের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে উন্নত করে ঐ এলাকাকে রাজ্যের অন্য অঞ্চলের সমতুল্য করে তোলা।

282 নম্বর ধারায় নানাবিধ আর্থিক ব্যবস্থা; কেন্দ্র অথবা রাজ্য সাধারণ মানুষের কোন কাজে অর্থদান করতে পরে—সেই প্রসঙ্গে।

ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট ও রাজ্যের নির্বাহিক ক্ষমতায় ভারতবর্ষের কনসোলিডেটেড ফান্ড (বা সম্মিলিত ঋণভাণ্ডার) অথবা রাজ্যের ফান্ড বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণ করা যায়, তবে ঋণের পরিমাণ নির্দিষ্ট উচ্চসীমাকে ছাড়াবে না।

পরিকল্পনা কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় সাহায্য দেওয়া হয় 70 শতাংশ অবধি ব্লকলোন হিসাবে এবং 30 শতাংশ ব্লক-গ্রান্ট (বা অনুদান) হিসাবে। বিশেষ শ্রেণী-ভুক্ত রাজ্য 90 শতাংশ অনুদান ও দশ শতাংশ ঋণ হিসাবে পেতে পারে। পরিকল্পনা খাতে সাহায্যের জন্য সংশোধিত গ্যাডগিল ফর্মুলায় জনসংখ্যার ভিত্তিতে 60 শতাংশ, রাজ্যের অন্তর্দেশীয় উৎপাদনের মাথাপিছু ভিত্তিতে 20 শতাংশ, করবৃদ্ধির প্রয়াসের (tax-effort) 10 শতাংশ ও বিশেষ সমস্যার খাতে 10 শতাংশের সুপারিশ।

কেন্দ্রের আর্থিক সম্পদ হস্তান্তরিত করার চিন্তা সত্যই প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য কিন্তু তার কাজের ধরনে রাজ্যগুলি অত্যন্ত অখুশি। তারা বলে যে ফাইন্যান্স

কমিশনের সুপারিশগুলিও কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। কতকগুলি রাজ্য রাজ্যের পরিকল্পনার জন্য নয়, তার প্রয়োজনের বেশি টাকাই পেয়ে যায়। রাজ্যগুলি শুল্ক আদায়ের ভিত্তি খুব সঙ্কীর্ণ, শুল্কের পরিমাণও প্রয়োজনে বাড়ানো যায় না। কেন্দ্রের ওপর নির্ভর করতেই হয়। রাজ্যের শুল্ক সংগ্রহের ক্ষমতা না বাড়ালে এই নির্ভরতা আরও বাড়ে। কেন্দ্রের হাতে যেমন রাজস্ব সংগ্রহের নানা উৎস, রাজ্য সরকারগুলি তেমনি নানা সামাজিক কৃত্য ও সেবামূলক দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত।

কেন্দ্রের পক্ষ থেকেও দেওয়ার মতো যুক্তি আছে কৃষিকার্য ও কৃষি বিভাগ থেকে যথেষ্ট কর আদায় করা হয় না। বিদ্যুৎ ও সেচ প্রকল্পগুলি উন্নত করাতে না পারার জন্য সেগুলি থেকে যথেষ্ট আয় হয় না। তাছাড়া কেন্দ্রেরও তো আর্থিক সমস্যা আছে। কেন্দ্র এগোতে চায় সকলের প্রতি সমদৃষ্টি রেখে। বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নয়ন কাজের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে চায়। এই সব কারণে কেন্দ্রীভূত বিনিয়োগ ও অনুদান ব্যবস্থা। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (IDBI), ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (IFCI), ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া (ICICI) প্রভৃতি অর্থ সম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে সুবিধাজনক দীর্ঘমেয়াদী ঋণের ব্যবস্থা। তাছাড়াও আছে কেন্দ্রীয় যানবাহন সংক্রান্ত অনুদান। আছে সর্বভারতীয় পর্ষদগুলি, যেমন, তন্তুশিল্প, হস্তশিল্প, সিল্ক, খাদি ও গ্রামীণ শিল্প। রাজ্যগুলির সঙ্গে আলোচনারও প্রয়োজন হয়; বস্তুত শিল্পোদ্যোগ নেই এমন জেলাগুলির তালিকা রাজ্যসরকারগুলির সঙ্গে আলোচনা করেই তৈরি করা হয়েছে।

কেন্দ্র মনে করে, কৃষিজাতদ্রব্যের দাম বেঁধে দেওয়া যন্ত্রাদি সরবরাহ, ঋণের যোগান দেওয়া এবং গবেষণামূলক কাজ প্রভৃতির দায়িত্ব তারই। রাজ্যগুলির বিক্রয়/বিতরণ কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে ন্যায্য দামে প্রায় 50টি দ্রব্যের সরবরাহের ভার নিয়েছে কেন্দ্র। কেন্দ্র উৎপাদন, সরবরাহ, বণ্টন, এবং ব্যবসা ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রর রাখে যে দ্রব্যগুলির ওপরে, সেগুলি হ'ল--ইক্ষু, খাদ্যশস্য, খাদ্যযোগ্য তৈলবীজ, তৈল, কার্পাস তুলা ও কাঁচা পাট। কালোবাজারি বন্ধ করা, এবং অত্যাবশ্যক দ্রব্যের সরবরাহ সঠিক রাখা : Essential Commodities Supply Act.1980, Essential Commodities (Special Provision) Act.1981, Rice Milling Industry (Regulation) Act.1958, ও Warehousing Corporation Act.1962,—এ'সবের জন্য রাজ্য মনে করে যে, সংসদীয় তালিকাগুলি মুছে যাচ্ছে, এবং রাজ্য রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। 1 নম্বর তালিকার 64 নম্বর এনট্রিতে কেন্দ্রের ক্ষমতা রয়েছে দেশের বিজ্ঞান ও হাতের কাজ সংক্রান্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য দেওয়ার। কেন্দ্র বলে যে, রাজ্যগুলির সঙ্গে এই সব ব্যাপারে সর্বদাই আলোচনার প্রক্রিয়া চলছে। কিন্তু

রাজ্যগুলিরও অভিযোগ কেন্দ্র-রাজ্য অর্থবিষয়ক সম্বন্ধের বিরুদ্ধে কেন্দ্র তাদের স্বশাসন ক্ষমতার মূলে আঘাত করছে। ফাইন্যান্স কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কাজ করার বিলম্বের কারণ, তারা দেখাচ্ছে অষ্টম ফাইন্যান্স কমিশনের সুপারিশগুলি দেখিয়ে। তারা মনে করে জেলা বা অঞ্চলগুলির মধ্যে সমস্যার সমন্বয় সাধনকে সম্ভব করা উচিত। অস্ট্রেলিয়ায় যেমন কমনওয়েল্‌থ্ গ্রান্ট্‌স্ কমিশন সেই ধরনের এখানেও ফাইন্যান্স কমিশনকে একটি স্থায়ী রূপ দেওয়া উচিত। রাজ্যগুলির প্রতিনির্ধিরা তাতে থাকবে; স্ট্যাম্প ডিউটি ও ঔষধ তৈয়ারির ওপর আবগারী শুল্ক রাজ্যের হাতে দিয়ে দেওয়া উচিত। কেন্দ্র অবশ্য মনে করে, এর ফলে বৈষম্য আরও বেড়ে যাবে। 269 নম্বর ধারার অন্তর্ভুক্ত আটটি বিষয়েই (যার অন্তর্ভুক্ত ভূসম্পত্তির ওপর ধার্য কর ও চাষের জন্য নয় এমন জমিজমার উত্তরাধিকার) রাজ্যগুলির দাবি। এই করগুলি ধার্য ও সংগ্রহ দুইই ভারত সরকারের হাতে। কিন্তু রাজ্যকে ছেড়ে দেওয়া হয় লোকসভা যে নীতি নির্ধারণ করে, তারই ভিত্তিতে। রাজ্য চায় কর্পোরেট ইনকামট্যাক্স (আইনদ্বারা গঠিত কোম্পানী বা সমিতির ওপর ধার্য আয়কর) বিভাগযোগ্য নিগমে রাখা হোক। স্পেশাল বেয়ারার বন্ড ও কম্পালসারি ডিপোজিট স্কিম (আয়ের পথ বাড়াতে কেন্দ্র যে সব স্কিম বার করেছে) সম্বন্ধেও অনেক সমালোচনা। এগুলির উদ্দেশ্য আয়কর বাড়িয়ে রাজ্যের সঙ্গে ভাগাভাগি করা। অন্যান্য অভিযোগ হ'ল, খুশিমতো টাকা স্থানান্তরিত করার ঘটনা বেড়ে চলেছে, তার ফলে আন্তঃরাজ্য সমতা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। পাঁচ বছর পরেও মাল চলাচলের ওপর কর ধার্য করা যায়নি। 1956 সাল থেকে সুতিবস্ত্র, চিনি ও তামাকের ওপর বিক্রয়কর না রেখে কেন্দ্রের প্রাপ্য আবগারী শুল্ক রাজ্যগুলিকে অসুবিধায় ফেলেছে। সংবাদপত্র, বেতার ও দূরদর্শনে দেওয়া বিজ্ঞাপনের ওপর করধার্য করার অনুমোদন নেই। কেন্দ্রের কর্মচারীদের বেতনের হার মাঝে মাঝে বাড়িয়ে দিয়ে যে ঘোষণা করা হয়, তার ফলে রাজ্য সরকারগুলিও বেতন বাড়াতে ও অতিরিক্ত ব্যয় বহনে বাধ্য হয়, যা তাদের পক্ষে সাধ্যের অতিরিক্ত হয়ে পড়ে। খনিজ পদার্থ, পেট্রোলিয়ম প্রভৃতির জন্য যে রয়ালটি দেওয়া হয়, তাও যথেষ্ট নয়। মূল সঙ্গতির সিংহভাগই নেয় কেন্দ্র, আয়করের ওপর অতিরিক্ত মাশুল শুধু কোন বিশেষ উদ্দেশ্যেই হওয়া উচিত ইত্যাদি ইত্যাদি ...। কেন্দ্র কর্তৃক প্রবর্তিত বিভিন্ন স্কিমের বিরুদ্ধে রাজ্যগুলির অসন্তোষ প্রকাশ জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদে আলোচিত হয়। ফলে প্ল্যানিং কমিশনের কার্যসূচি থেকে ঐ ধরনের স্কিম বা পরিকল্পনাগুলি প্রচণ্ডভাবে কমিয়ে দেওয়া হয়।

এরপরেও আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ হ'তে পারে যখন দেখা যায় যে, কেন্দ্রীয় সরকারের খুশিতে 282 নম্বর ধারা অনুযায়ী (কোন সাধারণ উদ্দেশ্যে অনুদান) বিশেষ বিশেষ রাজ্যকে অনুদান দেওয়া হ'চ্ছে। আঞ্চলিক বৈষম্যকে তৈরি করা হচ্ছে। অনেকে এ' অভিমতও প্রকাশ করেছেন যে, শুধুমাত্র

নিয়মিত আলোচনাই নয়, রাজ্যগুলির রাজস্ব সম্পর্কিত স্ব-কর্তৃত্ব কমিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়াকে রোধ করতে কেন্দ্ররাজ্য আর্থিক পর্ষদ থাকা উচিত। অর্থের স্থানান্তর, কঠোরতা ও কৃচ্ছ্রতা, অপচয়ের ক্ষেত্র প্রভৃতি বিষয়গুলি নিয়ে বিশেষ প্রশ্নগুলি এইরূপ একটি পর্ষদের স্থায়ী কমিটিতে আলোচিত হ'তে পারে, যা ফাইন্যান্স কমিশনের সাহায্যে আসতে পারে। 1961 সালে রেলযাত্রীদের ভাড়ার ওপর কর বাতিল হ'য়ে গেলে রাজ্যগুলি খুশি হয়নি। তার জন্য তাদের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অনুদান দেওয়া হ'চ্ছে। অনুরূপ রাজ্যগুলির ঋণগ্রহণের ক্ষমতাও সীমিত। ইউনাইটেড স্টেটস বা কানাডার মতো তারা অবাধ ক্ষমতা চায়, ঋণগ্রহণের। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি, লাইফ ইনসিওরেন্স্ কর্পোরেশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও অন্যান্য অর্থসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলি ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন; বৈদেশিক সাহায্যও তাই। রাজ্যগুলিকে তাই কেন্দ্রের অনুগ্রহ ও বদান্যতার ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলি আবার সচরাচর অনগ্রসর রাজ্যের সিকিওরিটির ওপর বিনিয়োগ করতে রাজি হয় না। এইভাবেই কেন্দ্র টাকার বাজারের মূল উৎসগুলি হাতে পাওয়ার সব সুবিধাগুলি হাতে পায়। এমন একটি ধারণা গড়ে উঠেছে যে, ন্যায় ও সমতা রক্ষার জন্য কেন্দ্রের হাতে বুদ্ধি ও বিবেচনা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়ার যে ক্ষমতা আছে তার ব্যবহার হয় না। অনুরূপভাবে কেন্দ্র যখন প্রয়োজন মনে করে, বাজেটে ঘাটতি রাখতে পারে, কিন্তু রাজ্যগুলির ওভারড্রাফ্ট্ নেওয়ার ওপর অত্যন্ত কড়া দৃষ্টি। এ সমস্তই অর্থের জগতে মৌলিক বৈষম্যের দৃষ্টান্ত।

পরিকল্পনা কমিশনের ভূমিকা নিয়েও অনেক প্রশ্ন উঠেছে। কারণ, কমিশন দেশের প্রত্যেকটি অংশের জন্য কি ভাল কি মন্দ তা জানার অভিজ্ঞতা নিজের কাছেই রেখেছে। তামিলনাড়ুর সরকার 1971 সালে রাজামান্নার এনকোয়ারি কমিটি নিযুক্ত করেছিল, বিষয় কেন্দ্র-রাজ্য সম্বন্ধ। কমিশন সংবিধানের 257, 330 (2) ও 344(6) [এই ধারাগুলির বিবরণ পরিশিষ্ট 1-এ দেওয়া হয়েছে] নম্বর ধারা বাতিল করার সুপারিশ করে। কমিশনের আর একটি সুপারিশ যে, প্ল্যানিং কমিশনের গঠনতন্ত্রকে আইনের মধ্যে আনা হোক। এর আগেও অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস্ কমিটি স্থাপন করা হয়েছিল, (গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া-1960), যে কমিটি তার প্রতিবেদনের একটি পুরো অধ্যায়েই কেন্দ্র-রাজ্য সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনার বিষয়।

অন্যান্য দেশের অবস্থা কি? আমেরিকা কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় কর নির্ধারণ ক্ষমতায় কোন ভাগাভাগি করা নেই। আমেরিকায় জাতীয় সরকারের ক্ষমতা আছে কর বসানোর; রাজ্যগুলিরও সে ক্ষমতা আছে, ব্যতিক্রম শুধু আমদানি ও রপ্তানি শুল্কের ক্ষেত্রে। রাজস্ব স্থানান্তর করার কোন প্রশ্নই নেই। কানাডায় প্রদেশগুলি কোন পরোক্ষ কর বসাতে পারে না। কানাডার প্রদেশ/রাজ্যগুলি কর সংগ্রহের বড়

ক্ষেত্রগুলি ডোমিনিয়ন (কেন্দ্র) দিয়ে দিতে পারে, তার পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অনুদান পায় তারা। অস্ট্রেলিয়ায় রাজ্যগুলির হাতে বাণিজ্য ও আবগারী শুল্ক আদায়ের ক্ষমতা নেই।

সরকারিয়া কমিশন

1983 সালে স্থাপিত সরকারিয়া কমিশন তার প্রতিবেদন দেয় 1987 সালের অক্টোবরে। কেন্দ্র-রাজ্য সম্বন্ধের যতগুলি দিক আছে,—সংসদীয়, প্রশাসনিক ও আর্থিক, সবগুলি দিক নিয়েই তার আলোচনা। কমিশনের আলোচনার পরিধিতে রয়েছে—রাজ্যপালের ভূমিকা; এবং কোন ধরনের ব্যক্তিকে রাজ্যপাল হিসাবে মনোনীত করা যায়; রাজ্য বিধানসভার বিলগুলি রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য ধরে রাখা; জরুরি অবস্থার বিধান; রাজ্যে অসামরিক কর্তব্য কাজে কেন্দ্রের সামরিক বাহিনীর নিয়োগ। সর্বভারতীয় সরকারী চাকুরি; আন্তঃরাজ্য পর্ষদ; আর্থিক ও সামাজিক পরিকল্পনা; কৃষি, শিল্প, খনি ও খনিজ পদার্থ; বন; খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ; আন্তঃরাজ্য জল-বিরোধ; বাণিজ্য ও ব্যবসায়; সাধারণের জন্য সংবাদ মাধ্যমে এবং নানাবিধ বিষয় যার মধ্যে রয়েছে ভাষা। ইউনিয়ন টেরিটরিজ ও হাইকোর্টের বিচারকেরা—এ'সমস্ত নিয়েই আলোচনা করেছে কমিশন। সরকারিয়া কমিশনকে তার দৃষ্টির সামনে রাখতে হয়েছে সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়নের ধারাকে এবং সংবিধানের পরিকল্পনা ও কাঠামোকে যা সংবিধান-রচয়িতারা নিখুঁতভাবে সাজিয়েছেন। দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে, এবং মানুষের কল্যাণ বোধকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য একান্ত আবশ্যক যে একতা ও সততার বোধকে স্থায়ী করতে। কমিশন পরীক্ষা করেছে সংসদীয় ব্যবস্থাগুলিকে, বিধিবদ্ধ আইনগুলিকে, এবং প্রশাসনিক কাজের রীতিনীতিকে যার ক্রিয়া-প্রক্রিয়া চলেছে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে, কোথাও সহযোগিতামূলক, কোথাও বা স্বতন্ত্র দায়িত্বে।[4]

সরকারিয়া কমিশন সকল রাজ্য থেকেই একটি প্রশ্নমালার মাধ্যমে সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করেছে। যে সব বিষয়ে এরা কাজ আরম্ভ করেছিল সবগুলি সম্বন্ধেই মন্তব্য ও সুপারিশ দিয়েছে। সেগুলি এখন স্বরাষ্ট্র দপ্তরে রয়েছে খুঁটিনাটি দেখার জন্য। কমিশন মনে করে যে, আরও বেশি আলোচনার দ্বারা, এবং যেখানে সম্ভব সেইখানেই আলোচনা করে' রাজ্যগুলি তাদের কেন্দ্রের প্রতি নির্ভরশীল থাকার চিন্তাকে কমিয়ে আনতে পারে। আর্থিক বিষয়গুলিতেও, কমিশন মনে করে যে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ের হাতেই যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে রাজস্ব সংগ্রহকে বাড়িয়ে তোলার জন্য।

একদিকে বিরাট আর্থিক ক্ষতির কথা জানা গিয়েছে সরকারী উদ্যোগে

স্থাপিত সংস্থাগুলি থেকে, যেমন (স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডগুলি) রাজ্য-বিদ্যুৎ পর্ষদগুলি থেকে; ক্ষতি হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন এবং বাণিজ্যিক সেচ পদ্ধতি থেকে। কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হ'য়েছে ঃ

"কর ধার্য করার জন্য কেন্দ্রও রাজ্যের মধ্যে বর্তমানে যে বিভাগ করা রয়েছে তার ভিত্তি হ'ল অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক যুক্তি। কর ধার্য করা হয় যখন আন্তঃরাজ্য ভিত্তিতে এবং করের হারে যখন সমরূপত্ব থাকা উচিত, তখন তা করা হয় (ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট) যুক্ত সরকার থেকে। আর কর বসানো হয় যখন স্থানের বৈশিষ্ট্যে, তখন তা' রাজ্য সরকারের। রাজ্যস্ব সংগ্রহের প্রশাসনে যোগ্যতা ও নিরপেক্ষতার নীতি এবং যুক্ত সরকারের যখন জরুরি প্রয়োজন কর আদায়যোগ্য ক্ষেত্রের, (অন্য বিষয়ের মধ্যে আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও রাজস্ব প্রশাসনে অনগ্রসর রাজ্যের জন্য) তখনও রাজস্ব সংগ্রহের কোন বড় উৎসকে বর্তমান বিভাগ ব্যবস্থা থেকে যুক্ত সরকারের এলাকায় স্থানান্তরিত করার সুযোগ খুব কম। এই প্রসঙ্গে আমরা প্রশাসন সংস্কার (Administrative Reforms) কমিশন—স্টাডি টিমের সঙ্গে পরিচিত হতে পারি; যদি আদৌ কর আদায়কারী ক্ষমতার কোন পুনর্বিবেচনা করা হয়, তবে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে তা যুক্ত সরকারের অনুকূলেই হ'বে, অন্যভাবে নয়। কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিও আমাদের সামনে বলতে এসে একই ধরনের মত প্রকাশ করেছে।

আমাদের দৃঢ় অভিমত এই যে, সংবিধানের যে মূল নীতিতে কর সংগ্রহের ক্ষেত্রগুলি যুক্তসরকার ও রাজ্যগুলির মধ্যে ভাগ করা হয়েছে এবং যেভাবে অর্থবিভাজনের উপযুক্ত ব্যবস্থাগুলির উল্লেখ করা হয়েছে, তা' বলিষ্ঠ ও ত্রুটিশূন্য; সেই নীতির কোন উল্লেখ্য পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই।"[5]

ভাষা সম্পর্কিত নীতি

কেন্দ্র, রাজ্য সম্বন্ধের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল কেন্দ্রের ভাষা সম্পর্কিত নীতি। সংবিধানের সপ্তদশ অধ্যায়ে রাষ্ট্রভাষা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং প্রথম অধ্যায়ের 343 নম্বর ধারাতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা হবে হিন্দী দেবনাগরী লিপিতে। একই সঙ্গে এ'কথাও বলা হয়েছে যে, সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর 15 বছর সরকারী কাজকর্মে ইংরাজি ভাষার ব্যবহারই চালু থাকবে, আর এই সিদ্ধান্ত সংসদের কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যেও সুনির্দিষ্টভাবেই বহাল থাকবে। 1963 সালে লোকসভায় রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত আইন বিধিবদ্ধ হয়, এবং হিন্দীর সঙ্গে ইংরাজি ভাষার ব্যবহারও চালু রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু প্রতিশ্রুতি দেন, যে, হিন্দীর বিকল্প হিসাবে ইংরাজি ভাষার ব্যবহার যতদিন প্রয়োজন অনুভব করা হবে, ততদিনই রাখা হবে। 1968 সালে রাষ্ট্রভাষা-সংশোধন বিধানে এই প্রতিশ্রুতিকে আইনগ্রাহ্য করা হয়। সংবিধানের অষ্টম তালিকায় যে আঞ্চলিক

ভাষাগুলির বিবরণ দেওয়া আছে, তার মধ্যে ইংরাজি নেই, কিন্তু এখন দুটি রাজ্যে ইংরাজি রাষ্ট্র ভাষা হওয়ায় ইংরাজিকে একটি আঞ্চলিক ভাষারূপে গণ্য করার দাবি উঠেছে। 1956 সালে মাধ্যমিক শিক্ষার সর্বভারতীয় পর্ষদ (All India Council for Secondary Education) ত্রি-ভাষা সূত্রের সুপারিশ করেন, যার ফলে ছাত্ররা বিদ্যালয়ে তাদের মাতৃভাষা ইংরাজি ও হিন্দী শেখার সুযোগ পাবে। যে সব রাজ্যে হিন্দীই মাতৃভাষা, সেখানে ছাত্ররা অপর একটি ভাষা শিখতে পারবে। 1956 সালে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের পর ভাষা-সংখ্যালঘু কমিশনের মহাধ্যক্ষ (Commissioner for Linguistic Minorities) নিয়োগের ব্যবস্থাও সংবিধানে সংযোজিত হয়; উদ্দেশ্য, ভাষার দিক দিয়ে যারা সংখ্যালঘু তাদের স্বার্থরক্ষা।

কেন্দ্র-রাজ্য সম্বন্ধের অন্যান্য বিষয়ের মতো ভাষার ব্যাপারেও একটি কেন্দ্রমুখী প্রবণতা দেখা যায়। কয়েকটি রাজ্য প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে, যাতে ইংরাজি সংযোগরক্ষাকারী ভাষা হিসাবে স্থায়ী হয়।

বিকেন্দ্রীকরণ

সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারেও বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজন আছে বলে মন্তব্য করেছেন সরকারিয়া কমিশন। **কমিশনের মন্তব্য ঃ** "ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার দিকে সাধারণ ভাবে প্রবণতা থাকায় ভারতবর্ষের মতো দেশে সকল সময়েই সেই প্রবণতাকে খর্ব করে রাখার জন্য একটি সচেতন ও উদ্দেশ্যমূলক প্রয়াস থাকার বিশেষ প্রয়োজন আছে। চলিত একটি কথার মধ্যে অনেকখানি সত্য আছে, যেখানে বলা হয়েছে যে অযথা কেন্দ্রীকরণ কেন্দ্রে রক্তচাপ বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, এবং বহিরাংশে রক্তহীনতা। যার অবশ্যম্ভাবী ফল রুগ্নতা ও অযোগ্যতা। বাস্তবিক, কেন্দ্রীকরণ সাধারণের সমস্যাগুলিকে বাড়িয়ে দেয়, সমাধান করে না। বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সাধিত হ'তে পারেনা, যদি পঞ্চায়েতীরাজ ও অন্যান্য স্থানিক সংগঠনকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া না হয়।"[6]

সৌভাগ্যক্রমে সংবিধানের 73 ও 74 তম সংশোধন প্রত্যেকটি রাজ্যে তিন সারি বিশিষ্ট পঞ্চায়েতী-রাজ ও নাগরিক পদ্ধতির গ্রহণ আবশ্যিক করেছে এবং তার জন্য পাঁচবছর অন্তর নির্বাচনও বাধ্যতামূলক করেছে। এই বিষয়টি সংবিধানের সপ্তম পরিচ্ছেদে আলোচিত। একথা বলা যথেষ্ট হবে, যে, রাজ্যগুলি যেমন কেন্দ্রের কাছে থেকে বেশি ক্ষমতা চাইতে অভ্যস্ত। বেশি ক্ষমতা ও অর্থের অধিকার, তাদেরও তেমনি প্রস্তুত হ'তে হবে স্থানীয় স্ব-শাসিত সংগঠনগুলির দাবি মেটাতে। রাজ্যগুলিও কেন্দ্রের সামনে আদর্শ তুলে ধরতে পারে এই ক্ষুদ্র সংগঠনগুলিকে স্ব-শাসনের স্বাধীনতা দিয়ে।

কেন্দ্র-রাজ্য সম্বন্ধযুক্ত বিষয়টি আমরা সংক্ষেপে দেখাতে পারি। আগ্রহী ছাত্র

ও পাঠকের যেগুলি পড়া উচিত সেগুলি হ'ল—রাজামান্নার কমিটি রিপোর্ট, দি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস কমিটির প্রতিবেদন, এবং সবার ওপরে সরকারিয়া কমিশনের রিপোর্ট। তাদের সুপারিশগুলির বেশির ভাগই রূপায়িত হয়নি। স্বাধীনতার ও দেশগঠনের প্রথম ভাগে এবং একটি দরিদ্র দেশে পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে সংবিধানে যা ভাবা গিয়েছিল, তার চেয়েও বেশি মাত্রায় কেন্দ্রীভূত করণের প্রয়োজন ও প্রয়াস যুক্তিযুক্ত বলে মনে করা যায়। অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এবং বিশ্বব্যাপী পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সর্বত্রই মানুষ চাইছে তাদের শাসন কর্তৃত্বে ও উন্নয়ন-প্রয়াসে সোচ্চার হয়ে উঠতে। ভারতবর্ষেও আমরা সেই পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছি। যে জ্ঞান ও বুদ্ধি নিয়ে আমরা এই প্রবণতার সঙ্গে নিজেদের মেলাতে পারবো, তার ওপরেই নির্ভর করবে জাতীয় সংহতি ও প্রগতিশীলতার পথে আমাদের ভবিষ্যৎ চলা। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক গঠন বারবার আপোশ ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার শক্তির প্রমাণ দিয়েছে। যখন চারপাশ থেকে অন্যরা বিলীন হয়ে গেছে, তখন তার বনিয়াদের স্থিতিস্থাপকতা তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। যুগের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে ভারতবর্ষ যে সেই প্রজ্ঞাবলেই এগিয়ে যেতে পারবে, এ আশায় উদ্দীপিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে।

পরিশিষ্ট-1

ভারতীয় সংবিধানের সেই ধারাগুলি (Articles) যেগুলি বাতিল করার সুপারিশ করেছেন রাজামান্নার কমিটি-1971

আর্টিক্ল্-256 ঃ রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে বাধ্যবাধকতা
রাজ্যের নির্বাহী ক্ষমতা এমন ভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, সংসদের আইনগুলি এবং অন্য যে কোন আইন যা ঐ রাজ্যে প্রযোজ্য, তা মেনে চলা হয়েছে। ভারত গভর্নমেন্টের কাছে প্রয়োজনীয় হতে পারে এমন যে কোন নির্দেশ রাজ্যগুলিকে দেওয়ার অধিকার থাকবে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাহক বর্গের।

আর্টিক্ল্-257 ঃ কতকগুলি ক্ষেত্রে রাজ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা
প্রত্যেকটি রাজ্যের নির্বাহী ক্ষমতা এমন ভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতায় কোন বাধা না পড়ে; যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা রাজ্যকে এমন নির্দেশ দিতে পারবে, যা ভারত সরকারের কাছে ঐ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় মনে হতে পারে।

আর্টিক্ল্-330(2) ঃ তপশিলভুক্ত জাতি বা তপশিলভুক্ত উপজাতির জন্য যে কোন রাজ্যে বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা (underclause 1) যতদুর সম্ভব কাছাকাছি থাকবে, যতগুলি আসন দেওয়া হয়েছে লোকসভায় রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে তার সমানুপাতে, যে অনুপাত রয়েছে রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে তপশিলভুক্ত জাতি বা তপশিলভুক্ত উপজাতির মোট জনসংখ্যার পরিমাণে।

আর্টিক্ল্-344(6) ঃ রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে লোকসভায় নিযুক্ত কমিশন ও কমিটি
343 নম্বর ধারায় যাই থাক না কেন, 5 নম্বর উপধারায় উল্লিখিত প্রতিবেদন বিবেচনার পর রাষ্ট্রপতি সেই প্রতিবেদনের পূর্ণ বিষয়ের ওপর অথবা অংশ বিশেষের প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁর নির্দেশ জারি করতে পারেন।

পাঁচ

সরকারী প্রশাসনে আইনের নিয়ম ও নীতি

সৎ শাসন ব্যবস্থার নীতি ও তত্ত্ব

গণতন্ত্রে শাসন কর্তৃপক্ষের কাজের সবথেকে বড় কথা হল, হিসাবের ও অন্য বাধ্যবাধকতা পালনের দায়িত্ব এবং সরকারের সকল বিভাগের মধ্যেই আইনের নিয়মের প্রতি আনুগত্য। দক্ষ ও ন্যায়নিষ্ঠ প্রশাসনকে এখন সংবেদনশীল হ'তে হ'বে।

সংসদীয় গণতন্ত্রে শাসন কর্তৃপক্ষ লোকসভার কাছে দায়ী, লোকসভা সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি। শাসন কর্তৃপক্ষ (বা গভর্নমেন্ট) রাজনৈতিক নির্বাহিক ও প্রশাসনিক নির্বাহিকদের নিয়ে গড়ে ওঠে। প্রশাসকরা রাজনৈতিক নির্বাহিকদের কাছে তাদের কাজের জন্য দায়ী, আবার রাজনৈতিকরা দায়ী থাকে লোকসভার কাছে।

প্রতিনিধিত্বমূলক ও প্রত্যক্ষ বাধ্যবাধকতা ঃ লোকসভা ও প্রশাসনিক আমলাতন্ত্র

সংবিধানে যে ভাবে দেখানো হয়েছে তাতে লোকসভার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সর্বময় কর্তৃত্ব। মন্ত্রীরা হ'লেন লোকসভা/আইনসভার সদস্য, এবং তারাই মন্ত্রীপরিষদ গঠন করে জাতি/দেশকে শাসন করে। মানুষের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা পরিকল্পনার রূপ ধ'রে সাফল্যে রূপায়িত হয় যাদের মাধ্যমে, তারাই হ'ল প্রশাসনিক আমলাতন্ত্র। তারা সাধারণ মানুষের কাছে দৃশ্যমান হয়, তাদের হতে হবে আবেগশূন্য ও বস্তুমুখী। মন্ত্রী ও সরকারী কর্মচারী উভয়েই হ'ল সাধারণ মানুষের সেবক। মন্ত্রীরা প্রশাসনের কাছে লোকসভার প্রতিনিধি, আবার লোকসভায় প্রশাসনের প্রতিনিধি। তাই লোকসভায় মন্ত্রীদের দাঁড়াতে হয় আধিকারিকদের পাশে, বিশেষত আত্মসমর্থনের জন্য যখন আধিকারিকদের কোন সংঘ নেই। কিন্তু আধিকারিকেরাও নানাভাবে তাদের কাজের হিসাব দিতে লোকসভার কাছে সোজাসুজি বাধ্য। আইনসভার বিভিন্ন কমিটির কাছে তাদের হাজির হ'তে হয়, যেমন পাবলিক অ্যাকাউন্ট্স কমিটি, এস্টিমেট্স্ কমিটি, কমিটি অন্ সাবোর্ডিনেট্ লেজিসলেশন, স্ট্যান্ডিং কমিটিজ, কমিটি অন পাবলিক আন্ডারটেকিংস্, কনসালটেটিভ কমিটিস্ (মন্ত্রীদের সাহায্যের জন্য

তাদের নিজের নিজের দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত), জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটিজ্ ও কমিটিজ্ অব ইনভেস্টিগেশনে। কেরালায় 'সাবজেক্ট' কমিটিও আছে। সরকারী কর্মচারীদের সবসময়ে সজাগ রাখতেই এগুলির প্রয়োজন। কারণ তাদের তাড়াতে হয় সরকারী কাজের ও নীতির সমর্থনে।

আর্থিক হিসাব নিকাশের দায়িত্ব

প্রশাসনের ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা ছাড়াও অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারেও হিসাব দেওয়ার দায়িত্ব থাকে। ভারত সরকার অথবা রাজ্যের কনসোলিডেটেড ফান্ড থেকে কোন অর্থ ব্যয় করার আগে কার্যনির্বাহিক আধিকারিককে আইনসভার অনুমতি নিতে হবে। রাজ্যের অর্থভাণ্ডারকে নিয়ন্ত্রণ করে আইনসভা, কোন ব্যয়ের হিসাব সুবিবেচনা প্রসূত কিনা এবং তার অগ্রাধিকার আছে কিনা এবিষয়ে নিশ্চিত হ'তে হয় আইনসভাকে তার জন্য ঐ ব্যয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা ও কার্যসূচির গুণাগুণ সম্পর্কে বাজেট আলোচনা করা হয়। অনেকে বলেন যে, এটা একটা বাহ্য লৌকিকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে; বাজেট আলোচনার জন্য যে সময় দেওয়া হয়েছে আলোচ্য বিষয়ের সংখ্যা ও গুরুত্বের তুলনায় তা নিতান্তই সামান্য। অনুদানের যে দাবি থাকে তার কুড়ি শতাংশেরও কম বিষয় আলোচনায় স্থান পায়। তাছাড়া প্রশাসন তার হিসাবের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে বা সাময়িক চাপা দিতে কতকগুলি পদ্ধতি বার করেছে, যেমন, তারা কাজ চালু রেখেছে এমন কয়েকটি স্থানে একটি প্রতীক ব্যবস্থাকে দেখানো। অর্থের যোগান যখন সামান্য তখনও অর্থব্যয়ের প্রবণতা প্রবল হ'য়ে ওঠে। অর্থসংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা তার খুঁটিনাটির দিক থেকে এখনও বাস্তব, কিন্তু রাজস্ব-সম্বন্ধীয় নিয়মানুবর্তিতা ও উদ্দেশ্যর দিক থেকে অর্থহীন।

সংবেদনশীল প্রশাসন ঃ সাধারণের কাছে বাধ্যবাধকতা

আগে যা বলা হয়েছে, তা ছাড়াও, স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষের নূতন লক্ষ্য বিষয়, যেমন, অর্থনৈতিক উন্নতিলাভ ও সামাজিক ন্যায়বিচার, প্রভৃতির জন্য প্রশাসকদের দরজা খুলে রাখতে হয় সাধারণ মানুষ, বিধানসভার সদস্য, এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির জন্য যাতে সাধারণের কাছে তাদের কল্যাণমূলক কার্য ও উন্নয়ন ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়। এখন সরকারী কর্মচারীদের কাছে যাতে সাধারণ মানুষের আসার সুযোগ থাকে তার জন্য সরকারী কার্যালয়গুলিতে একটি নির্দিষ্ট সময় রাখা হয়। এ'ব্যবস্থা সেখানেই হ'তে পারে যেখানে প্রশাসন সজাগ ও সংবেদনশীল, নাম লুকিয়ে রেখে অগোচরে থাকার প্রয়োজন নেই যেখানে। যেখানে এমন একজন থাকবে যাকে দেখা যাবে, যার কথা শোনা যাবে; এবং যে অন্যের কথা শুনতে প্রস্তুত থাকবে। পত্রিকা ও সংবাদ

মাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগ থাকা অবশ্যই প্রয়োজনীয় সংবাদ পাওয়া ও দেওয়ার জন্য। সাধারণের জন্য কার্যশক্তি রূপায়িত করতে হবে, এবং তা সাধারণকে বোঝাতে হবে। তার জন্য সংবাদ মাধ্যমের সাহায্য অপরিহার্য। সাধারণ মানুষের স্বার্থ যার অর্থ, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন স্থানে বদল হতে পারে, (বিভিন্ন শাসন ব্যবস্থায় বিভিন্ন মানুষের স্বার্থের পরিবর্তন হতে পারে) সেই জনসংশ্লিষ্ট কার্য কিভাবে সাধিত হচ্ছে, তা সবসময়েই তুলে ধরতে হবে। যে কোন মাধ্যমই হোক, প্রচার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে যাতে সরকারের উদ্দেশ্য ও প্রয়াসে সাধারণের কাছে স্বচ্ছ হয়ে ওঠে।

যে কোন দিক থেকেই আসুক না কেন হিসাব পরীক্ষার কাজের জন্য সরকারকে সবসময়েই প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রশাসনিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সাধারণ মানুষও যদি যুক্ত হয়, তাহলে দায়িত্বসম্পন্ন ও সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে প্রশাসনও। কারণ সাধারণের চাপে আধিকারিকেরা পরিকল্পনার ও প্রকল্পের কাঠামোর মধ্যে থাকতে ও কাজ করতে বাধ্য হয়। শেষপর্যন্ত সাধারণ মানুষের নিশ্ছিদ্র সতর্ক দৃষ্টিই প্রশাসনকে তৎপরতা ও কাজের গতির মধ্যে আনতে পারে।

বিচার বিভাগের বাধ্যবাধকতা

যদি কোন নাগরিক প্রশাসনের কোন কাজে বা নিষ্ক্রিয়তায় ক্ষুব্ধ হয়, সে প্রতিকারের জন্য আসে আদালতে। তাই বিচার বিভাগের কাজও প্রশাসনকে তার দায়িত্ব পালনে তৎপর রাখে। কিন্তু আদালতগুলি এখন মামলা মামলায় প্লাবিত; আর আমরা তার সঙ্গে যোগ করে চলেছি প্রচণ্ড কাজের চাপ, কারণ প্রতিদিনই নূতন ক্ষেত্র দেখা দিচ্ছে, যেমন দরিদ্রকে আইনি সাহায্য। এবং তারপরেও আদালতগুলি একজন নাগরিকের আবেদনপত্রের ভিত্তিতে মামলা গ্রহণ করছে, যদি সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষার জন্য তার উদ্দেশ্য হয়।

ব্যবহার-বিধি

সরকারী কর্মচারীদের আচরণ ও ব্যবহার—কর্মচারীদের বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য আচরণ বিধি দেওয়া রয়েছে 'কনডাক্ট রুলস্'-এর মধ্যে।

বার্ষিক গোপনীয় রিপোর্ট (Confidential Report)

কিছু আমলাতান্ত্রিক কর্মচারী ওপরতলার আমলাতন্ত্রের কাছে কাজের জন্য দায়ী থাকে। তাদের আচরণ ও কর্মসম্পাদনের যোগ্যতার বিবরণ বার্ষিক কনফিডেনসিয়াল রিপোর্টে বিবৃত হয়। এই রিপোর্ট তাদের ভবিষ্যৎকে নষ্ট করে দিতে পারে আবার উন্নতির পথেও এগিয়ে দিতে পারে। ঊর্ধ্বতন যে আধিকারিক

রিপোর্ট লেখেন, তাঁর মানসিক ভাবধারার ওপর এটা নির্ভর করে। যাঁর চিন্তাধারা নিরপেক্ষ, তিনি তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীর উন্নতি ঘটাতে চাইবেন, এবং তার কর্মশক্তি যাতে বর্ধিত হয় তাই চাইবেন তা না হ'লে তাঁর বিতৃষ্ণা ও বিরক্তি তাঁর অধস্তন কর্মচারীর ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিতে পারে। কর্মযোগ্যতার গুণবিচারের বিষয়টি 6 অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে।

সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা (Vigilence System)

সরকারী কর্মচারীদের সামনে কোন ন্যায়-নীতির নিয়মাবলী নেই, আর বিশ্বাস করি বা না করি সরকারী প্রশাসনকে যারা পেশা হিসাবে নিয়েছে, তাদেরও এমন কোন নিয়মাবলী নেই যদিও চিকিৎসক ও ইঞ্জিনিয়ারদের জন্যে তা আছে। তাই সরকারী কর্মচারীদের জন্য সতর্ক প্রহরা বা ভিজিলেন্স সিস্টেম রাখতে হবে। এমন একটি আবহাওয়া সৃষ্টির ব্যবস্থা নিতে হবে যার মধ্যে দুর্নীতি বা অন্যায় কোন কাজ প্রশ্রয় পাবেনা, এবং যারা দুর্নীতির আশ্রয় নেবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা থাকবে। আমরা আরও একটু এগিয়ে গিয়ে চুরি ও দুর্নীতির বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো।

আইনের নিয়ম

শাসন কর্তৃপক্ষের সকলকেই, মন্ত্রী বা সরকারী যিনিই হোন, আইনের নিয়ম মেনে চলতে হবে। আমাদের সংবিধানের ভিত্তিই হ'ল আইনের নিয়ম অর্থাৎ সরকারের প্রত্যেকটি অঙ্গকে আইন মেনে কাজ করতে হবে। গভর্নমেন্টের প্রত্যেকটি কাজকে আইনের চোখে গ্রাহ্য হতে হবে। আইনের নিয়ম (বা Rule of Law) সম্বন্ধে A.V. Dicey বলেছেন, "স্বেচ্ছাচারিতার প্রভাব, বিশেষ অধিকার প্রসূত কাজ, এমনকি শাসন কর্তৃপক্ষের তরফেও স্বেচ্ছামূলক কর্তৃত্বের প্রয়োগ—এগুলির বিপরীতে আইনের পূর্ণ প্রাধান্য ও আধিপত্য"।[1] শাসন কর্তৃত্বে যাঁরা থাকেন, তাঁদের এমন কাজে হাত দিতে হতে পারে, যা' ব্যক্তিবিশেষের মৌলিক অধিকারের ওপর আঘাত। যেমন, কোন ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার জমি দখল করা, অথবা একটি গৃহনির্মাণের অধিকার না দেওয়া। কিন্তু এর পেছনে বৃহত্তর জনস্বার্থ জড়িত থাকতে পারে, যার জন্য এই কাজগুলির প্রয়োজন হয়েছে। সেক্ষেত্রে লোকসভা/ আইনসভার অনুমোদন নিতে হ'বে। প্রশাসনের বিবেচনাপ্রসূত কাজ করার অধিকার বা ক্ষমতা বাতিল হওয়া উচিত। রাজ্য সরকারের হাতে এত অগণিত কাজ থাকে যে, স্ববিবেচনায় কাজ করার অধিকার তার সীমাকে অতিক্রম করে যায়। এ'ধরনের ক্ষমতা যেখানে দেওয়া হয়, সেখানে ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করতে উপযুক্ত আইন ও রক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত। উদাহরণ দেওয়া যাক্—অর্থের দান/অনুদান

বা ঋণ দেওয়ার ক্ষমতার একটি নির্দিষ্ট উর্ধ্বসীমা রাখতে হবে। এমন পদ্ধতি বার করতে হবে, যাতে স্বেচ্ছাপ্রসূত কর্মক্ষমতার অপব্যবহার কমানো যায়।সরকারী কাজ সম্পাদনের জন্য নিয়ম ও নীতির একটি কাঠামো রাখতে হবে, যাতে সেই নিয়মের ছককে মান্য করে কাজ করা হয়। সিদ্ধান্তগুলি যেন একই রকম হয় এবং পূর্ব থেকেই অনুমেয় হ'তে পারে।

শাসন কার্য পরিচালনা—বিচার-বিভাগ

যদিও কার্য পরিচালনার জন্য শাসন-কার্যপরিচালকদের হাতে বিশেষ ক্ষমতা থাকতে পারে, (যেমন, দুটি রাস্তার সংযোগ স্থলে একটি সৌধ নির্মাণের অনুমতি না দেওয়া), তাই ক্ষমতা অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে থাকা উচিত নয় এবং সাধারণ আইনেরও ব্যতিক্রম হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সরকারী কর্মচারীরাও সাধারণ নাগরিকদের মতো একই আইনব্যবস্থার অধীন। আমাদের মনে রাখতে হবে সংবিধানের 299(2) ও 300 নম্বর ধারা দুটিকে। 300 নম্বর ধারা অনুযায়ী কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার আইনসভার আইনের অধীনে অভিযুক্ত হ'তে পারে। 299(2) ধারায় বলা হ'য়েছে যে, রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল কেউই ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী হবেন না, তাঁদের হয়ে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হ'লে, বা কোন প্রতিশ্রুতি দিলে তার জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবেন না।

স্ববিবেচনায় কাজ করার অধিকার যখন ব্যাপক ভাবে দিতে হয়, তখন আইনের নিয়মকে লঙঘন করা বা তার অপব্যবহার কেমন করে বন্ধ করা যায়। সরকারের আয়তন যখন বড় হয়, এবং প্রশাসনকে যখন অনেক কাজ সম্পাদন করার ভার নিতে হয়, তখন স্ববিবেচনায় কাজ করার ক্ষমতা দেওয়া রাষ্ট্র পরিচালনায় অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তখন আমাদের বিচারব্যবস্থা সবল ও স্বাধীন ভাবে কাজ করে। সুস্থ শাসন ব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষা করে আইনসভা, কার্যনির্বাহিকবর্গ, ও বিচারবিভাগ। প্রশাসনের ব্যাপারে কার্যনির্বাহিক বর্গের লাগাম থাকে বিধানসভার হাতে। যদি নির্বাহিক আধিকারিকেরা উদ্ধত ও স্বেচ্ছাচারমূলক কাজ আরম্ভ করে, এবং আইন অথবা প্রশাসনিক কাজের জন্য তাদেরকে দেওয়া অধিকার লঙঘন করে, তাহ'লে সেই অবস্থায় কাজ আরম্ভ বিচারবিভাগের।

বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা সম্পর্কিত দায়িত্ব

নির্বাহিকদের প্রশাসনের অংশহিসাবে বিধানসম্বন্ধীয় কিছু দায়িত্বও আছে। এই আইন প্রণয়নের ক্ষমতার সঙ্গে রয়েছে স্ববিবেচনায় কাজ করার অধিকার। এমন অনেক ঘটনা আছে, যা মানলে বিস্মিত হ'তে হয় যে, কার্যনির্বাহিক আধিকারিকদের ওপর বিধানসভার কোন নিয়ন্ত্রণ বা তাদের কার্যপরিদর্শনের ব্যবস্থা ছিল কিনা।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কার্যনির্বাহিক শব্দের মধ্যে রাজনৈতিক আমলাতন্ত্র ও সরকারী কর্মচারী দুই-ই পড়ে। স্বেচ্ছামূলক কাজের সতর্ক ব্যবহার থেকে সরে যাওয়ার সব দায়িত্বই সরকারী কর্মচারীদের ওপর চাপানো ঠিক হবে না। রাজনৈতিক ব্যক্তিদেরও একটি বিশেষ ভূমিকা আছে এ' ব্যাপারে। অনেক রাজ্যেই সম্প্রতি পঞ্চায়েতী রাজে স্থানীয় স্বশাসনের ক্ষমতা একটু একটু করে কমিয়ে আনার যে চেষ্টা চলেছে, তার দায়িত্ব হয়তো দুইয়ের ওপরেই পড়বে। কারণ রাজনৈতিক আমলা অথবা সরকারী কর্মচারী কেউই চায়না যে, তাদের ক্ষমতা বা লুঠ করার সুযোগ নষ্ট হোক। কয়েকটি রাজ্যে সংবিধানের সংশোধনের উদ্দেশ্যকে এড়িয়ে গিয়ে শাসন কর্তৃপক্ষ প্রচুর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হাতে রেখেছে, কাজেই ঐ ইউনিটগুলি মোটেই স্ব-শাসিত নয়।

যদিও বিধিসম্পর্কিত পুস্তকে আইন আছে, তবু সে আইনকে মান্য করা হয়না। এগুলির পেছনে অনেক কারণ আছেঃ

আইন করার আগে শিক্ষা ও চেতনা সৃষ্টির দিকে কোন দৃষ্টি দেওয়া হয় না। যারা আইন লেখে তাদের মানুষের সত্যকার প্রয়োজন কি সে বিষয়ে বোধগম্যতার অভাব; আইনের ভাষা জড়িয়ে লিখলে তা' সাধারণের কাছে অবোধ্য হয়ে থাকে। আইনজ্ঞদের উপদেশ পেতে হ'লে অনেক অর্থব্যয়ের প্রয়োজন, যা সাধারণ মানুষের আয়ত্বের মধ্যে থাকেনা। তারপরেও বছরের পর বছর কাটে ন্যায় বিচার পেতে। বিশেষ অসুবিধাজনক ও অত্যন্ত অরক্ষিত অবস্থা হ'ল নারীদের। তাদের পুলিশের কাছে যেতে হয় অনেক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে; এখন অনেক রাজ্যে নারীপুলিশের, কোথাও কোথাও শুধু নারীদের দ্বারা পরিচালিত পুলিশস্টেশন তৈরি হয়েছে। নারীদের এই অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন পারিবারিক আদালতের এক বিচারকঃ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মেয়েরা আদালতে আসে বিবাহ-বিচ্ছেদ, শিশুপুত্র-কন্যার দায়িত্ব ও খোরপোশ, ইত্যাদি কারণে। স্বামীর চোখ এড়িয়ে গোপনে আদালতে এসে তারা শরণ নেয় কোন মুহুরী কিংবা পিওনের। আদালতে পেশ করার জন্য আবেদন পত্র লেখাতেও তাদের টাকা দিতে হয়। সমাজে দরিদ্র ও অসহায় শ্রেণীর কাছে আইনি ব্যবস্থার সুযোগ পৌঁছে দিতে চাওয়াকে উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রশাসন ব্যবস্থার অঙ্গ করে নিতে হবে। মানুষের প্রয়োজনের স্বার্থে আইন তৈরি ও আইনের প্রয়োগ ব্যবস্থাকে সরল ও সহজ করতে হবে। সাধারণ ভাবেই বলা হয়, যে, শিশু-শ্রমিক সম্বন্ধে আইনি ব্যবস্থার প্রয়োগে প্রশাসন ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক আগ্রহেরও অভাব রয়েছে। রাজ্যের নীতি ও আদর্শ রক্ষার নির্দেশ যা প্রশাসনকে কল্যাণকামী রাষ্ট্র গঠনে উদ্বুদ্ধ করবে, তার সঙ্গে এই অবহেলাকে কিভাবে মেলানো যাবে?

অন্তত কিছু আইন কানুন আছে যার দ্বারা সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতি ও উদ্ধত আচরণের জন্য অভিযুক্ত করা যেতে পারে কিন্তু রাজনীতিবিদদের ভদ্র ও ন্যায়সঙ্গত আচরণে প্রবৃত্ত করানো যায়, এমন কোন নীতি বা নিয়ম বা আইন নেই। কাজেই মানুষের ধারণা হয়ে গেছে যে, সৎ নাগরিক ও সৎ সরকারী চাকুরেই কষ্টভোগ করে। তাঁর "এথিক্স্ অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি" প্রবন্ধে ও. পি. দ্বিবেদী বলেছেন, "উদাহরণ দিয়ে দেখানো যায় যে, কতকগুলি এনকোয়ারি কমিশন বসানো হয়েছিল, মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কিছু দুর্নীতির অভিযোগ পরীক্ষা করে দেখার জন্য । এই অভিযোগগুলি সত্য প্রমাণিত হওয়ার পরেও অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। কারণ, সেই অভিযুক্ত ব্যক্তিদের হয় সরকারী পদ থেকে সরানো হয়নি, আর নইলে, পদত্যাগ করার পরেও তারা আবার পুনর্নির্বাচিত হয়ে মন্ত্রীসভায় ফিরে এসেছে। যেন সাধারণ নির্বাচন তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলিকে ধুয়ে দিয়েছে।"[2]

মন্ত্রী ও সর্বোচ্চস্তরের প্রশাসকবর্গের মধ্যে সম্বন্ধ

মন্ত্রীদের সঙ্গে শীর্ষস্থানীয় প্রশাসকদের সম্বন্ধ কি ধরনের তা কোথাও বলা হয়নি। এর ফলে দুদিকেই সুবিধা ও অসুবিধা দুই-ই আছে। টেলিভিশনের বিখ্যাত বি বি সি চ্যানেলের একটি সিরিয়ালে 'Yes Minister' এই জিনিসটিই দেখানো হয়েছে। মন্ত্রী ও তাঁর আমলা দুজনেরই কতকগুলি কাজ আছে করার, আর সেই কাজগুলি করার পথে বেশ কিছু বাধাও আছে। বলা হয়েছে যে তাঁর দপ্তর চালানোর বদলে মন্ত্রীকে দেখতে হবে যে দপ্তরটি ভালোই চলছে,[3] কারণ প্রশাসনের কাজ দেখার মতো সময় তাঁর নেই। একদিকে তিনি ক্যাবিনেট সদস্য, বিধানসভার সদস্য, অন্য দিকে তিনি একটি দলের প্রতিনিধি। সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি তাই তাঁকে মানুষের কাছে যেতে হয় তাদের দুঃখের অভিযোগ শুনতে। যে সব মন্ত্রীরা তাঁদের আমলাদের কাছে স্পষ্ট অকুণ্ঠ ও নির্ভীক কথা শুনতে চান, তাঁদের সংখ্যা এখন ক্রমশ বিরল হয়ে যাচ্ছে। সাধারণত সেই প্রকৃতির মন্ত্রীরা নূতন চিন্তা গ্রহণ করতে উৎসুক হ'ন। এখন অনেক সরকারী কর্মচারীই তাকিয়ে থাকেন মন্ত্রী কি চান জানতে, তিনি লেখেন বা কাজ করেন সেই মতো। যখন উভয়েই সৎ ও যোগ্যতাসম্পন্ন, তখনই বিশ্বাস ও নির্ভরতা স্থায়ী হয়। উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ হয় মন্ত্রীর আর নইলে আমলার অযোগ্যতা। অথবা তাদের কোন একজন বা দুজনের কেউই অন্যের শ্রদ্ধার পাত্র হ'তে পারেন না। কোন কোন মন্ত্রীর কোন পরিচালনার ক্ষমতা থাকেনা। আবার কেউ কেউ অতিরিক্ত কর্ম সচেতন, গুণী ও প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন; তাদের বুদ্ধির পাশাপাশি দাঁড়ানো শক্ত হয় (যেমন সি. রাজাগোপালাচারি যিনি মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন 1937 সাল থেকে 1939 সাল পর্যন্ত)। একের শ্রদ্ধা থাকা উচিত অন্যের প্রতি, এবং সম্মিলিত শক্তিতে যাতে একে অন্যের পরিপূরক হতে পারে, সেই ভাবে কাজ করা উচিত। সরকারী কর্মচারীকে তার মন্ত্রীর সিদ্ধান্তকে রূপ দেওয়ার জন্য কাজে বিশ্বস্ত হতে

হবে; তার নিজের সিদ্ধান্ত যদি বাতিল হয় তবুও। যদি কোন সরকারী কর্মচারী প্রথম বারেই নির্ভয়ে পক্ষপাতশূন্য হয়ে উপদেশ না দেয়, তাহলে পরেও মন্ত্রীর সিদ্ধান্তকে বিশ্বস্তভাবে বহন করে নিয়ে যাওয়া তা'র পক্ষে সম্ভব না হতেও পারে। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, মন্ত্রীর দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা সংসদের কাছে, আর সরকারী কর্মচারী/আমলাদের বাধ্যবাধকতা তাদের মন্ত্রীর বা ক্যাবিনেটের কাছে। মন্ত্রী বা তাঁর মন্ত্রণালয় ও সচিবের মধ্যে আদর্শ সম্বন্ধ কি হওয়া উচিত তার বর্ণনা দিয়েছেন সর্দার প্যাটেল। প্যাটেল বলেছেন, তাঁর সচিব তাঁর মতের বিরুদ্ধতা করে তাঁর মন্তব্য লিখতে পারতেন। সে স্বাধীনতা তিনি (প্যাটেল) তাঁর সব সচিবকেই দিয়েছিলেন। এবার তুলনা করা যাক অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস কমিশন (1968) ভারতসরকারের প্রশাসন যন্ত্র সম্বন্ধে কি বলতে চেয়েছে ঃ

"বেশ কিছু মন্ত্রীর মধ্যে দেখা যায় যে, সচিবের স্পষ্ট ও পক্ষপাতশূন্য অভিমত বা তাঁর চিন্তাধারাকে গ্রহণ করতে তাঁদের প্রবল অনীহা। সচিবের বিচারের মাপকাঠি তাঁদের কাছে, তাঁরা যা চান, সেই কাজ করার বিষয়ে তাদের আগ্রহ কতটা। যথেষ্ট উদাহরণ দেওয়া যায় যে, মন্ত্রীরা এক দৃঢ়চিত্ত সচিবের চেয়ে অনুগত ব্যক্তিকেই পছন্দ করেন। ফল হয় এই, যে, ঐ সচিব কাজের পক্ষে যেমন অনুপযোগী হয়ে যান, তেমনি অখুশি ও অনিচ্ছুক। এর ফলে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান প্রবণতা দেখা দিয়েছে মন্ত্রীর ইচ্ছাকে জেনে নেওয়ার এবং সেই ভাবে তাঁর কাছে অভিমত দেওয়া।"[4]

অনেক রাজনীতিবিদ্ দলীয় কাজকর্ম করাতে চান; সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে যাঁরা সোজাসুজি চলতে চান, যাঁরা সৎ ও আত্মমর্যাদাশীল, তাঁদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। অনেক ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক কর্মকর্তা সরকারী কর্মচারীদের মাথার ওপর ভয় দেখাতে "ড্যামেক্ল্স সোর্ড" অর্থাৎ রূপকথার সেই তরবারি ঝুলিয়ে রাখেন, যে কোন মুহূর্তে তাঁদের ভবিষ্যৎ খারাপ করে দেওয়া হতে পারে, অথবা উপযুক্ত পদে বসার বিষয়ে কোন সহায়তা দেওয়া নাও হতে পারে। বস্তুত কিছু সরকারী কর্মচারী তাঁদের অধীনস্থদের সম্বন্ধে একই কৌশল অবলম্বন করেন। স্বাভাবিক ভাবেই দেখা যায়, চাকরিতে তরুণ বয়স্ক কিছু ব্যক্তি বলেন, যে সচিবের চেয়ে মন্ত্রীর সান্নিধ্যই ভালো। কাজের জটিলতা নানা ভাবে বেড়ে যাওয়ায় নিরাপদে থাকার চেষ্টা করা অনেকের কাছেই স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সরকারী কর্মচারী ও রাজনীতিবিদের মধ্যে অধিকার-ক্ষেত্রের প্রশ্ন নিয়ে তর্ক অনন্তকালের। কারণ তাদের কাজের পরিধিকে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আনা ও উল্লেখ করে বলে দেওয়া দুরূহ ব্যাপার। শাসন পরিষদের কাজ এখন বিপুল এবং নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে, একজন প্রশাসকের কাজের রাজনৈতিক গুরুত্বও প্রচণ্ডভাবে বেড়েছে। সরকারী কর্মচারীরা এখন তাদের কাজে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপকে চাকুরির জগতে সবথেকে বড় সমস্যা বলে মনে করে।

অন্য দিক থেকেও দেখা যায়, যে, মন্ত্রীরা তাঁদের অফিসারদের সমাদরও করেন, বিশেষভাবে যারা তাঁদের সিদ্ধান্তের খুঁটিনাটি দেখে ফলাফল নিয়ে আলোচনা করেন। ব্যক্তিগত স্বার্থে সিভিল সার্ভিস-এর আধিকারিকদের পাশ কাটিয়ে গিয়ে কার্যোদ্ধার করা সঙ্গত নয়। কারণ, এই আধিকারিকেরা তাঁদের অনেক বিড়ম্বনা থেকে বাঁচিয়ে দিতে পারে। সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে এখন 'রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা' কথাটা প্রবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁদের বেশির ভাগই দেখবার চেষ্টা করেন, যে, পাঁউরুটির কোন্ দিকটায় মাখন দেওয়া আছে। তা না পারলে তাদের আলাদা হয়ে থাকতে হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে, সরকার বদল হ'লেই চিফ সেক্রেটারী ও ডাইরেক্টর জেনারেল অব পুলিশের মতো শীর্ষ কর্মচারীদের বদল করা। সরকারী শীর্ষকর্মচারীদের রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়ানোর কাজ এখন মন্ত্রীরা প্রকাশ্যেই করে থাকেন, ঐ কর্মচারীরা সৎ ও ন্যায়বান হ'লেও রেহাই পান না। বস্তুত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যখন কমিটেড অফিসারস (Committed Officers) চাইলেন তখন তা নিয়ে প্রচুর বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল, ''কমিটেড'' শব্দের ব্যবহার করে তিনি কি বলতে চেয়েছেন তাই নিয়ে।

আধিকারিক ও রাজনীতিকেরা পরস্পরের দিকে আঙুল তুলে অভিযোগ করেন। রাজনীতিকেরা পছন্দ করেন না যে, তাঁদের দ্রুত দেওয়া হঠকারী প্রতিশ্রুতির হতাশাব্যঞ্জক ফলাফলের কথা তাঁদের শোনানো হোক। অন্যদিকে আধিকারিকদেরও বুঝতে হবে, যে এই ধরনের অবস্থার মধ্যেই সমাধান পাওয়া যেতে পারে; কারণ মন্ত্রীরা সরকারী কর্মচারীদের চেয়ে অনেক বেশি অনুভব করতে পারে সাধারণ মানুষের নাড়ী। আর রাজনীতিকেরাই তো মানুষের কাছাকাছি থাকে। যেখানে সাদাসিধা কথা বলার দরকার, সেখানে সরকারী কর্মচারীদের কাছে অস্বস্তিকর হ'লেও চাতুর্যের সঙ্গেই বলতে হবে। এবং জাপানীদের ভাষায়, তাদের জানতে হবে কিভাবে হাসিমুখেই ভিন্নমত হওয়া যায়।

একজন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ কর্মচারীর ঝুঁকিও বড় কম নয়। পথের ধারেই পড়ে থেকেছে এমন উদাহরণও অনেক। প্রশাসককে প্রস্তুত থাকতে হবে অন্যের দোষের ফলভাগী হ'তে, অথবা চলে যেতে হবে—কেউ সম্মান দেবে না, কেউ চোখের জল ফেলবে না।

যখন মন্ত্রী ও আধিকারিকের মধ্যে সম্প্রীতির অভাব ঘটে, তখন তাঁর কর্মচারীর পক্ষ সমর্থন করার ইচ্ছাও চলে যায় মন্ত্রীর মন থেকে। রাজনৈতিক প্রভুদের খেলার মধ্যে অনেক সরকারী কর্মচারীর অবস্থা দাবার বোড়ের মতো হয়ে দাঁড়ায়। পারস্পরিক অবিশ্বাসের হাওয়া বাড়তে থাকে যখন রাজনীতিক ও সরকারী কর্মচারী উভয়ের মন থেকেই মূল্যবোধ নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। কাজের পদ্ধতি সরল

ও সহজ না হওয়ায় তাদের পক্ষে কারও কাছে দায়িত্ব না বুঝিয়েই বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, গণতন্ত্রে সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা নির্ভর করে যদি রাজনৈতিক নেতারা জনহিতার্থে উদ্বুদ্ধ হন এবং আইনের নিয়ম মেনে চলেন; আর যদিও এটা বলতে খারাপ লাগে, তাঁরা তাদের নিজেদের দেওয়া প্রতিশ্রুতিকে মান্য করেন। সরকারী কর্মচারীদেরও কর্তব্য জনসেবায় একাগ্র থাকা; তাদের মানতে হবে আইনের নিয়ম, অধ্যবসায়ী হ'তে হবে কর্তব্য সম্পাদনে। এ'কথা না বললেও চলে যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক নির্বাহিক বর্গের সিদ্ধান্তই মেনে চলতে হবে। তাদের দিক থেকেও রাজনৈতিক নির্বাহিককে সচেতন হ'তে হবে তার ক্ষমতার গুরুত্ব ও দায়িত্বভার সম্পর্কে।

Generalists or Specialists

আমরা দেখেছি, সাধারণ মানুষের ইচ্ছাকে যার প্রকাশ লোকসভা অথবা সংসদীয় কমিটিগুলির মাধ্যমে, কর্মে রূপায়িত করার জন্য মন্ত্রীরা কিভাবে সরকারী কর্মচারীদের সহায়তা আশা করেন। সরকারী কাজের সর্বোচ্চ পদের জন্য (ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস) ব্রিটেনের প্রার্থী সংগ্রহ শুরু হয় এই চিন্তা নিয়ে যে, প্রার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র হবে, আর তারা কাজের মধ্য দিয়ে শিখবে। সকল বিষয়ে তাদের জ্ঞান প্রসারিত হবে, নতুন চিন্তা গ্রহণ করার ক্ষমতা তাদের থাকবে, এমনটাই আশা করা হয়েছিল। কোন একটি বিষয়েই তাদের জ্ঞান ও চিন্তা সীমাবদ্ধ থাকবে না এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই এই শিক্ষাক্রমের শুরু। প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি সংগ্রহ ক'রে সেগুলিকে তারা মন্ত্রীদের কাছে তুলে ধরবে সুকৌশলে এবং উপযোগী করে। পেশাদারী প্রশাসকের দক্ষতা ছিল কোন একটি বিষয়েই বিশেষজ্ঞ হয়ে নয়, যে কোন পরিস্থিতির মধ্যে গিয়ে দাঁড়াবার ও সেই পরিস্থিতিকে ঘটনা ও রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে চালনা করার মধ্যে ছিল সেই দক্ষতা। বলা হয়েছিল—

> "ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের একজন কর্মচারীর মানসিক শক্তির ধারণক্ষমতা হাতির শুঁড়ের মতো হওয়া দরকার; যা একটা পিন খুঁটে তুলতে পারে, আবার অরণ্যের মহীরূহকেও টেনে নামাতে পারে। কিছুই খুব বড় না, কিছুই খুব ছোটও নয়, যে কাজের মধ্যে সে কর্মসূত্রে নিজেকে জড়াতে পারেনা।"[5]

কেন্দ্র বা রাজ্য যেখানেই হোক গভর্নমেন্ট ও অন্যান্য দপ্তরের সচিব ও কর্মচারীদের লোকসভা অথবা বিধানসভায় যে সব প্রশ্ন ওঠে তার উত্তর তৈরি করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উত্তরগুলি এমনভাবে ভেবে নিতে হয় যাতে বিরুদ্ধ পক্ষের যুক্তিগুলি ভোঁতা হয়ে যায়, এবং সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাই সর্ববিষয়ে জ্ঞান, কৌশল ও দক্ষতাকে শীর্ষস্থানীয় সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য বলে মনে করা হয়েছে। কিন্তু এখন নূতন

নূতন ঘটনা জেগে উঠছে যার সমাধানের জন্য বিশেষজ্ঞদের দক্ষতা ও জ্ঞান দরকার হয়, এখন সরকারী কর্মচারী ও প্রশাসকদের যে সব সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে, তা অনেক বেশি জটিল ও কষ্টসাধ্য।

অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ্ রিফর্ম্স্ কমিশন (1968) জোরের সঙ্গে সুপারিশ করেছে যে, সরকারী কর্মচারীদের ওপরের স্তরে বিশেষজ্ঞদের আসতে দেওয়া হোক। তাদের অভিমত, যে, কেন্দ্রীয় মহাকরণে ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ্ সার্ভিসের নানা বিষয় জানা আধিকারিকদের আধিপত্যের অবসান হোক। 'পরিচালন ব্যবস্থার শীর্ষস্তরে প্রবেশের পথ সরকারী কর্মচারীদের সকল বিভাগের জন্যই খোলা থাক। সম্ভবত এই সুপারিশের ফলে (এবং একটা আপোশ রফা হিসাবে) প্রথম শ্রেণীর আধিকারিকদের (class I officers of all services) ভারতসরকারের উচ্চতম পদগুলিতে গ্রহণ করা হয়। কিছু বিশেষজ্ঞ ও কলাকুশল ব্যক্তি এই উচ্চপদগুলিতে ভালো ফল দেখিয়েছে। ARC (অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্ম্স্ কমিশন) নির্দেশিত আটটি প্রশস্ত ক্ষেত্রে (পূর্বে এগুলি প্রশাসনের বিশেষ কুশলী ব্যক্তিদের অধিকারে ছিল) ছিল শিল্প, কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন, কর্মীনিয়োগ, সমাজ ও শিক্ষা, অর্থ সংক্রান্ত দপ্তর, প্রতিরক্ষা ও অন্তর্দেশীয় নিরাপত্তা এবং পরিকল্পনা—প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সরকার I. A. S. অফিসারদের সুযোগ দিয়েছিলেন তাদের পছন্দমত অন্তত একটি ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার। এর ফল সরকারের পক্ষেও অত্যন্ত উপযোগী হয়েছিল। কিন্তু শাসন পরিচালনা করেন যাঁরা, তাঁরা সবসময় বিশেষ কুশলী হয়ে ওঠা আধিকারিকদের কাজের একটি বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে সক্ষম হন না, কারণ, চাকুরির ক্ষেত্রে তাঁদের অত্যাবশ্যকতা। এমন আক্ষেপ করতে প্রায়ই শোনা যায় যে, আধিকারিক একটি বিশেষ শিক্ষণক্রম সমাপ্ত করে এলেন, তাঁকে অন্য বিভাগে নিয়োগ করা হচ্ছে অথবা তাঁকে অপেক্ষা করতে হচ্ছে যথাস্থানে নিয়োগ পাবার জন্য। সরকারী কর্মচারীদের ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করা হবে এমন আশা করা যায়না; এমন পরিকল্পনা করা শক্ত কাজ নিশ্চয়ই। কিন্তু অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সুযোগ্য ও উপযুক্ত ব্যবহার শাসন কর্তৃপক্ষের প্রাথমিক লক্ষ্য হওয়া উচিত।

একথা বলা হয় যে, কর্মচারীরা নিজেরাই এই অবস্থা তৈরি করে; তারা এই আপাতমিষ্ট নিয়োগগুলি এড়িয়ে যেতে চায়। এ' ধরনের নিয়োগে সকলের চোখের সামনে এসে পড়তে হয়, যেতে হয় বিদেশে, এমনও হতে পারে যে, ইউনাইটেড নেশনস্-এর কোন একটি দপ্তরে পাঁচ বছরের শর্তে (পাঁচ বছরের চাকরিতে U. N. pension-এর দাবি আসে) কোন একটি কাজের দায়িত্ব নিয়ে যেতে হ'ল।

রাজ্য সরকারের অনেক কর্মচারীই তাদের চাকরির নির্দিষ্ট সময়ে ভারত সরকারের কাছে কাটাতে রাজি নয়। শীর্ষ কর্মচারীদের যে নিরপেক্ষতা ও রাজনৈতিক পক্ষপাত শূন্যতা রক্ষা করতে হয়, তা কিছু স্বার্থপর ব্যক্তির হাতে পড়ে

বোবা হয়ে গিয়েছে। বিশেষ কলাকুশলতা অথবা তার অভাব যেমন সুবিধা আসে তেমন ভাবেই তার ব্যবহার। এ' এমন একটা অবস্থা যেখানে বিশেষজ্ঞ বা বহুবিষয়জ্ঞ যেই হোক না কেন, শুধু যোগ্যতম ব্যক্তিই স্থান পায়।

মন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব

সংসদীয় গণতন্ত্রে নীতি ও কার্যসূচি রচনা মন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রকের দায়িত্ব। কার্যত মন্ত্রী ও তাঁর কর্মচারীবর্গ (সচিব) উভয়েই এ' কাজে ব্যাপৃত হন। সচিব ও আধিকারিকেরা মন্ত্রীদের গৃহীত কার্যক্রমের সপক্ষে ও বিপক্ষে সম্ভাব্য পরিণতির বিষয়ে এবং কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হ'লে সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন। সরকারী কর্মচারীরা তাই শুধু যে কার্যসূচিকে কর্মে রূপ দেন, তাই নয়, তাঁরা আংশিক ভাবে নীতি ও কার্যধারার রচয়িতাও। রাজনীতিকরা আসে ও যায়, কিন্তু সরকারী কর্মচারী চিরদিনের, তারা স্থায়ী। কর্মজীবনে তারা সোপান বেয়ে উচ্চপদে উঠে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতা বাড়ে। তাদের অভিমত তাই রাজনৈতিক কারণে অত্যন্ত অসুবিধাজনক না হ'লে উপেক্ষা করা হয় না। উত্তম প্রশাসক তাই মন্ত্রীকে তার দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখাতে পারে এবং জানাতে পারে যে মন্ত্রী নিজে এবং তাঁর দল কি সুবিধা পেতে পারেন। আবার মন্ত্রী যখন সংসদে সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর কাজের ধরন বোঝাতে বাধ্য হন, সরকারী কর্মচারীরাও বাধ্য হন মন্ত্রীর কাছে তাঁদের উত্তর তৈরি করে দিতে। সরকারী কর্মচারীরা যা করেন, এমন কি সরকারী নীতির প্রয়োজনেও তাঁরা যখন যা করেন, তার সব কিছুই তাঁদের জানাতে হয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে। দায়িত্ব সম্পন্ন মন্ত্রী হিসাবে মন্ত্রীদের ও কর্মচারীদের সকল কাজের মুখ্য দায়িত্বের ভার নিজের হাতে তুলে নিতে হয়। ইংল্যান্ড ও ভারতবর্ষ দুই জায়গাতেই এ'র উদাহরণ রয়ে গিয়েছে। আবার এমন ঘটনাও পাওয়া গিয়েছে যেখানে এই মূল্যবান নিয়মতান্ত্রিক রীতি উপেক্ষিত হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখ্য ঘটনাটির স্থান হ'ল ইউনাইটেড কিংডম; ক্রীচেল ডাউন মামলা (1954) যাতে প্রায় 725 একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল একজন বেসরকারী ব্যক্তির কাছ থেকে। 1937 সালে ইউ. কে. গভর্নমেন্ট এই জমি নিয়েছিলেন বোমাক্ষেপণের (Bombing range) এলাকা হিসাবে। যে উদ্দেশ্যে জমি নেওয়া হয়েছিল, পরে কিন্তু তার বদল হয়ে গেল, প্রতিরক্ষার বদলে হ'ল কৃষিকাজ; একটি সুন্দর কৃষিক্ষেত্র গড়ে উঠল কৃষিমন্ত্রকের তদারকিতে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ঐ জমির মালিকের পরিবারবর্গ তাদের কাছে জমিটি বিক্রি করে দেওয়ার দাবি জানালো। তাদের যুক্তি হ'ল যে উদ্দেশ্যে গভর্নমেন্ট জমিটি নিয়েছিল, এখন তা শেষ হয়ে গিয়েছে। কাজেই এখন আর জমিতে গভর্নমেন্টের কোন দাবি থাকতে পারে না।

সরকারী দপ্তর ঐ যুক্তিতে কান না দিয়ে জমিটি তৃতীয় এক ব্যক্তিকে লিজ দিলেন। যাঁরা জমির আসল মালিক তাদের আবেদনে কেউ কান দিল না। সংসদে চাপ এলে এই আবেদন নাকচ করার ব্যাপারে তদন্ত করতে এনকোয়ারি বসল। সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মচারীদের প্রকাশ্যে জেরা করা হ'ল, সমস্ত কাগজপত্রও সামনে এনে পরীক্ষা করা হ'ল। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট সরকারের বিরুদ্ধে গেল এবং কৃষিমন্ত্রী পদত্যাগ করলেন। যদিও জানা গেল যে, সমস্ত ব্যাপারটি সরকারী কর্মচারীদের এক্তিয়ারে ছিল এবং তারাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, মন্ত্রী এ'বিষয়ে খুব বেশি কিছু জানতেন না। এ'র থেকে জানা গেল যে সরকারী কর্মচারীরা প্রকাশ্য তদন্তে জবাবদিহি করতে বাধ্য হয়েছে। ভারতবর্ষে পঞ্চাশের দশকে অর্থমন্ত্রী ছিলেন টি. টি. কৃষ্ণমাচারি। যখন তাঁর অর্থ দপ্তর মুন্দ্রার ঘটনায় জড়িয়ে যায়, তখন তিনি পদত্যাগ করেন, এবং প্রচুর এল. আই. সি. শেয়ার বিক্রি করা হয় উক্ত মুন্দ্রাকে। বিচারপতি এম. সি. চাগলা যিনি এই ঘটনার তদন্ত করেছিলেন, তাঁর প্রতিবেদনে বলেন,—"মন্ত্রীর দায়িত্ব সম্বন্ধীয় নীতির দুটি দিক আছে। তাঁর কর্তৃত্বের পরিধির মধ্যে মন্ত্রীর পূর্ণ স্বাধীনতা তারই স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত যে, তাঁর অধীনস্থ জনের কাজের পূর্ণ দায়িত্বও তাঁকেই নিতে হবে।"[6]

1954 সালে লালবাহাদুর শাস্ত্রী ছিলেন রেল দপ্তরের মন্ত্রী। একজন রেলকর্মচারীর অবহেলায় একটি মারাত্মক ট্রেন দুর্ঘটনার পর তিনি পদত্যাগ করেন। এটি অবশ্য নীতিকে ধরে রাখার চরম পর্যায়। এখন যদি বিভাগীয় কর্মচারীদের অবহেলা জনিত কাজের দায়িত্ব নিয়ে মন্ত্রীদের পদত্যাগ করতে হ'ত, তাহ'লে আমাদের শ'য়ে শ'য়ে মন্ত্রী আনতে হ'ত; কেউ বাদ যেত না। ফুলটন কমিটির (ইউ. কে.) মন্তব্য : "যে ধারণাকে ভিত্তি করে মন্ত্রীর দায়িত্ব সম্পর্কিত নীতির সৃষ্টি, তা এখন আর চলেনা। সরকারী কর্মচারীদের অনামা থাকার রীতিরও এখন বদল হওয়া দরকার।"[7]

আগের অভিমতই এখনও গুরুত্ব পাচ্ছে, কিন্তু পরের উক্তিটি নিয়ে এখনও ভাবা হয়নি।

সরকারী প্রশাসনে ন্যায়-নীতিকে নিশ্চিত করার পরিকল্পনা ও পদ্ধতি

ব্যক্তিগত স্বার্থের অনুকূলে পদাধিকারজনিত ক্ষমতার প্রয়োগ অর্থনৈতিক কাজ। তার জন্যই কার্যনির্বাহিকবর্গকে সাধারণ মানুষের বাধ্যবাধকতার মধ্যে আনা, তাদের কাজের জন্য সংসদে হিসাব নিকাশ দেওয়ার দায়িত্ব এবং বিচারকমণ্ডলীর কাছে অভিযোগের উত্তর দেওয়ার রীতি। ইউ. কে. ও কানাডার মতো দেশে প্রার্থী নির্বাচন ও পদোন্নতির রীতি প্রার্থীদের মেধা, নিরপেক্ষতা ও আত্মগোপনের প্রয়াসের ওপর গড়ে উঠেছে। মন্ত্রীর দায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সরকারী চাকুরির ঐতিহ্য ন্যায়-নীতি

ও যোগ্যতার পথে প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে আমরা মন্ত্রীদের কথা জানি, যাদের দুঃখ পেতে হয়েছে অবৈধ নারী সংসর্গের জন্য। রাজ্যের গোপন তথ্য বাইরে চলে গেছে কিনা, সে কথা জানার আগেই তাদের বিদায় নিতে হয়েছে মন্ত্রিত্ব থেকে। ইউ. কে'র 'প্রফুমো' কেলেঙ্কারীর মতন ঘটনা দলকে অনেকবার নাড়া দিয়েছে।

আমাদের দেশে একথা বলা হয়ে থাকে, যে, আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে সরকারী সিভিল সার্ভিসের মূল্যবোধ লাভ করেছি, সেগুলি গণতন্ত্র ও উন্নয়নের পথেই প্রয়োজনীয় ethos-এর সঙ্গে মেলেনা। সত্য কথাটা হ'ল যে, আমরা সেই সব মূল্যবোধ পেয়েছি যা আজকের দিনের সঙ্গে মেলেনা। আগেকার দিনে যখন সমস্ত নিয়মই ছিল ন্যায়হীন ও জড়ের মতো স্থির, তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে আইনের নিয়মকে সকলে মেনে চলতো। আর এখন.... নিয়মের সবকিছুই বদলে গেছে, আমাদের প্রতিদিনের জীবনে সাধারণ মানুষের মধ্যে অভিজ্ঞতা হ'ল যে, আইনের নিয়ম কেউ মানছে না। নাগরিক মানুষ বাধ্য হচ্ছে সহানুভূতির পরিবেশ থেকে সরে যেতে, অথবা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে; আর নইলে প্রত্যেকটি ব্যাপারে অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য বিচারের আশায় আদালতে দৌড়তে।

যখন স্বাধীনতা এল, সর্দার প্যাটেলের ইচ্ছাশক্তি ও অধ্যবসায়ের ফলেই আই. এ. এস. ও আই. পি. এস.-এর সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল। তিনি বুঝেছিলেন একটি অরাজনৈতিক সরকারী কৃত্যকের প্রয়োজনীয়তা। সে সময়ের নেতৃবৃন্দ, জওহরলাল নেহরুও সিভিল সার্ভিসের মধ্যে যে আভিজাত্য বোধ ও অন্যদের কাছ থেকে দূরে থাকার প্রবণতা আছে, তার বিরোধী ছিলেন। 1947 সালে স্বাধীন ভারতবর্ষের যে রূপ, তাও এ'র বিরুদ্ধে ছিল। এক স্বেচ্ছাচারী শাসনতন্ত্রে আই. সি. এস. কিভাবে প্রাধান্য পেয়েছিল, তা আমরা দেখেছি। এরা ভয় পেয়ে গিয়েছিল যখন এদের মাথার ওপর নির্বাচিত নেতারা এসে অধিষ্ঠিত হ'ল। ভারতের সংবিধানের তিনটি স্তম্ভ—যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা, গণতন্ত্র ও উন্নয়নমুখীনতা—এ'র মধ্যে স্বতন্ত্র প্রাধান্যে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের ঐতিহ্য একেবারেই অনুপযুক্ত ছিল। একটি গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে এমন কোন কিছুর অস্তিত্ব ভাবাই যেত না, যা' শাসন কার্যপরিচালক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা ফাঁক তৈরি করে রাখতে পারে। নূতন রাজনৈতিক প্রভু ও সরকারী কার্যনির্বাহকদের মধ্যে সম্বন্ধ খুব সহজ হওয়ার ছিল না। শাসন কাঠামো যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তিতে গড়া, সেখানে একটি সর্বভারতীয় পদ্ধতি গড়ে ওঠা অসুবিধাজনক। নতুন আকৃতি পেয়ে (আই. এ. এস.) এরা কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য হ'ল, এবং যে কংগ্রেস ঔপনিবেশিক প্রশাসন যন্ত্রকে ঘৃণা করতো, তাদের কাছ থেকেও সমর্থন লাভ করল।

সম্প্রতি শাসন কর্তৃপক্ষ যে দুটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, তার ফলে প্রশাসনে

ন্যায় ও নীতির সুযোগ বাড়বে বলে মনে করা যায়।

(1) গভর্নমেন্টের কাজের চাপ কমানো এবং (2) শাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ। স্থানীয় স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ক্ষমতা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার ভার ভাগ করে দিলে শাসন কর্তৃপক্ষের আকার কমে যাবে। স্থানীয় ব্যবস্থায় কর্মচারীদের নাম লুকিয়ে রাখা বা গোপনে থাকার সম্ভাবনা নেই, নীতিহীন কর্মচারীদেরও লুকোবার জায়গা নেই। বড় জায়গায় বাঁ হাতের খবর ডান হাত রাখে না; স্থানীয় প্রশাসনে দুর্নীতির ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা অনেক কম।

সরকারী কর্মচারীদের বেতনের হারের দিকেও দৃষ্টি দেওয়া দরকার। লর্ড কর্নওয়ালিস সব সময়েই বলতেন যে, সরকারী কর্মচারীদের বেতন যথেষ্ট ভালো হওয়া দরকার যাতে তাদের মধ্যে অর্থের কৃচ্ছ্রতা না থাকে।

আরও একটি এলাকায় দৃষ্টি দেওয়া দরকার, সেটি হ'ল নীতিবর্জিত রাজনীতিকদের, বিশেষভাবে নির্বাচনের সময়ে তাদের যে আচরণ সেই দিকে। রিপ্রেজেন্টেসন অব পিপলস অ্যাক্ট 1951, 123 নম্বর ধারায় নির্বাচনের সময়ে যে অনৈতিক কাজগুলি করা হয়, তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনে প্রচুর টাকার দরকার হয়। সেই টাকার জন্য রাজনীতিক নেতারা বড় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের ওপর নির্ভর করে। অনেক রাজনৈতিক নেতা ও মন্ত্রী ব্যক্তিগত ভাবে অত্যন্ত সৎ কিন্তু দলের জন্য তাঁরাও অর্থ সংগ্রহ করেন। এমন অনেক ব্যবসায়িক সংস্থা আছে যারা অর্থ অথবা দ্রব্য দিতে চায় বিনিময়ে চায় লাইসেন্স, কাজের চুক্তি (contract), কাজের অনুমোদন, জমি বণ্টন, দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যের বণ্টন, এবং কম টাকায় টেন্ডার ডেকে নিম্নমানের দ্রব্য দেওয়ার (অলিখিত) অনুমোদন। এই লোকগুলি হিসাবের ওলটপালট করতে অথবা অস্থাবর সম্পত্তির দাম কমিয়ে দেখাতে দ্বিধা করে না। দুর্নীতি সম্বন্ধে শান্তনম্ কমিটির রিপোর্টে (1964) বলা হয়েছে যে, সরকারী কাজকর্মে নীতিহীনতা দূর করা যতটা দরকার, ঠিক ততটাই দরকার বেপরোয়া নীতিহীন মাধ্যমগুলির সঙ্গে লড়াই করা।

রাজনৈতিক কর্মী ও সরকারী কর্মচারী এই দুইয়েরই প্রয়োজন সমাজে। তাই অনেক সময় বলা হয়, যে সমাজ অপরাধীকে সৃষ্টি করে। নীতিবর্জিত কাজ তখনই ঘটে, যখন কেউ নীতিহীন কাজে প্রলুব্ধ হয় এবং আর একজন ইচ্ছুক হয় দুর্নীতিপরায়ণ হ'তে। যেমন, একজন ঘুষ দিতে চায় তার কোন কাজ করাতে, আর একজন সেই ঘুষ নিতে রাজি হয়। এক হাতে তালি বাজেনা। প্রশাসনে দাতা ও গ্রহীতা উভয়ে মিলে সৃষ্টি করে অনৈতিক আবহাওয়া। কতকগুলি দপ্তরে যেখানে সোজাসুজি সাধারণ মানুষের সঙ্গে কাজ, সেখানেই ঘুষ নেওয়ার প্রবণতা বেশি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, পুলিশ, আঞ্চলিক যানবাহন সংক্রান্ত কার্যালয়, সেচ, রাজস্ব, বিক্রয় কর এবং পূর্ত বিভাগ।

অসুখ যদি জোরালো হয় তার চিকিৎসার ব্যবস্থাও জোরালো হওয়া চাই। কোন ব্যক্তি দুর্নীতিগ্রস্ত হ'লে তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি চাই। কোন কাজটার নৈতিক সমর্থন আছে আর কোনটা অনৈতিক, তা কোথাও বিস্তৃতভাবে লেখা নেই ঠিকই, তবু প্রচলিত রীতির মানদণ্ডে তুলনা করে দেখলে এবং যে রীতিগুলি কিছু মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত দুইয়ের মধ্যে সীমারেখা সহজেই বোঝা যায়। গোষ্ঠী বা সমাজের ঐকমত্য থেকে নীতি ও আদর্শের বিকাশ। কিন্তু ব্যবহার বা আচরণ ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোন নির্দিষ্ট নির্দেশাবলী নেই, আর সেই সুযোগেই দুষ্কৃতীরা সুবিধা পায়। তারা অস্কার ওয়াইল্ড-এর অভিমতের অনুসরণ করে—লোভ জয় করার সবচেয়ে বড় উপায় হ'ল লোভের কাছে আত্মসমর্পণ করা। "the best way to overcome temptations is to yield to it," নীতিবাক্য যদি অস্পষ্ট, অদৃশ্য ও দুর্বোধ্য হয়, সাধারণ মানুষ আপন স্বার্থে বিভিন্ন পরিস্থিতি তাকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করবে এবং নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার দিকে মন দেবে। তাই ন্যায়পরায়ণতা নির্ভর করে ব্যক্তির ওপর। ন্যায় ও নীতির আদর্শ নির্ভর করে প্রত্যেকটি ব্যক্তির মূল্যবোধের ও মানসিক প্রসারের ওপরে, যা পায় সে তার পরিবেশ থেকে, শৈশবের জীবন ধারা থেকে এবং যে উদাহরণ তার সামনে তুলে ধরেন তার জ্যেষ্ঠ ও গরিষ্ঠ ব্যক্তিরা তার থেকে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে বাড়াতে হবে তার আত্মমর্যাদাবোধ, তাকে আঁকতে হ'বে 'লক্ষ্মণের গণ্ডি-রেখা'* যার বাইরে সে কখনই যাবে না। একজন মানুষের সমস্ত কাজের হিসাবনিকাশের শেষ স্থান হ'ল সে নিজেই।

এককভাবে একজন সরকারী কর্মচারীর কি করা উচিত। সুনাম ও সম্মানের জন্য তার চেষ্টা করা উচিত, অথবা যে কোন উপায়ে উন্নতির জন্য চেষ্টা করা ভালো? নিজের মধ্যে শৃঙ্খলা আনাই জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ। প্রথম থেকেই প্রত্যেকের জীবনে কিছু মূল্যবোধ থাকা চাই, তার সঙ্গে তাকে নিশ্চিত হতে হবে যে, তার আচরণ সন্দেহের অতীত। তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হবে সততা ও উদ্দেশ্যমুখীনতা। তার ভবিষ্যৎ আচরণও যেন অন্যের ধারণার মধ্যে থাকে। সন্দেহ হ'লে সে তার নিজের কাছেই এই ধরনের প্রশ্নগুলি করবে ঃ

* আমি যে কাজটি করতে চলেছি, তা কি একজন যথেষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তি করতে অগ্রসর হবে?
* আমার কাজে কার এবং কি ধরনের ক্ষতি হ'তে পারে?
* বৃহত্তর জনস্বার্থে কি এই কাজ অপারিহার্য? তা যদি হয়, তাহলে এর ক্ষতিকর দিকগুলিকে সহজ করতে কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত? যারা এই কাজের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তাদের কিভাবে সাহায্য করা উচিত?

---

* **পাদটিকা ঃ** লক্ষ্মণের গণ্ডি ঃ রামায়ণের কাহিনীতে আছে—রামচন্দ্রের ভাই অরণ্যবাসের সময় সীতাকে একা রেখে যাওয়ার সময় তার চারিদিকে গণ্ডি এঁকে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন গণ্ডি পার না হতে।

* সরকারী বা আইনগত পরীক্ষায় আমার কাজ কি দাঁড়াতে পারবে?
* এ' কি এমন একটি কাজ যা আমি আমার সন্তানদের অথবা বন্ধুদের করতে নিষেধ করবো?
* আমি কি এমন কাজ করছি যা অন্যরাও আমার প্রতি করুক, তা চাইব না?
* আমি কি খেলার নিয়ম মেনে চলছি—অর্থাৎ আইনের নিয়ম ও লক্ষ্যাভিমুখী থাকা?

ব্যক্তিগত ভাবে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ও শৃঙ্খলারক্ষার অভ্যাস সাধনে প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে সহায়তা দরকার।

প্রথমত, রাজনৈতিক নেতা ও শীর্ষ প্রশাসকদের প্রতিষ্ঠানে সততা ও নিষ্ঠার পরিবেশ সৃষ্টি করার কাজে অগ্রসর হ'তে হ'বে। প্রতিষ্ঠানের এই সততা রক্ষার নীতি প্রত্যেক কর্মচারীকে বারবার নির্ভুল ভাষায় বোঝাতে হবে। কর্মচারীদের জানতে দিতে হবে নৈতিক ক্ষেত্রে বা নীতির প্রশ্নে তাদের কাছে কি চাওয়া হচ্ছে। এ'র জন্য সংগঠনে সতর্ক পরিদর্শনের ব্যবস্থা রাখতে হ'তে পারে।

দ্বিতীয়ত, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির করার সময় বাস্তব সত্যের দিকে লক্ষ রাখতে হবে, দেখতে হবে যে, গৃহীত আদর্শের পথে এই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য কাজ করা সম্ভব হয়।

তৃতীয়ত, এমন একটি আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে হবে যে, প্রত্যেকের আচরণ অন্যের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। এবং যে কোন স্খলনও যেন সহজেই চোখে পড়ে।

চতুর্থত, কোন অনৈতিক আচরণের ঘটনা ঘটলে দ্রুত ও কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে অন্য কেউ তেমন কাজে অগ্রসর না হয়।

পেশাদারী সংস্থা ও প্রশিক্ষণ সংগঠনগুলিকে কাজে নামতে হবে, পেশাদারী কাজের নীতি ও নিয়মাবলী তৈরি করে দিয়ে এবং কর্মীদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করে।

সামাজিক স্তরে অবশ্য আইন আছে কিন্তু আচরণের নীতিবোধ সেই স্তরের ওপরে থাকবে। নিয়োগকর্তা শুধু যে আইনের কথা ধরেই চলবেন, তা নয়, তাকে মনে রাখতে হবে যে, কর্মচারীদের প্রতি তাঁর একটি উচ্চতর নৈতিক দায়িত্ব আছে আইনে যা স্বীকৃত, তার চেয়ে অনেক বেশি।

গণতন্ত্রের নিয়মে শুধু সৎ হওয়াই যথেষ্ট নয়, তোমাকে দেখাতে ও জানাতে হবে যে তুমি সৎ। তা না হ'লে সাধারণের মনে বিচারের ভুল এক হয়ে যেতে পারে উদ্দেশ্যের ভুলের সঙ্গে।

কতকগুলি দেশে ও কিছু মানুষের মনে ধারণা আছে যে, ব্যক্তিগত লাভের

জন্য সরকারী অফিসকে ব্যবহার করায় কোন অন্যায় নেই। ব্যক্তিগত বা দলের জন্য সরকারীপদ ও অফিসকে ব্যবহার করার প্রতি একটি সদয় মনোভাবও দেখা যায়। নাগরিক মনের অজ্ঞতার পাশাপাশি কর্তৃত্বে থাকা উদ্ধতচিত্ত ব্যক্তিদের আচরণ এই ধরনের চিত্তবৃত্তির সৃষ্টি করে। চাকুরির জন্য চাহিদা ও চাকুরির যোগান এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দুর্নীতি ও অন্যকে প্রবঞ্চিত করার প্রবণতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। তপশীলভুক্ত জাতির নিদর্শনপত্র জাল করা, অশিক্ষিত লোককে গাড়ি চালানোর লাইসেন্স দেওয়া, পেশাগত বৃত্তিতে স্থান পাওয়ার জন্য পরীক্ষাপত্রের মার্কস্ বাড়িয়ে দেখানো, এসবই এসেছে সেই দুর্বলতার পথ ধরে। এই সমস্ত কাজই সহায়তা আসে তাদের কাছ থেকে, যারা নিজেদের স্বার্থ পুরণের জন্য নিয়মকে অগ্রাহ্য করে। ইতিহাস প্রমাণ করে, সাম্প্রতিক কালে কয়েকটি দেশের অভিজ্ঞতা থেকেও দেখা গিয়েছে যে, নীতিহীনতার প্রতি এই শিথিল মনোভাব সময়ের গতিতে মারাত্মক হয়ে উঠেছে; যার ফলে উইপোকায় খাওয়া স্তম্ভের মতো এক সময়ে দেশের পুরো প্রশাসন ব্যবস্থাই ভেঙে পড়েছে।

তাই সকল শ্রেণীর মানুষেরই দায়িত্ব—পরিবার, বিদ্যালয়, চাকুরির ক্ষেত্রে ও অভিজাত শ্রেণী-পেশাদারী সমিতি বা সংস্থা, সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে ন্যায় ও নীতির পরিবেশকে গড়ে তুলতে, সুস্থ জীবনবোধ যেখানে অঙ্কুরিত হবে।

ভারতবর্ষে দুর্নীতি দমনের প্রয়াস

দুর্নীতিমূলক কাজের দুটি প্রধান কারণ,—প্রয়োজন ও লোভ। প্রয়োজন শব্দটির কিছুটা সমাধান হয়তো করা যেতে পারে, প্রয়োজন অনুযায়ী বেতন কাঠামো গড়ে দিয়ে (অবশ্য এটা বলা সহজ, কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে করা খুব শক্ত), কিন্তু ভয়জনক অবস্থা সেখানেই, সরকারী কর্মচারীরা যেখানে লোভী।

কে বেশি লোভী, রাজনীতিক না সরকারী চাকুরে? তামিল ভাষায় একটি প্রবাদ আছে, যে, একটি কুয়োর ভেতরে কতটা জল একটি ব্যাঙে পান করতে পারে তা শুধু অনুমানের বিষয়। অনুরূপ, একটি সমাজ কতটা দুর্নীতিগ্রস্ত বা ঠিক কতটা টাকা একটি কাজ করিয়ে দেওয়ার জন্য দেওয়া হয়, এবং কে কার চেয়ে বেশি পাপী, তার সঠিক পরিমাপ করা অত্যন্ত শক্ত। আমরা দেখেছি যে, যেখানে স্ব-ক্ষমতায় কাজ করার সুযোগ বেশি এবং যেখানে সরকারী নিয়ন্ত্রণের বিষয় প্রচুর, সরকারী কর্মচারীদের কাছে সেখানকার জমিই বেশি উর্বরা; ঘুষ তাদের গ্রাস করে।

কৌটিল্যের কথা

'যা পাওয়া গেছে, তাকে পাওয়া যায়নি বলে দেখানো হ'ল, যা সংগ্রহ করা হ'ল, তা এক জিনিস,

আর যা দেখানো হ'ল, তা অন্য জিনিস, একটা জিনিস থেকে যা আদায় করা গেল, তা অন্য এক ক্ষেত্রে দেখানো হ'ল. যা দেওয়ার ছিল. তা দেওয়া হ'ল না, যা দেওয়ার ছিলনা, তাই দেওয়া হ'ল।"[৪]

তাঁর 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন, সরকারের ভূমিকার পরিধি, কর্মচারীদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, এবং উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া পদ, এই সবগুলি দুর্নীতিকে বাড়াতে সাহায্য করে। শান্তনম্ কমিটি-1964, কয়েকটি কারণ লিপিবদ্ধ করেছেন, যা সোজাসুজি দুর্নীতির আবহাওয়াকে বাড়িয়ে দিয়েছে—প্রথম, যুদ্ধের সময়ে এবং দ্বিতীয়, স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে। যেমন, যুদ্ধকালীন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, প্রচুর অভিজ্ঞ কর্মচারীর স্থানে অনভিজ্ঞ ও নতুন প্রোমোশন পাওয়া কর্মচারী, যুদ্ধোত্তর কালে টাকার অবাধ আমদানি এবং তার পাশাপাশি কষ্টকর ও দীর্ঘসূত্রী কার্যপ্রণালী অগণ্য আইনের ঘেরাটোপ; নিয়ন্ত্রণ (controls), লাইসেন্স ও পারমিট; বিভিন্ন স্তরে রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য ছোটাছুটি, 'স্পিড্ মানি'র সুযোগ, অর্থনৈতিক কার্যকলাপের আকস্মিক বৃদ্ধি, রাজস্ব/করের পরিমাপ ও কর আদায়। মাদক দ্রব্যজাত বিপদের সংখ্যা গণনা, ও দুর্নীতির পরিমাপ করা—দুটোই সমান দুঃসাধ্য কাজ। কিন্তু একটা আলগা ধারণা পাওয়া সম্ভব। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে, মন্ত্রীদের দপ্তরে, রাজ্যসরকারের দপ্তরগুলিতে ভিজিলেন্স ইউনিটের হাতে যে অগণিত শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও দুর্নীতিমূলক অপরাধ ধরা পড়ছে, সেগুলিই সংখ্যার গুরুত্ব বিচারের পক্ষে যথেষ্ট।

সরকারী কর্মচারীদের আচরণ অনৈতিক বা অশোভন হ'লে তা স্থির করা হয় সরকারী সার্ভিস কনডাক্ট-এর নিয়ম অনুযায়ী কনডাক্ট রুলস লঙঘন করলে। প্রমাণ করা শক্ত বলে অনেককে আদৌ ধরা যায় না। শান্তনম্ কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী সেন্ট্রাল ভিজিলেন্স কমিশন স্থগিত হয়েছে যদিও তার কোন নিয়মতান্ত্রিক স্বীকৃতি নেই।

1966 সালের জানুয়ারি মাসে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর অধীনে সরকারী কর্মচারী ও মন্ত্রীদের অভিযোগের তদারকের জন্য 'কমিশন ফর পাবলিক গ্রিভান্সেস' (Commossion for Public Grievances) স্থাপিত হয়। 1967 সালে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস্ কমিশনের প্রস্তাবে 'ওমবাড্স্ম্যান' স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হ'লে পাবলিক গ্রিভান্সেস্ কমিশন উঠে যায়। ভারতবর্ষে দুর্নীতি রোধের জন্য অন্যান্য ব্যবস্থার সঙ্গে Preventive of Corruption Act-1947 (1988 সালে সংশোধিত) বিধিবদ্ধ হয়ে আছে। ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের 167 নম্বর সেকশনে দুর্নীতির অপরাধের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারী কর্মচারীর ব্যাখ্যা পেনাল কোডের 21 নম্বর সেকসনে দেওয়া রয়েছে এইভাবে ঃ

"সরকারী কর্মচারী হয়ে, যদি কেউ কোন কাজের জন্য পুরস্কার গ্রহণ করে, বা পায়, বা গ্রহণ করতে স্বীকৃত হয়, বা গ্রহণ করার চেষ্টা করে যে পুরস্কার আইন-সম্মত কোন পারিশ্রমিক নয়, এবং

তার উদ্দেশ্য যদি হয় কোন সরকারী কাজ করা, বা করতে রাজি হওয়া, ... তার অফিস সংক্রান্ত কাজের প্রক্রিয়ায় যদি কোন ব্যক্তিকে বিশেষ আনুকূল্য দেয়, অথবা দুর্ব্যবহার করে—এবং যদি সে ব্যক্তি কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্যসরকার, লোকসভা বা বিধানসভা অথবা কোন সরকারী কর্মচারী হয় ...."

1947-এর দুর্নীতি নিরোধ আইনের 5 নম্বর ধারায় দুর্নীতিগ্রস্তদের পাঁচটি বিশেষত্বের বর্ণনা আছে।

1) পুরস্কার গ্রহণে অভ্যস্ত
2) কাজ করে দেওয়ার বিনিময়ে মূল্যবান দ্রব্য গ্রহণ করা
3) অর্থ আত্মসাৎ করা
4) পদাধিকারের বলে আর্থিক সুবিধালাভ
5) আয়ের সঙ্গে সঙ্গতি নেই এমন সম্পত্তির অধিকার লাভ

শান্তনম্ কমিটিতে ছিলেন কে. শান্তনম্ ও আরও সাতজন এম. পি.। 1964 সালে প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী এই কমিটি স্থাপন করেন। উদ্দেশ্য, দুর্নীতির সমস্যার পুনঃ পরীক্ষা করা এবং যে সব পদ্ধতি ও কর্মপন্থা আছে সেগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য কমিটির অভিমত জানা। দুর্নীতিকে বর্ণনা করা হয়েছে—সরকারী অফিসে বা বিশেষ পদে অধিষ্ঠিত থাকার সুবাদে ক্ষমতা ও প্রভাবের অনুচিত ও স্বার্থজড়িত ব্যবহার।

কমিটির অভিমত,—প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতিকে আরও সরল করার প্রয়োজন আছে, যাতে কমানো যায় কর ফাঁকি দেওয়া, ইনভয়েসে মূল্য কম করে দেখানোর চেষ্টা, মজুত করার চেষ্টা ও চোরাকারবারি ও অর্থসংক্রান্ত আইন ফাঁকি দেওয়া। সম্প্রতি শেয়ার বাজারে যে নীতিহীন কার্যকলাপের প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে তা থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, কার্যপ্রণালী ও নিয়মাবলীকে সরল ও সহজ করা দরকার।

চল্লিশের দশকে সৃষ্ট বিশেষ পুলিশ সংস্থা 1963 সালে স্থাপিত সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (CBI) সঙ্গে মিশে গিয়েছে। 1953 সালে রেলওয়ে করাপশন এনকোয়ারি কমিশন গঠন করা হয়। সর্বভারতীয় চাকুরির ক্ষেত্রে (1954) আচরণ বিধি রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে সেন্ট্রাল সিভিল সার্ভিসেস্ (1955) ও রেলওয়ে সার্ভিসেস (1956)। স্বাধীনতার আগেও আইন ছিল ধার দেওয়া ও নেওয়ার, দান গ্রহণের, গৃহ কেনা ও বিক্রি করার ওপরে, মূল্যবান সম্পত্তি কেনা ও বিক্রির ওপরে, যদি তার সঙ্গে জড়িত থাকত আর্থিক বন্দোবস্ত যার দ্বারা অন্যলোক লাভবান হবে। আইন ছিল ফাটকা বাজারের কেনাবেচার ওপরে, কোম্পানী (আইনের দ্বারা গঠিত সংস্থা) তৈরি ও তার ব্যবস্থাপনা, বেসরকারী

ব্যবসা ও চাকুরি দেওয়া, চাঁদা তোলা এবং অবসর গ্রহণের পর বাণিজ্যিক সংগঠনে চাকরি নেওয়া সম্পর্কে।

স্বাধীনতার পর এগুলিকে নতুন করে সাজাতে হয়েছে। সাধারণ নীতি যা গ্রহণ করা হয়েছিল, তা হ'ল যে, সরকারী ক্ষেত্রে সচিব ও বিভাগীয় প্রধানের প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল দপ্তরের সততা, ন্যায়নিষ্ঠা ও কর্মযোগ্যতা রক্ষার। এই ভাবে নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আধিকারিকের হাতে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে শান্তনম্ কমিটির একটি সুপারিশ ছিল যে, কোন সরকারী কর্মচারীকে অবসর গ্রহণের পর, দু'বছরের মধ্যে কোন বেসরকারী বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে চাকুরি নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। যাদের কাছে কাজ পাওয়া যায় না, এমন কর্মচারীদের, যদি তাদের বয়স 50 হয়ে থাকে, অথবা 25 বছরের চাকুরি জীবন (যেটাই আগে হবে) তবে তাদের কোন কারণ না দেখিয়ে এবং কোন ক্ষতিপূরণ না দিয়ে অবসর গ্রহণ করানো যাবে। আর একটি পর্যায়ে 55 বছর বয়সে (অথবা 30 বছর চাকুরির পর) তিন মাসের নোটিশ দিয়ে কর্মচারীদের অবসর গ্রহণে বাধ্য করানো যাবে।

কমিটির সুপারিশ যে, প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা হিসাবে, যে সব পর্যায়ে আধিকারিকেরা স্ব ক্ষমতায় সিদ্ধান্ত নিতে পারেন অথবা সাধারণ মানুষের সঙ্গে সোজাসুজি যাঁদের কাজ, তাঁদের মধ্যে দায়িত্বশীলতার বোধ সৃষ্টি করা। স্ব বিবেচনায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োগ কিভাবে হয়। সেদিকেও লক্ষ রাখতে হবে। বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি ও তাদের প্রতিনিধিরা অনুচিত কাজের অভ্যাসগুলিকে প্রশ্রয় দেবেনা। তাদের নিজেদের মধ্যেও আচরণ-বিধি থাকা উচিত। দুর্নীতি সৃষ্টির কিছু কিছু কারণ দূর করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, যেমন, প্রশাসনের কাছে অথবা বিলম্ব, যে কাজ তারা সম্পাদন করতে পারে তার চেয়ে বেশি কাজ হাতে নেওয়া, (যার ফলে অত্যন্ত বেশি নিয়ন্ত্রণ আসছে, স্ব-বিবেচনায় কাজের পরিধিও কমে যাচ্ছে), নিয়মাবলী সহজ করে দিয়ে দালাল ও মধ্যবর্তীদের সরিয়ে দেওয়া, পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের কাজে নিযুক্ত আধিকারিকদের বেতন বৃদ্ধি করা, কর্মীদের জন্য আবাস নির্মাণ (যেমন রেলওয়েতে করা হয়), সন্দেহভাজন চরিত্রের লোকগুলিকে সরিয়ে দেওয়া এবং প্রয়োজনীয় ফর্ম ও কাগজপত্র পাওয়ার ব্যাপারটাকে সহজ করা। সবার উপরে শাসনব্যবস্থাকে স্বচ্ছ ও যুক্ত করে রাখা দরকার।

কতকগুলি দপ্তর সম্বন্ধে 'কমিটির' কিছু নির্দিষ্ট সুপারিশ ছিল, বিশেষভাবে যেসব দপ্তরে তাদের কাজের প্রকৃতির জন্য দুর্নীতির প্রবেশ সহজ ছিল। যেমন; ডিরেক্টরেট জেনারেল অব সাপ্লাইজ অ্যান্ড ডিসপোজালস্, ডিরেক্টরেট জেনারেল অব টেকনিক্যাল এডুকেশন, ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্স্পোর্ট অর্গানাইজেশন্স্, সেন্ট্রাল

পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট, কাস্টমস অ্যান্ড সেন্ট্রাল এক্সাইজ, ইনকামট্যাক্স অ্যান্ড সেন্ট্রাল কর্পোরেট আন্ডারটেকিংস। ভিজিলেন্স বিভাগের কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণেব সুপারিশও করা হয়েছে।

কেরলের মত কয়েকটি রাজ্যে কাজের বিলম্ব কমাবার জন্য বিশেষ পরিকল্পনা নিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে। যেমন, 'ফাইল টু ফিল্ড' কর্মসূচি। আগে থেকে যোগাযোগ করে নির্দিষ্ট দিনে প্রশাসক গ্রামে যান অভিযোগ শুনতে। যেখানে সম্ভব, সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সাধারণ মানুষের জন্য এই কার্যসূচি, অনেকটা গ্রাম্য মেলার রূপ ধারণ করে। অনেক লোক এসে জমে এবং কিছু সাধারণ কাজ যা' চিঠিপত্রে অনেক বিলম্বিত হয়, তা সঙ্গে সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

'শান্তনম্ কমিটিকে' কাজের যে শর্তগুলির উল্লেখ করা হয়েছিল, তার সবচেয়ে বড় ত্রুটি যে, 'কমিটি' রাজনৈতিক স্তরে দুর্নীতির ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে পারে নি। তবু 'কমিটি' মন্ত্রীদের আচরণ-বিধি এবং জাতীয়স্তরে একটি তালিকা তৈরি করার কথা বলেছে, মন্ত্রীস্তরে দুর্নীতির তদন্তের জন্য। সংসদের ও বিধানসভার সদস্যদের জন্য অবিমিশ্র সততার প্রয়োজনের কথাও 'কমিটি' বলেছে। রাজনৈতিক দলগুলি আয় ও ব্যয়ের ও সংগৃহীত অর্থের সঠিক হিসাব রাখবে এ'কথাও বলা হয়েছে। নিয়মিত হিসাব রাখাই শুধু নয়, সে হিসাবের বিবরণ প্রকাশ করে দেখানো দরকার। দুর্নীতির অপসারণের জন্য সংবাদপত্র, সাধারণের সংগঠনগুলি ও সাধারণ মানুষের অভিমত একত্র করে একটি পরিবেশ রচনা করার প্রয়োজনের ওপরেও জোর দিয়েছে 'কমিটি'। আঞ্চলিক স্ব-শাসিত শাসন কর্তৃপক্ষ তাদের প্রশাসনের এলাকা ক্ষুদ্র হওয়ায় কিছু ব্যবস্থা নিতে পারতো। সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতিরোধের সবচেয়ে বড় উপায় হ'ল সাধারণ মানুষের সতর্ক প্রহরা।

দুর্নীতি ও অপচারমূলক কাজ কোন একটি দেশের একচেটিয়া অধিকারে নেই। সোজাসুজি এ'কথা বলা যায় না, যে একটি দেশের চেয়ে আর একটি দেশ দুর্নীতির পথে বেশি এগিয়ে আছে। কিন্তু দুর্নীতি দমন ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার পদ্ধতি ও ব্যবস্থা সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করা চলে। ফ্রান্সে প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগের দ্রুত বিচারের জন্য প্রশাসনিক আদালত রয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়ার প্রোকিউরেটর জেনারেল ও রিজিওনাল ও এরিয়া-অ্যাসিস্ট্যান্টদের কথা সকলেই জানে। দুর্নীতি দমন সম্পর্কিত আইন রয়েছে ইউনাইটেড কিংডম, ইউ. এস. এ., পাকিস্তান, কানাডা, মায়ানমার, ঘানা ও ফ্রান্সে। স্ক্যানডিনেভিয়ান দেশগুলিতে 'ওমবাডসম্যান' রয়েছে। ভারতবর্ষে সরকারী কর্মচারীদের অভিযোগের বিচারের জন্য এবং বিচারের কাজের দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল রয়েছে। এ'র ফলে আধিকারিকদের নৈতিক শক্তিও বৃদ্ধি পাবে।

The Ombudsman

ভারতবর্ষে দি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফরমস্ কমিশন (1968) প্রহরীর কাজ করে যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেছে। কেন্দ্রে 'লোকপাল' (যাকে অতি-ওমবাডসম্যান বলা চলবে) নিয়োগের প্রস্তাব রয়েছে। যার অধিকার-ক্ষেত্র কেন্দ্র ও রাজ্যের মন্ত্রীদের ও তাঁদের সচিবদের ওপরেও। প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশে লোকপাল নিয়োগ করবেন রাষ্ট্রপতি। অনুরূপভাবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্যেও 'লোকযুক্ত' নিযুক্ত করবেন রাষ্ট্রপতি। লোকপাল ও লোকযুক্তর বাধ্যবাধকতা শুধু রাষ্ট্রপতি ও লোকসভা বা বিধানসভা। তবু এখন পর্যন্ত এ'বিষয়ে কিছু হয়েছে বলে জানা যায় নি যেটুকু হয়েছে তা হ'ল, যে, কয়েকটি রাজ্য লোকযুক্ত'র একটি সংশোধিত রূপকে গ্রহণ করেছে। 1972, 1973, 1977 ও 1981 সালে মহারাষ্ট্র, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ 'লোকযুক্ত' প্রসঙ্গে একটি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। মহারাষ্ট্রের পরিকল্পনায় লোকযুক্ত মন্ত্রী ও সচিবদের বিরুদ্ধে অভিযোগের ব্যাপারগুলি দেখবেন, আর একজন উপ-লোকযুক্ত সচিবদের নিচের স্তরের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি দেখবেন।

ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের পূর্বসূরীদের আভিজাত্য ও শ্রেষ্ঠত্ববোধ যারা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে সেই আমলাতন্ত্রের মনোভাব এবং দেশের দ্রুত উন্নয়ন প্রকল্পগুলির দ্রুত ও সফল রূপায়ণের সংবাদ দেওয়ার জন্য চাপ এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছে যা খুব আশাপ্রদ নয়, এবং সর্বত্র একরূপও নয়। যার ফলে অন্যায় ও অবিচার দেখা দিয়েছে। দেশের লোক যেখানে অশিক্ষিত ও অজ্ঞ, যারা নিজেদের অধিকার কতটুকু জানেনা, এবং কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার ভয়ে যারা ভীত, সেখানে এমনটা হ'তেই পারে।

এইভাবে দুর্নীতি ও দায়িত্ব সম্পর্কে বাধ্যবাধকতা অত্যন্ত জটিল সমস্যা হয়ে উঠেছে। দুর্নীতির শুঁড় এখন চারিদিকে ছড়িয়ে গিয়েছে , জীবনের সর্বত্র তার স্পর্শ। আমেরিকায় সম্প্রতি একটি চিন্তা দেখা দিয়েছে—প্রাচীন আদর্শে ফিরে যাওয়া। সেই সব দিনের নিখাদ মূল্যবোধ ও অনমনীয় নৈতিক চরিত্রের কিছু কিছু যদি আবার ফিরে আসে—প্রত্যেক দেশকে এখন এই চিন্তা নিয়েই আত্মবিশ্লেষণে বসতে হ'বে।

যোগ্যতা ও নীতিবোধ একই সঙ্গে থাকে, এই বোধ বৃদ্ধি পাবে যখন দায়িত্ব সম্বন্ধে তারা সচেতন হবে, যখন জানবে যে, হিসাব নিকাশ দেওয়ার বাধ্যবাধকতা এমন একটা জিনিস নয়, যা থেকে সরকারী কর্মচারীরা সহজেই পালিয়ে যেতে পারবে। জন ডেলাফন্স্ তাঁর একটি নিবন্ধে Whitehall Changes in Public Administration-এ বলেছেন—

> কর্মপদ্ধতিতে কোন পরিবর্তন করার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে পরিবেশে সরকারী কর্মচারী কাজ করে. তার ধারণা ও চিন্তাধারার পরিবর্তন এবং যে শাসন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত সে, তার

প্রতি ঐ কর্মচারীর মনোভাবেরও পরিবর্তন। যদি কোন পরিবর্তন থাকে যা 'হোয়াইট হলে'র কাজের পরিবেশকে বদলে দিয়েছে গত ত্রিশ বছরে, এবং যা বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য, আমি বলবো যে, তা হ'ল, অনুসন্ধান, উদ্‌ঘাটন ও প্রশ্ন করা যা এখন প্রত্যেকটি কাজের সঙ্গে যুক্ত। আমি এই প্রসঙ্গে বলবো যে, ত্রিশ বছর আগে যা ছিল সে তুলনায় হোয়াইট হলের এখনকার যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ অনেকবেশি বলে মনে হয়েছে ... বিরুদ্ধতা গত দশ বছরে অনেক বেশি বেড়েছে। এই দুটি ধারার মধ্যে কিছুটা মিল ঘটেছে। অবিশ্বাস ও বিরুদ্ধ মনোভাব থেকেই দাবি ওঠে আরও কঠোর অনুসন্ধানের, এবং যে কোন বাধা সেই সন্দেহকেই বাড়িয়ে দেয়; মনের মধ্যে ধারণার সৃষ্টি হয় যে, হয় কিছু আছে যা' লুকিয়ে রাখার মতো, অথবা, হয়তো আরও খারাপ, লুকোবার কিছু নেই—"ওরা জানে না, ওরা কি করছে।"[৭]

সবশেষের কথা, সাধারণ মানুষের তৎপরতা সতর্ক প্রহরা প্রশাসকদের বাধ্য করবে উঠে বসতে; পরিচ্ছন্ন ও সৎ হ'তে, কাজের সময় ন্যায়ের পথ ধরে চলতে। এই অবস্থায় আসতে অনেক সময় নেবে সেই সব দেশ, যেখানে ছিল ঔপনিবেশিক শাসন। কারণ, সাধারণ মানুষকে শেখানো হয়েছে সরকার যা দিচ্ছে তাই গ্রহণ করতে। তা না হ'লে দৃষ্টি সরিয়ে উদাসীন হ'তে। এই লোকগুলিকেই গভর্নমেন্ট পরিবর্তনের পথে নিয়ে যাচ্ছে তার নিজের গতিতে। সম্ভবত কোন অসাধারণ অবস্থার প্রয়োজন, যাতে এই লোকগুলিকে ঝাঁকানি দিয়ে কাজে নামানো যায়, শেখানো যায় যে মাটিতে পড়ে থাকলেই দ্রব্য কুড়িয়ে নিতে নেই, এবং বলানো যায়, যে সরকারী কর্মচারীরাও সেবা দিতে জানে। হয়তো যুগের পরিবর্তন হবে সে অবস্থায় আসতে।

আশার কথা এই যে, কিছু তরুণ রাজনৈতিক নেতা ও সরকারী প্রশাসককে পাওয়া যাচ্ছে যাঁদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা যে, তাঁরা একটি সৎ ও যোগ্যতা-সম্পন্ন শাসন ব্যবস্থাকে তুলে ধরবেন যাঁরা হালকাভাবে চলার পথ ছেড়ে কাজ সম্পূর্ণ করার নীতিগুলিকে তুলে ধরবেন।

ছয়

সরকারী প্রশাসনে মনোবল ও কাজের নৈতিকতা

স্বাধীন ভারতবর্ষের কর্মধারা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি শক্তিশালী প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে, সর্দার প্যাটেলের এই অভিমত অনেক বিতর্কের পর সংসদে গৃহীত হয়। সংবিধানের চতুর্দশ খণ্ডে প্রথম অধ্যায়ের 312 নম্বর ধারা সংবিধানে সংযোজিত হয় ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস (IAS) ও ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসকে (IPS) আইনগ্রাহ্য করতে। এই দুটি হল প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের আই. সি. এস. ও ইন্ডিয়ান পুলিশের উত্তরাধিকারী। রাজ্য সরকারে চাকুরির (Slate Service, Art 310) মত এই চাকুরিগুলিও স্থায়ী ও নিরাপদ। কোন বড় শাস্তি, যেমন, বরখাস্ত করা, পদমর্যাদার হানি করা বা অন্যপদে সরিয়ে দেওয়া (এই চাকুরিগুলিতে যারা কর্মরত তাদের বিরুদ্ধে) এই ধরনের কোন শাস্তি যাঁর হাতে এদের নিয়োগ তাঁর নিচের পদের কেউ দিতে পারবেন না। (Art 311)

স্থায়িত্বের শর্ত ও অন্যান্য দিকগুলি, যেমন, চাকুরির জন্য নির্বাচন, প্রশিক্ষণ ও কর্মের বিচার ও মূল্যায়ন সরকারী কর্মচারীদের মনোবল ও নৈতিকতা তৈরি করে দেয়। সর্বভারতীয় চাকুরিগুলি এই বৈচিত্র্যে ভরা দেশে সমরূপের প্রবর্তনকারী শক্তি। এই চাকুরির সদস্যদের কেন্দ্র থেকেই নির্বাচন করা হয় কিন্তু রাজ্য কর্মচারীদের সঙ্গে তাদের সংগঠিত হ'তে হয়। সমস্ত দেশ থেকে শ্রেষ্ঠ মেধার সন্ধান করাই এর উদ্দেশ্য। চাকুরির মোট পদের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ সংরক্ষিত রাখা হয় রাজ্যস্তরে কর্মচারী ও পুলিশ সার্ভিস থেকে পদোন্নতির জন্য। সর্বভারতীয় চাকুরিতে প্রত্যেক রাজ্যের জন্য একটি নির্দিষ্ট অংশ (Quota) রাখা থাকে, কেন্দ্রে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উচ্চতর পদে রাজ্যের প্রতিনিধি রূপে আনা হয় মনোনীত ব্যক্তিকে। নির্দিষ্ট সময়ের অবসানে ঐ ব্যক্তিকে আবার রাজ্যে ফেরত দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় চাকুরির এই Quota রাজ্য ক্যাডারের শক্তির অনুপাতে ঠিক করা হয়। ব্রিটিশ শাসনের সময়েও এই পদ্ধতি (tenure system) চালু ছিল। এই পদ্ধতির ত্রিমুখী উদ্দেশ্য ঃ

1) জেলা সমাহর্তা ও প্রাদেশিক আধিকারিকেরা একই পদে অধিষ্ঠিত থেকে যখন একঘেয়েমিতে ভুগতো, তখন একটু পরিবর্তন
2) কেন্দ্রে নতুন রক্তের প্রয়োজন হ'ত, এবং তারজন্য এই পরিবর্তন
3) সিভিল সার্ভিসের সকল সদস্যরা অংশ নিতে পারতো সেই পদের যেটা তাদের কাছে 'পুরস্কার' বলে মনে হ'ত।

সর্বভারতীয় চাকুরির জন্য আইন (All India Services Act) বিধিবদ্ধ হ'ল সংসদে। কেন্দ্রীয় সরকারকে আইন যে ক্ষমতা দিল তারই বলে ছুটি, শৃঙ্খলা, আচরণ প্রভৃতি বিষয়ে নিয়মাবলীও তৈরি হ'ল।

এই চাকুরির পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য কেন্দ্রকে কর্তৃত্ব দেওয়ার পদ্ধতিতে রাজ্যের শাসনক্ষমতায় হস্তক্ষেপের উপাদান থাকায় রাজ্যসভার (Council of States) সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশের সম্মতির প্রয়োজন ছিল। একই ভাবে অন্যান্য সর্বভারতীয় চাকুরির সৃষ্টি। (Art.312(1))

সর্বভারতীয় চাকুরির ক্ষেত্রগুলিতে রয়েছে নিরাপত্তা ও নিশ্চিত ভবিষ্যৎ; এগুলির অভাব যাতে কাজের সুসম্পন্নতার পথে না দাঁড়ায়। এই চাকুরির নিয়মাবলীতে নিশ্চয়তা রয়েছে নিরপেক্ষতা, ন্যায়নীতি, লক্ষ্যমুখীনতা ও সততার। প্রত্যেকটি রাজ্যে যে আধিকারিকদের পাঠানো হয়, তার পঞ্চাশ শতাংশ থাকে অন্যরাজ্য থেকে, যাদের মধ্যে পক্ষপাতশূন্যতা ও সততা আশা করা যায়।

নব্বইয়ের দশকের আরম্ভে তিনটি সর্বভারতীয় চাকুরি এবং ত্রিশটিরও বেশি কেন্দ্রীয় চাকুরি, যার মধ্যে ইন্ডিয়ান অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিসেস, ইন্ডিয়ান ডিফেন্স্ অ্যাকাউন্ট্স্ সার্ভিসেস, ইন্ডিয়ান পোস্টাল সার্ভিসেস, ইন্ডিয়ান রেভিন্যু সার্ভিস, ইন্ডিয়ান ইকনমিক সার্ভিস ইত্যাদি পড়ে। এই চাকুরিতে কর্মী নির্বাচন করা হয় একটি প্রচলিত পরীক্ষার দ্বারা (যা সিভিল সার্ভিস এগ্জামিনেশন্ নামে খ্যাত)। পরীক্ষা গ্রহণ করে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন; পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নাম মেধা অনুসারে শ্রেণীভুক্ত করা হয়। প্রার্থীদের জানাতে হয় কোন চাকুরির ক্ষেত্রে তার আগ্রহ বেশি, এবং কোন রাজ্যে সে যেতে ইচ্ছুক। 21 থেকে 28 বছর বয়সের মধ্যে চারবার সুযোগ দেওয়া হয়। তপশিলী জাতি ও উপজাতির জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা আছে। প্রশ্নপত্রের উত্তর ইংরাজিতে , হিন্দিতে অথবা সংবিধানের অষ্টম তালিকার অন্তর্ভুক্ত যে কোন ভাষায় দেওয়া যায়।

রাজ্যের সরকারী চাকুরিতেও একই নীতিতে নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব এবং প্রার্থী নির্বাচনও একই ভাবে স্টেট পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে।

সংবিধানের 2য় অধ্যায়ে (Chapter II of part XIV) বিধান রয়েছে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন (UPSC) এবং স্টেট পাবলিক সার্ভিস কমিশন (PSC) (Art 315)-এর বিষয়ে। কমিশনগুলির স্বাধীনতা ও স্বকর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার

জন্য এবং সততার সঙ্গে কাজের সুযোগের জন্য UPSC অথবা রাজ্য P.S.C.-র চেয়ারম্যান ও সদস্যরা কমিশনের সদস্য পদত্যাগের পর কোন সরকারী পদে (ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট বা রাজ্য সরকার) নিযুক্ত হ'তে পারবে না। (Art 319)

এই নির্বাচক পর্ষদের পরামর্শ নিতে হবে নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলির ব্যাপারে ঃ

1. সরকারী চাকুরি ও সরকারী পদে নিয়োগসংক্রান্ত (পদ্ধতিগত) সকল ব্যাপারে।
2. সরকারী চাকুরি ও সরকারী পদে নিয়োগের জন্য পদোন্নতির জন্য, একটি চাকুরি থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করার জন্য (transfer) এবং ঐ ভাবে নিয়োগের ব্যাপারে পদপ্রার্থীদের যোগ্যতা বিচারের নীতি ও নিয়মাবলী সংক্রান্ত ব্যাপারে।
3. ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারের অধীনে অসামরিক বিভাগে কর্মরত ব্যক্তিদের শৃঙ্খলা রক্ষা ঘটিত ব্যাপারে এবং ঐ সংক্রান্ত আবেদন বা স্মারক পত্র সংক্রান্ত ব্যাপারে।
4. ভারত সরকার, রাজ্য সরকার অথবা ভারত সরকারের অধীনে থাকা কোন রাজ্যের অধীনে অসামরিক বিভাগে কর্মরত কোন ব্যক্তির বা ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে কোন দাবি—ঐ ব্যক্তির চাকরির সুবাদে তার সরকারী কাজের সম্পাদনে যদি কোন আদালতের মামলায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজনে ব্যয় হয়ে থাকে, তবে সেই ব্যক্তির সমস্ত ব্যয়ের টাকা ভারত সরকারের বা রাজ্য সরকারের কনসোলিডেটেড ফান্ড থেকে দেওয়ার ঔচিত্য বিষয়ে।
5. ভারত সরকার বা রাজ্য সরকার অথবা ভারত সরকারের আশ্রিত কোন রাজ্যে কর্মরত অবস্থায় কোন সরকারী চাকুরে আঘাতপ্রাপ্ত হ'লে তার পেনশন পাওয়ার দাবি এবং সেই পেনশন বা কোন অনুদানের অর্থের পরিমাণ নির্ধারণের ব্যাপারে। (Art. 320[3])

মানবশক্তির প্রয়োজন নির্ধারণ ও পরিকল্পনার সঙ্গে কর্মী উন্নয়ন ব্যবস্থার আরম্ভ। কখনও কখনও এই প্রক্রিয়ায় দুরাত্মারও আবির্ভাব ঘটে। আগেই বলা হয়েছে যে, মাঝে মাঝে গভর্নমেন্টকে তার লক্ষ্যপথের দিকে অগ্রসর হ'তে গিয়ে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। আর্থিক ক্ষতি হ'লেও তা যদি সামাজিক প্রয়োজন কিছুটা মেটায়। যেমন, চাকরির সবচেয়ে নিচের শ্রেণীতে অনেক লোক নেওয়া হ'ল; উদ্দেশ্য, তাদের উপযুক্ত কাজ না থাকলেও আর্থিক অসঙ্গতি আছে এমন অনেক লোককে চাকরি দেওয়া গেল। যখন হসপিটালের মতন জায়গায় কাজ না জানা লোকের অভাব, এমন হ'তে পারে যে সেখানে আর লোক নেওয়া হচ্ছে না, যে অফিসে কর্মচারীর সংখ্যা অনেক, সেখানে, যদি আরও কর্মচারী নেওয়া হয়, তা

হ'লে কর্মচারীদের উন্নয়নের পথে সমস্যা দেখা দেয়। অনেক রাজ্য বাধ্য হয়, প্রয়োজন না থাকলেও সর্বভারতীয় চাকুরির ক্ষেত্র থেকে আধিকারিক গ্রহণ করতে, যার ফলে সমস্যা দেখা দেয়।

কাজের অনেকগুলি শ্রেণীর জন্য কি ধরনের যোগ্যতা থাকা দরকার তা বলা থাকে না। শিক্ষাগত গুণ নির্দিষ্ট করা থাকলে যখন পদের তুলনায় গুণ খুব বেশি বা খুব কম হ'লে সমস্যা জাগে। আবার যখন শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেড়ে যায়, তখন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরাও সেই সব চাকরির জন্য অবেদন করতে পারে, যেখানে অল্প শিক্ষিত ব্যক্তির প্রয়োজন। এই রকম চাকরিতে অতিরিক্ত শিক্ষাগত গুণের জন্য হতাশা ও ব্যর্থতা বোধ জাগে। তখন তাদের অনেকেই সময় কাটায় কাগজে চাকরির বিজ্ঞাপন খুঁজে খুঁজে।

সরকারী চাকরিতে লোক নেওয়া ও লোককে বরখাস্ত করা দুটোই দীর্ঘসূত্রী ব্যাপার। এমন কিছু নিয়ম কোথাও নেই যে, প্রথম যে আসে, তাকেই প্রথমে যেতে হবে (FIFO -first in first out) অথবা যে শেষে এসেছে তাকেই আগে যেতে হবে (LIFO) কখনও কখনও শূন্যস্থানে অস্থায়ীভাবে লোক নেওয়া হয়, আর সেই লোক বছরের পর বছর অস্থায়ী হ'য়েই থাকে। কাজেব দায়িত্বের সঙ্গে নিরাপত্তার বোধ কিছুটা কম হ'লে, চাকুরির ক্ষেত্রে সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে কাজ করে। কিন্তু চাকুরি সারাজীবন যদি অস্থায়ী থাকে তাহ'লে কাজের গতিও মন্থর হয়ে থাকে।

সরকারী চাকুরিতে লোক নেওয়ার কাজ প্রায় সারা বছর ধরেই চলে আর পাবলিক সার্ভিস কমিশনেই সে কাজ করে। প্রত্যেক বছরেই বিভিন্ন পদে প্রচুর সংখ্যায় লোক নিয়োগ করতে হয়। কতকগুলি পদে প্রার্থী নির্বাচনের জন্য কমিশন পরীক্ষা গ্রহণ করে। সাধারণ ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লোক নেওয়া উচিত। প্রার্থী নির্বাচন পেশাদারী দৃষ্টিতে করা সবসময়েই ভালো। আবার প্রার্থী নির্বাচনের সংখ্যা কখনও কখনও এত বেশি হ'য়ে যায় যে, নির্বাচিতদের উপযোগী পদের সংখ্যা কম হওয়ায় তাদের কাজ দেওয়া যায় না। যখন তাদের কাজে যোগ দেওয়ার জন্য ডাকা হয় তখন হয়তো কাজের ধরন বদলে গেছে। যাদের নেওয়া হয়েছে, তাদের কোনরকমে কোথাও বসাতে হবে। কি করে তাহ'লে নিশ্চিত হওয়া যাবে যে, সঠিক কাজের জন্য সঠিক লোককে দেওয়া হ'ল।

সমস্তর থেকে নিয়ে এসে যখন মিলিয়ে দেওয়া হয়, তখন পদের উচ্চতা বিচার ও পদমর্যাদার সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন কিংবা মাদ্রাজ থেকে অথবা প্রাক্তন দেশীয় রাজ্যের রাজকীয় চাকরি থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বভারতীয় চাকরিতে আনা হয়—উদ্দেশ্য চাকুরির ক্ষেত্রে অখণ্ডতা বোধ দেওয়া। সরকারী চাকুরিতে জ্যেষ্ঠত্ব বা পদের উচ্চতার মর্যাদা ও অভিজ্ঞতার মূল্য গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয় এবং কর্মযোগ্যতার পরিমাপ করা হয়, বার্ষিক গোপন

রিপোর্টে (annual confidential report) অথচ উচ্চতর পদে উন্নত করার সময় দেখা হয়না যে, সেই ব্যক্তি ঐ বিশেষ পদের উপযুক্ত কিনা। কিছু দূর পর্যন্ত চাকুরিতে সময়ের দৈর্ঘ্য (Seniority) পদোন্নতির মূল ভিত্তি। কোন কোন রাজ্যে যেখানে কোন কর্মী সম্বন্ধে প্রতিবেদন গোপনীয় হয়না, এবং রিপোর্টের কিছু অংশ সংশ্লিষ্ট কর্মীকে দেখাতে হয়; অত্যন্ত সৎ ব্যক্তিও তার অধীনস্থ কর্মচারীর দুর্বলতাকে ঢেকে রেখে ভালো রিপোর্ট লিখে দেয়, যাতে কর্মচারীদের সহযোগিতা পেতে কোন অসুবিধা না হয়। দু'রকম রিপোর্টে কোন উদ্দেশ্য সাধিত হয়না। কয়েকটি স্তর পর্যন্ত কর্মীদের সম্বন্ধে গোপনীয় প্রতিবেদন না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। তার দ্বারা অনেক কাগজ ও সময় বাঁচবে। কাজ সম্বন্ধে ভুল রিপোর্ট দিতে যে সময় লাগে, সে সময়টা নষ্ট হ'ল বলা চলে।

উচ্চতর স্তরে, এবং উচ্চতর পদে নিয়োগের সময়ে এই রিপোর্টের প্রয়োজন আছে; যে কর্মচারী সম্বন্ধে রিপোর্ট লেখা হ'ল, তার জানার সম্ভাবনা থাকেনা কি লেখা হ'ল তার সম্বন্ধে। অনেক ক্ষেত্রে 'outstanding' (বিশেষভাবে উল্লেখ্য) শব্দটি লেখা না থাকার জন্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের উচ্চতর পদে যাওয়ার সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তার জন্য আর কোন আবেদন বা প্রতিকারের সুযোগ থাকেনা। একই সঙ্গে উদাহরণ দেখানো যায়, যে, সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে যাদের অতীত অস্পষ্ট, তাদের নামও সর্বোচ্চস্তরে প্রোমোশনের জন্য তালিকাভুক্ত।

যাদের উপেক্ষা করা হয়েছে, তাদের অনায়াসেই বোঝানো যেতে পারে যে, উচ্চতর পদটি হ'ল মনোনীত ব্যক্তির জন্য, আর মনোনয়নের ওপর জোর করা চলেনা। শাসন কর্তৃপক্ষের অধিকার রয়েছে যাকে এই পদের জন্য সর্বোত্তম মনে করা হবে তাকেই দেওয়া হবে মনোনয়ন। এখানেই আবার সরকারী চাকুরি ও রাজনৈতিক কর্মধারার মধ্যে বন্ধন জেগে উঠছে। সাম্প্রতিক কালে যে সাধারণ পদ্ধতি দেখা যাচ্ছে তা হ'ল চাকুরির সময়ের দৈর্ঘ্য বিচার করে সকলকেই পরবর্তী গ্রেডে উন্নীত করা এবং বিশেষ নির্দিষ্ট পদগুলিতে নিয়ে চলে আসা শুধু মনোনীত ব্যক্তিদের। এই নীতিতে সরকারী কর্মচারীরা কিছুটা শান্ত হয়েছে, কিন্তু উচ্চপদে আসীন কর্মচারীর সংখ্যা প্রচুর বেড়েছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সরকারী কোষাগারের ওপর প্রবল চাপ পড়েছে।

অনেকে আছেন, কাজের গুণাগুণ বিচারে তাঁরা 'কেমন হওয়া উচিত' বলেন। তবে এই প্রণালী গ্রহণ করা যেতে পারে যদি পুরো পদ্ধতিই বদলানো যায়।

প্রশিক্ষণ

সর্বভারতীয় চাকুরির আধিকারিকদের চাকুরিতে ঢোকার পরেই প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। প্রথম কয়েক বছর রাজ্যেই বিভাগীয় শিক্ষা, ভাষাশিক্ষা, নিয়মিত

ব্যবধানে চাকুরি সংক্রান্ত শিক্ষা দিল্লির মেটকাফ হাউসে আই. এ. এস. অফিসারদের ইনডাকসান ট্রেনিং, রাজস্থানের মাউন্ট আবুতে ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসের অফিসারদের ট্রেনিং 1959 সালে LBS ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (লালবাহাদুর শাস্ত্রীর নামে) স্থাপিত হয় উত্তরপ্রদেশের মুসৌরী পাহাড়ে। অনুরূপ হায়দরাবাদে ন্যাশনাল পুলিশ অ্যাকাডেমি রয়েছে যেখানে আই.পি.এস অফিসাররা চাকরিতে প্রবেশের পর শিক্ষা লাভ করে।

রাজ্যের সরকারী কর্মচারীদের জন্য এখন প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্যে প্রশিক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে, এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রথমে ইনডাকসান ও পরে ইন-সারভিস শিক্ষা দেওয়া হয়। রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকার সময়ে পদ্ধতিগতভাবে নিয়মিত ও কেন্দ্রীভূত শিক্ষণব্যবস্থা বিশেষত শীর্ষ সিভিল সার্ভিস অফিসারদের জন্য সপ্তাহব্যাপী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকতো; সেখানে উচ্চপদস্থ ও নিচুস্তরের আধিকারিকেরা একসঙ্গে মিলিত হ'ত, পরস্পরের কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে ও শিখতে পারতো। বিশেষ কুশলতা (যেমন, অর্থ, উদ্যোগ, বৈদেশিক বাণিজ্য প্রভৃতি) এখানে গড়ে নেওয়া যেত। শিক্ষণব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল প্রশাসনিক রীতিকে ঝালিয়ে নেওয়া, সরকারী কর্মচারীকে আরও বেশি কর্মোদ্যোগী ও সংবেদনশীল করা। শিক্ষণ ব্যবস্থা থেকে কারও সরে থাকার ক্ষমতা ছিল না। এখন তো শিক্ষা নিতে হয় প্রতি দু'বছরে একবার করে। 1954 সালে স্থাপিত ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনও রয়েছে সরকারী কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য। এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠা পল অ্যাপলবাইয়ের ভারতে প্রশাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে।

এছাড়া সরকারী কর্মচারীদের বিদেশেও পাঠানো হয় ম্যানেজমেন্ট অথবা বিশেষ কোন বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের জন্য। অধুনা অনেক সাহায্যকারী কার্যসূচি ও প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থার সহায়তায় অনেক বেশি সংখ্যায় আধিকারিকদের পক্ষে বিদেশ ভ্রমণ সম্ভব হচ্ছে। তাদের শিক্ষার বিষয় নানারকম, যথা, কস্ট বেনিফিট অ্যানালিসিস, ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রোজাল, অপারেশনস রিসার্চ এবং ম্যানেজমেন্ট টেকনিকস। এখন ম্যানেজমেন্ট একটি বিপুল ও বিস্তৃত বিষয়। তার অন্তর্গত বিশেষ অনুধাবন যোগ্য প্রয়োগকৌশল সংক্রান্ত বিষয়গুলি যেমন PERT, পারফরম্যান্স বাজেটিং, কমপিউটার, ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রভৃতিতে বিশেষজ্ঞ হ'তে বিদেশ যাওয়ার দরকার হয়। ইউনাইটেড নেশনস ও দ্বিপাক্ষিক চুক্তির বলেও নানাবিধ কার্যসূচিতে সাহায্য পাওয়া যায়।

নতুন নিয়োগ করা সরকারী কর্মচারীদের জন্য একটি প্রশিক্ষণসূচি চালু করেছে ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব মুসৌরী। আই.এ.এস, শিক্ষানবিশ অফিসাররা, আই.পি.এস, ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস, ও কেন্দ্রের ক্লাস ওয়ান অফিসারদের সঙ্গে

একত্রে শিক্ষা গ্রহণ করে মূল বিষয়গুলি নিয়ে যেমন, নিয়মতান্ত্রিক, আর্থিক ও সামাজিক কাঠামো যার মধ্যে সব সরকারী কর্মচারীকেই কাজ করতে হবে। তাছাড়া শাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন মেসিনারি ও সরকারী প্রশাসনের নীতি ও তত্ত্ব।

ভি. টি. কৃষ্ণমাচারি রিপোর্ট অন ইন্ডিয়ান অ্যান্ড স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসেস 1962 সালের একটি মন্তব্যে বলেছে, 'সংসদীয় গণতন্ত্রে সিভিল সার্ভিসের ভূমিকা সম্বন্ধে তাদের সম্যক উপলব্ধি থাকা চাই। এই বৃত্তিভোগী শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য সিভিল সার্ভিসের লক্ষ্য ও বাধ্যবাধকতা প্রসঙ্গে এবং পেশাদারী বৃত্তিতে ন্যায়পরায়ণতার বিষয় নিয়ে শিক্ষামূলক আলোচনা; তাছাড়া তাদের বস্তুমুখীনতা, সততা, সম্পূর্ণতা ও পক্ষপাতশূন্যতা প্রভৃতি বিষয়েও।[1]

এই বৃত্তিমূলক শিক্ষার সময়ে যে সময়টুকু একত্রে কেটেছে, তার ফলে যোগদানকারী কর্মচারীদের মধ্যে বন্ধুত্বমূলক সহযোগিতার ভাব আসে। প্রথম দিকে কিছু সমালোচনা হয়েছিল, যে আদবকায়দার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তা ব্রিটিশ আমলের আই. সি. এস অফিসারদের উপযোগী ছিল। তাছাড়া ঘোড়ায় চড়ার মতো জিনিস শেখাবার কোন দরকার ছিল না। স্বল্পবিত্ত পরিবারের যুবক যুবতীদের পাওয়া যাচ্ছে সিভিল সার্ভিসে সরকারী চাকুরিতে। স্বাভাবিক গতিতেই রদ্‌বদলের কাজ শুরু হয়েছে। বৃত্তিমূলক শিক্ষার সূচি রাজ্যগুলিতে সরকারী চাকুরেদের প্রস্তুতিমূলক কাজের আরম্ভ করেছে মাত্র।

রাজ্যে আসার পর শিক্ষানবিশ আধিকারিককে রাজস্ব ও উন্নয়ন বিভাগের কার্যালয়গুলিতে—হায়ারার্কি অনুযায়ী গ্রাম, ফিরকা, তহসিল, ব্লক, রাজস্ব-সাবডিভিসন, ও কালেক্টরেটে বসতে হয়। জেলার ট্রেজারি অফিসার হিসাবেও তাকে থাকতে হয়, তাছাড়া জেলার অন্যান্য অফিসগুলিতে— জরিপ, বন, শিল্প, শিক্ষা, কৃষি প্রভৃতি বিভিন্ন জেলাকার্যালয়ে। শিক্ষানবিশদের ডায়েরি/দিনপঞ্জী রাখতে হয় এবং জেলা সমাহর্তার কাছ থেকে নির্দেশ নিতে হয়। ব্রিটিশ আমলে তরুণ সহকারীকে জেলা সমাহর্তার কাছে গিয়ে থাকতে হ'ত, সর্বত্র তাঁর সঙ্গে ঘুরতে হত এবং বুঝতে হ'ত কিভাবে সমাহর্তা (collector) সাধারণ মানুষ ও সমস্যাগুলির সমাধান করেন এবং জেলার কি কি কাজের রিপোর্ট তিনি গভর্নমেন্টকে পাঠান। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে একজন সেরেস্তাদারও জানতো কিভাবে নতুন একটি শিক্ষানবিশকে কাজ শেখাতে হয়।

শিক্ষানবিশীকালে সরকারী কর্মচারীদের পরবর্তী পদোন্নতির জন্য বিভাগীয় পরীক্ষাগুলিতে উত্তীর্ণ হ'তে হয়। এই পরীক্ষাগুলির মধ্যে থাকে—রাজস্ব ও জরিপ সংক্রান্ত কাগজপত্র এবং সর্বভারতীয় চাকুরির জন্য স্থানীয় ভাষা। এই শিক্ষণব্যবস্থা একজন তরুণ আধিকারিককে তার সামনের কর্মজীবনের আভাস এনে দেয় এবং তাকে তৈরি করে দেয় ভবিষ্যতের জন্য। প্রশাসনিক রীতি-নীতিতে সে অভ্যস্ত হয়।

তাকে নানা বিষয়ে জানতে হবে, তাই কি কৌশল এবং কি ধরনের ব্যবহার তার উপযুক্ত হবে তাও তাকে বুঝে নিতে হয়।

অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস্ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী এখন প্রতি রাজ্যেই ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়েছে। এই ইনস্টিটিউটগুলিতে মৌলিক বিষয়গুলিতে —যেমন, সংবিধান, রাজ্যের সরকারী দপ্তরের কাজকর্ম, আর্থিক গঠন, এবং নিজের ও কাজের পরিচালনা পদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই ইনস্টিটিউটে পড়তে হয় ব্যবহারিক বিজ্ঞান, ও উন্নয়ন পরিকল্পনার বিষয়, তাকে শিখতে হয় নীতি ও প্রকল্প তৈরি করার বিষয় এবং সেগুলিকে কাজে রূপায়িত করা। গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে এবং রাজনৈতিক পরিবেষ্টনীর ঘূর্ণাবর্তে সহানুভূতিশীল প্রশাসক রূপে কিভাবে কাজ চালাতে হয় এবং সাধারণ মানুষের সহযোগিতা পেতে হয় তা' শিক্ষার্থীদের শিখতে হয়।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ওপরের শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের কথা নিয়ে আলোচনা করেছি। নিচের স্তরেও প্রশাসনের ধরন একই। একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন আধিকারিক স্তরে লোক নিয়োগ করে, তারা উচ্চতর পদে উন্নীত হয় সিনিয়রিটির বিচারে। একটি নির্দিষ্ট স্তরের পর বার্ষিক কনফিডেনসিয়াল রিপোর্ট আছে। কিন্তু কাউকে অযোগ্যতা, বা সময়ানুবর্তিতা না থাকার জন্য কিংবা কাজের উপযুক্ত হয় এমন কোন কারণে কাউকে আর ফেরত দেওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু শ্রেণীবিভাগ নিয়ন্ত্রণ ও আপিল সংক্রান্ত নিয়মাবলী আছে যাতে অসৎ আচরণ, অর্থ আত্মসাৎ, প্রতারণা, নৈতিক অবনতি প্রভৃতি কারণের জন্য লঘু ও গুরু শাস্তির ব্যবস্থা আছে। অভিযুক্তকে সুযোগ দেওয়া হয় আত্মপক্ষ সমর্থনের। অভিযুক্ত ন্যায়বিচার আশা করতে পারে। কিন্তু একবার সরকারী চাকুরির স্থায়ী নিরাপত্তায় পৌঁছলে কোন কর্মীকে পদচ্যুত করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। যদি না তার অপরাধ পূর্বে উল্লিখিত আইনের কোন ধারার মধ্যে পড়ে। সরকারীর সঙ্গে যে স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার বোধ যুক্ত আছে তার পরিণতিতে যে কর্মরীতি ও নৈতিকতা জানে, তা কাজের উৎকর্ষ সাধনের পক্ষে অনুকূল হয়। জাপানে অবশ্য চাকুরির নিরাপত্তা কাজের বোঝা বহনে বাধ্য করে। জাপানের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে গাঁথা হয়ে আছে দেশের জন্য আনুগত্য ভালোবাসা ও দেশাত্মবোধ। তার পরিচয় ব্যক্তির নিজের কাজ সম্পাদনের মধ্যেই তার সন্তুষ্টি। কাজের সততা অত্যন্ত বেশি এবং এই সততাকে রক্ষা করে তাদের চাকুরির নিরাপত্তা।

ভারতবর্ষে সরকারী দপ্তরগুলিতে কাজের নৈতিকতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কারণ কার্যপদ্ধাতি এখনও সেই আবহাওয়া গড়ে তুলতে পারেনি যা দায়িত্বজ্ঞানকে পরিস্ফুট করে তোলে, তাই সম্ভব হয়, অলস ও অযোগ্য লোকের পক্ষে শূন্য হাতে বেরিয়ে যাওয়া। তাছাড়া, কাজের হিসাব দেওয়ার বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্র এত ছড়ানো

যে, কোন একজন ব্যক্তিকে দোষী করা বা শাস্তি দেওয়া সম্ভব হয়।

একটা সময় ছিল যখন যে কাজই মানুষ করুক না কেন, উৎকর্ষই ছিল লক্ষ্য। এখনও সেই ভাব অনেকের মধ্যে দেখা যায়, যারা কাজকে নিখুঁত করতে ভালোবাসে, যে কোন বিষয়ই তারা হাতে নিক—সঙ্গীত, শিল্পকলা, সাহিত্য, ভাস্কর্য বা নৃত্য। তারা হয়তো প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে, কিন্তু কাজের পূর্ণতা আনতে তারা কঠোর পরিশ্রম করে। উৎকর্ষের চরম সীমার দিকে যেতে হ'লে কোন ছোট পথ ধরে যাওয়া যায়না। একমাত্র পথ হচ্ছে বিরামহীন শিক্ষা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়।

এই গুণগুলিই প্রশাসনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষে সরকারী চাকুরিতে থাকা ব্যক্তিকে চেষ্টা করতে হবে শিষ্টাচার ও সেবার শীর্ষ পর্যায়ে উঠতে, দেশের জন্য গভীর ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হ'তে। এই মনোভাবকেই সারাক্ষণ ধরে রাখতে হবে, এই চিন্তাই হবে সকল শিক্ষার অঙ্গ, এ'র জন্য হয়তো জুটবে না কোন ফুলের 'ব্যুকে'।

কাজে উৎকর্ষ লাভের চেষ্টা বিশেষ ভাবে এক উদার মানসিকতার পরিচয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি মনের অন্যান্য ভাবগুলিই প্রাধান্য পাচ্ছে। প্রচারমাধ্যমগুলিতে শুধু রোদনের ধ্বনি—সাধারণ মানুষের কাজে এবং সরকারী চাকুরিতে কাজের মান নেমে যাচ্ছে। এ'কথা বারবার বলার দরকার হয়না যে, গুণগত মান ও উৎকর্ষ সফল সুচারু কাজের অংশ। দেশ আজ চায় এমন সরকারী কর্মচারী যারা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে সুযোগ্য পরিচালনায় আনন্দ ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। কাজেই যখন সকল শিক্ষণ ব্যবস্থার লক্ষ্য হবে কাজের জন্য যোগ্যতা ও দক্ষতা বাড়িয়ে তোলা, তার সঙ্গে আরও একটি বস্তু যুক্ত হবে, আর তা হ'ল শিক্ষার্থীর আত্মচেতনাকে জাগিয়ে দেওয়া।

আদর্শগত ভাবে সরকারী কর্মচারীর শিক্ষণব্যবস্থার চারটি খুঁটি থাকা দরকার। যেমন,

* শিক্ষা ও প্রাত্যহিক কাজের নির্দেশ দেবেন উর্ধ্বতন তত্ত্বাবধায়ক আধিকারিক যার নেতৃত্ব ও প্রেরণাদায়ক শক্তি থাকবে।
* প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই মাঝে মাঝে শিক্ষাব্যবস্থা উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের হাতে, যাঁদের মধ্যেও থাকবে উপরোক্ত গুণগুলি।
* বাইরের প্রতিষ্ঠানে অন্তত দুবার (একজনের জীবনে) শিক্ষণ ব্যবস্থা।
* বিদেশের অভিজ্ঞতা—জীবনে অন্তত একবার, অন্যথায় অন্য সংগঠনে।

এগুলি হবে ইন্ডাকসন বা ইনট্রোডাকসন কোর্সের অতিরিক্ত; ইন্ডাকসন কোর্সেই কাজের সততা ও উৎকর্ষ লাভের বুনিয়াদ তৈরি হয়।

দুর্ভাগ্যক্রমে সরকারী চাকুরিতে শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্ব এত অবহেলিত, যে,

সিভিল সার্ভিসের শীর্ষস্থানে যাঁরা আছেন, তাঁরা ছাড়া, অন্য অনেকেরই শিক্ষণব্যবস্থার সুবিধাগ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। অপর দিকে, শিক্ষাবিষয়ক অনেক কার্যসূচি সফল হ'তে পারেনি। বাধার জন্য শিক্ষার কর্মসূচিকে অনেকাংশে বাতিল করতে হয়েছে।

অনেক সময় দেখা যায় যে, তত্ত্বাবধানকারী আধিকারিক নিজেই কোন শিক্ষণ কর্মসূচিতে যেতে পারে নি। যদি সে ব্যর্থতার জন্য আশাহীন হয়ে থাকে, তাহলে তার অধস্তন কর্মচারীই পুরো ধাক্কা সামলে থাকে। সে সময়ে তার পক্ষে উৎসাহ দেওয়া বা উন্নয়নের পথে যাওয়া সম্ভব হয়না। কাজে উদ্দেশ্যহীনতা দেখা দেয়।

শীর্ষ সরকারী কর্মচারীরা পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নেবে। রাজ্য সরকারের একজন প্ল্যানিং সেক্রেটারীকে বার্ষিক আলোচনার জন্য দিল্লিতে তার টিমকে নিয়ে যেতে হয়েছিল। সব ঠিক চলছিল একসময় টিমের সদস্যরা আবিষ্কার করল যে কিছু ফিগার তারা মেলাতে পারছে না। সেক্রেটারী সকলকে ডেকে আলোচনায় বসলেন, ও অসঙ্গতির কারণ বার করলেন। এটাও একটা শিক্ষণীয় কাজ, সমস্যা সমাধানের পথ বার করা। জ্ঞান, দক্ষতা ও মনের দৃঢ়তায় তারা বাধা পার হ'ল; কাজটাও উপভোগ্য হয়ে উঠল।

অফিসগুলির মধ্যে ক্লাস করবার ঘর আছে কি? আমাদের জানা কোথাও সে রকম ঘর নেই। তবে আছে একটি আহমেদনগরের প্রাক্তন সমাহর্তা লখিনার অফিসে। স্টকহল্‌মের ন্যাশনাল অডিট বুরোতে একটি সুন্দর ক্লাসরুম রয়েছে যেখানে সবরকম সুযোগ রয়েছে ট্রেনিংয়ের জন্য। সবসময়েই বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীর ট্রেনিংয়ের জন্য তার ব্যবহার। বিরামহীন ট্রেনিং কর্মসূচির মাধ্যমে কার্যক্ষমতার উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্য এইখানে এলে বোঝা যায়।

কার্যদক্ষতার মান ও উৎকর্ষ সাধিত হয় ট্রেনিং প্রোগ্রামে এমন কি বিষয় দেওয়া যেতে পারে? বেশি জোর দিতে হবে পরিচ্ছন্ন একটি নীতি রচনার দিকে,—ওয়ার্ক এথিক্। কিন্তু এই ওয়ার্ক এথিক্ কিভাবে তৈরি হ'তে পারে পূর্বে বর্ণিত শিক্ষাসম্বন্ধে বলা চারটি পদক্ষেপের মধ্যে? কাজের মধ্যে শিক্ষা ও অফিস গৃহের মধ্যে শিক্ষা—কাজের নীতিবোধকে উদাহরণের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করে দেখাতে হবে। সময়ানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা রক্ষা, সময়সূচি সম্বন্ধে সচেতনতা, অনুসন্ধিৎসু মন যা সমস্যার গোড়ায় গিয়ে উপস্থিত হয়, সুস্থ মূল্যবোধের অনুসরণ, সরল ও বিশ্বস্ত হওয়া, কাজের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকা—সরল কথায় আচরণে ও যোগ্যতায় উৎকর্ষ ও সর্বোচ্চ মান রক্ষার প্রয়াস—এগুলি গেঁথে দিতে পারে একজন তত্ত্বাবধানকারী আধিকারিক যার দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী কিন্তু যার মধ্যে অহমিকা নেই। গুণগতবিচার ও উৎকর্ষ সাধন—এরজন্য সবার আগে দরকার আত্মবীক্ষণ। সুস্থ কর্ম-নীতি গড়ে তুলতে হ'লে মাঝে মাঝে আত্মদর্শন চাই, আমাদের কাজ সুসম্পন্ন করার মতো

যোগ্যতা আমাদের আছে কিনা, সময়ের সঙ্গে না এগিয়ে আমরা পশ্চাদ্‌বর্তী হয়ে পড়ছি কিনা। উৎকর্ষ সাধনের পথে অগ্রসর হওয়ার সবচেয়ে বড় বাধা আত্মতৃপ্তি। "সব কিছু হয়ে যাবে" এই ধরনের মনোভাব। আমাদের দক্ষতাকে আরও ধারালো করে তুলতে হবে, বদলাতে হবে মনোভাবকে, যাতে আমরা কাজের দিক থেকে আরও যোগ্য হ'তে পারি। প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা আমাদের বসার ও আত্মদর্শনের সুযোগ দেয়। যে কোন সংগঠনে সাফল্যের জন্য তার কর্মীদের সবার আগে রাখতে হবে, প্রত্যেকটি মানুষের আত্মমর্যাদা ও সৃষ্টিসম্ভাবনার ওপর আস্থা রেখে গড়তে হবে সাফল্যের ভিত্তি।

কর্ম সম্পাদন ও কৃতিত্বের মূল্যায়নে সরকারী অফিসগুলির অসুবিধা

নীতিগত ভাবে কোন ব্যক্তির কৃতিত্বের গুণবিচার করতে হ'লে দেখতে হবে যে, সংগঠনের উদ্দেশ্য সাধনের পথে তার কাছে যা আশা করা হয়েছিল তার কতটুকু সে করতে পেরেছে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লক্ষ্য পূরণে সে কতটুকু সফল হয়েছে। সংগঠনের পুরো উদ্দেশ্য অথবা তার একটি বিভাগের কার্যধারা সঙ্গে ঐ ব্যক্তির কাজের কতটা সঙ্গতি আছে তাও মিলিয়ে দেখতে হবে। কি উদ্দেশ্যে কাজ করা হচ্ছে আর কিভাবে তা করা হবে, এ' বিষয়ে নিয়োগকর্তা ও কর্মীর মধ্যে ধারণা ও চিন্তার গতি একই হওয়া দরকার।

সরকারী নীতির এলাকার মধ্যে কর্মরত কর্মচারীদের ভূমিকা ও কাজের পরিমাণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে সঠিকভাবে কিছু বলা শক্ত। কাজের উদ্দেশ্য কাজের নির্দেশ যারা দেয় তাদের কাছে স্পষ্ট থাকলেও, কাজ যারা সম্পাদন করে, তাদের কাছে অনেক সময় পরিষ্কার হয়না। যে সব কাজ বা সমাজহিত দৃশ্যমান হয়, (যেমন, শিক্ষার দান) পরস্পরের মধ্যে নির্ভরশীল কাজ এবং স্বতন্ত্র দপ্তর, বা বিভাগের মধ্যে একতাবদ্ধ হয়ে করা কাজ (যেখানে একজন ব্যক্তির কাজের ভারকে স্বতন্ত্র করে দেখা সম্ভব নয়) যে সব কার্যসূচিতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়, কাজ ফলপ্রসূ হওয়ার আগে এ'সব ক্ষেত্রেই সরকারী কর্মচারীদের কাজের মূল্য নিরূপণ করা জটিল ও দুরূহ। হঠাৎ কোন আইনসংক্রান্ত বিলের খসড়া দ্রুত তৈরি করে বিধানসভায় পাঠানোর প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাজ বা কর্তব্যের প্রয়োজন হয়। কাজের পরিমাণ সম্বন্ধে কোন সঠিক ধারণা থাকে না; কাজেই সে ক্ষেত্রে গুণের মান নেমে যায়, কিন্তু তার জন্য কাউকে শাস্তি দেওয়া যায় না। তাছাড়া আমরা এমন একটি আমলাতন্ত্রের উত্তরাধিকারী হয়েছি, যেখানে উচ্চপদস্থ আমলা সবসময়েই সঠিক বলে ধরা হয়।

উদ্দেশ্যকে স্পষ্টভাবে দেখতে না পাওয়ার জন্য মূল্যায়ন ও দায়িত্ব নিরূপণ অত্যন্ত শক্ত হয়ে পড়ে। অন্যদিক থেকে নিয়ম ও দায়িত্বের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার অভাবে লক্ষ্য স্থির করা শক্ত হয়, কার্যসূচির পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপও করা যায়না।

খুব অল্প সংখ্যক লোক আছে যারা স্রোতের বিপরীত দিকে সাঁতার কাটতে পারে। একবার যখন তারা বুঝতে পারে যে তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যপথের সঙ্গে সাংগঠনিক লক্ষ্যের (যা উর্ধ্বতন বা উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা ব্যাখ্যা করেছেন) কোন মিল নেই, তখন তারা আর এগোতে পারে না তাদের লক্ষ্যপথ ধরে। সাম্প্রতিককালে কর্মীদের ক্ষেত্রে যে গুণটিকে অপরিহার্য বলে মনে করা হয়েছে। তা হ'ল তাদের পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে চলার ক্ষমতা।

আরও একটি বিষয় আছে যাকে অবহেলা করা যায় না। সরকারী কর্মচারীদের সবসময়েই নাগরিকদের ন্যায় নীতি ও সততা দিয়ে গ্রহণ করতে হয় (তার জন্য তাদের অতীতের ওপর নির্ভর করতে হয়), তাই কেমন করে কাজটি করা হয়, অর্থাৎ কাজ সম্পাদনের প্রক্রিয়া কয়েকটি ক্ষেত্রে কাজের ফলাফলের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সেই ক্ষেত্রে আমাদের মূল্য নিরূপণ করতে হবে কাজের ফলের দিকে তাকিয়ে নয়, তার প্রক্রিয়া বা করার ধরন দেখে।

অর্থাৎ কখনও আমরা সরকারী কর্মচারীদের দায়ী করি তাদের কাজের জন্য কখনও আবার কাজে ফলের জন্য। আমরা অনেক ঘটনা দেখেছি যখন সরকারী কর্মচারীরা এই দুটি বস্তুকে মিলিয়ে ফেলে; তারা কাজের প্রক্রিয়াকে নিশ্চিত করে যেখানে ফলের দরকার, আর যেখানে প্রক্রিয়ার প্রয়োজন সেখানে কাজের ফলের দিকে তাকিয়ে থাকে।

খুব শক্ত ব্যাপার কাজের মূল্য পরিমাপ করা এবং কাজের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য জোর দেওয়া। কারণ এর জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি এর মধ্যে নেই। ঘুরিয়ে বললে এই দাঁড়ায় যে, সংকটের সময় এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিশেষ কার্যসূচিতে প্রশাসনের কাজের ধরন খুবই ভালো। উদ্দেশ্যমুখী এই কার্যসূচি যেমন নির্বাচন এবং বিভিন্ন প্রতিনিধিত্ব মূলক সংখ্যা ও ব্যক্তির মধ্যে দায়িত্ব, প্রয়োজনীয় উপাদান মানব ও অর্থ সম্পদের প্রাপ্যতা ও ব্যবহার। এই জন্য সাফল্য পেতে একটা প্রবল আগ্রহ থাকে। সাধারণ সময়ে এই কারণগুলি থাকে না।

সরকারী কর্মচারীদের কাজের মূল্য বিচার অনেকটা তামাশার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষত সেই সব রাজ্যে যেখানে গোপনরিপোর্ট গোপন থাকেনা, কর্মচারীদের দেখাতেই হয়। উচ্চপদস্থদের মধ্যে খুব কমলোকই বিরুদ্ধ মন্তব্যের অর্থ বোঝেন, গোপন রিপোর্ট লেখার উদ্দেশ্য এবং লেখার ব্যাপারে যে সততা দরকার তা তাঁদের বোধগম্য নয়। অনুরূপ আত্মমূল্যায়নের দক্ষতাও তাঁদের নেই। সরকারী অফিসগুলিতে কাজের মূল্যবিচার কাজটি কেউ বুঝতে পারেন না। গোপন রিপোর্টকে ছড়ি হিসাবে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু কর্মচারীদের শক্তি ও জঙ্গী মনোভাবের জন্য এখন একটা কাগুজে বাঘে পরিণত হয়েছে। কাজের মূল্য বিচাররূপ বস্তুকে কর্মচারীদের ব্যক্তিগত উন্নয়নের প্রয়াস হিসাবে গণ্য করা এবং

তার জন্য সবসময়ে যোগাযোগ রাখা, উর্ধ্বতন আধিকারিকের সঙ্গে আলোচনা, কাজের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতিসূচক পরিবেশ জানা ও শেখার পথকে প্রশস্ত করে। তার উচ্চপদস্থ আধিকারিকের সাহায্যে একজন কর্মচারী জানতে পারে তার কর্মক্ষমতার সীমা, তার ভবিষ্যতের সম্ভাবনার দিকে অগ্রসর হওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়। সেই সঙ্গে সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তার জানা হ'লে তার পক্ষে পথের নির্দেশ পাওয়াও সোজা হয়। আত্মমূল্যায়ন, পরিমাপ সংশোধন ও শক্তি বাড়ানো—তারজন্য সুযোগ পাওয়া দরকার। ভবিষ্যত সম্ভাবনার পরিমাপ করাও দরকার—বৃহত্তর দায়িত্ব বহনের শক্তির পরিমাপ করতে সুযোগ দেওয়া যেমন দরকার তেমনি কঠোর পরিশ্রম ও শিক্ষাব্যবস্থা।

কর্মসম্পাদনের ঔ কর্মযোগ্যতার মূল্যায়ন কর্মী সম্পর্কিত নীতি ও কর্মী-পরিচালনার (Personnel policy and parsonnel management) জন্য যে সৌধ নির্মাণ করা যায় তার একটি উপকরণ মাত্র। যদি অন্য দিকগুলিও, যেমন—নিয়োগ পদ্ধতি ও ভবিষ্যত জীবনগঠন (Recruitment and career management) সুপরিকল্পিত পথে দেখা না হয়, তাহ'লে পারফরম্যান্স অ্যাপ্রোজাল বা কর্মীদের কাজের মূল্যায়ন সঠিকভাবে কার্যকরী হয়না।

Affirmative Action in Personnel Policies

নির্ভুল কর্মী নীতি অনুসরণের জন্য স্বীকৃত সূচক কাজের সচেতন প্রয়াস কি হবে? সরকারী কর্মীনীতির লক্ষ্য কি হওয়া উচিত? সরকারী দপ্তরে নির্ভুল কর্মী সংক্রান্ত নীতির প্রয়োজন যে জন্য—

1. প্রত্যেকটি কাজের জন্য সঠিক লোককে খুঁজে বার করা, কর্ম সম্পাদনের পেশাদারী মান স্থির করে দেওয়া এবং সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য নীতি স্থির করা।
2. কর্মীদের অনুপ্রাণিত করতে পারা, কাজে তাদের আগ্রহ সজীব করে রাখা।
3. পরিচালনা চাপ ও পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে চলার জন্য প্রশাসনকে সহায়তা দেওয়া এবং
4. প্রশাসনে সততা রক্ষার দিকে লক্ষ রাখা এগুলির আরম্ভ, সঠিক নিয়োগ পদ্ধতি, ও যে কাজ তাদের করতে হবে সে বিষয়ে শিক্ষণ ব্যবস্থায়। কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার নীতিতে রয়েছে—

শিক্ষণ ব্যবস্থার সুযোগ, শিক্ষানবিশীর কাল সমাপ্ত হ'লে চাকুরিতে স্থায়িত্ব দেওয়া, সঠিক স্থানে কাজের সুযোগ, কাজের প্রীতিপ্রদ পরিবেশ, প্রত্যাশা ও মূল্যায়ন, পদোন্নতির সুযোগ, পুরস্কার, উচ্চপদে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ প্রভৃতি। কর্মীদের কর্মযোগ্যতার উন্নয়নের জন্য প্রত্যেকটি পর্যায়ে পরিকল্পিত হস্তক্ষেপের

প্রয়োজন, যার অন্তিম লক্ষ্য সাংগঠনিক শক্তির বৃদ্ধি, নৈতিকতা ও কর্মে সততা।

সরকারী কর্মচারীদের কর্মশক্তিকে যদি আশানুরূপ বাড়াতে হয়, তাহ'লে গভর্নমেন্টকে নিচের বিষয়গুলিতে বিশেষ ভাবে মন দিতে হবে—

1. প্রত্যেকটি বিভাগে কার্যসংক্রান্ত নিয়মাবলী যার মধ্যে থাকবে প্রত্যেকটি কাজের গুণাগুণ; কাজের বর্ণনায় কাজের নির্ভরযোগ্য খুঁটিনাটির বিশদ বর্ণনা, যার দ্বারা কাজের বিচার করা যাবে। কর্মী নিয়োগ, কর্মশক্তির উন্নয়ন ও কর্মীর মূল্যায়নের জন্যও এই ম্যানুয়াল প্রয়োজনীয় হবে। কর্মচারীদের কাজের মূল্যবিচারের সময় বলা, যে কি কি বিষয়ে তাদের মূল্যায়ন করা হবে—সঠিক পন্থা নয়; কাজের মূল্যবিচারের নীতি হ'ল, কাজ আরম্ভ করার আগেই তাদের নিয়ে বসতে হবে, বলে দিতে হবে, কি কি কাজ সম্পন্ন করতে হবে। একত্রে লক্ষ্য স্থির করার ওপরে জোর দিতে হবে। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির করার চেয়ে কর্মচারীরা লক্ষ্যবিষয়ে পৌঁছতে বেশি আগ্রহী হবে।
2. যখন কর্মীরা 'টিম' তৈরি করে কাজ আরম্ভ করে, তখন একত্র হয়ে যারা কাজ করছে তাদের বিচারের মাপকাঠি তৈরি থাকা দরকার। এখন সরকারী কাজের অনেক অংশ পারস্পরিক শৃঙ্খলা রক্ষা ও সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল। তার জন্য নতুন পরিমাপ ব্যবস্থা চাই।
3. পরিদর্শনের স্তরে যিনি আধিকারিক, তাঁকে তাঁর সহকর্মীদের বন্ধু, উপদেষ্টা ও নির্দেশক হতে হবে। কাজের মূল্য বিচারের সকল স্তরেই কর্মচারীদের যুক্ত থাকা প্রয়োজনীয়; লক্ষ্য স্থির করা থেকে কর্ম সম্পন্ন করা অবধি। কর্মীদের কাজে অনুপ্রাণিত করার বিষয় সরকারী দপ্তর বা বেসরকারী সংস্থা সর্বত্রই একই রকম। যে বিষয়ে কাজ করতে হ'লে সাফল্যের জন্য উদ্দীপনা আসবে, দায়িত্ববোধ, এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ ও স্বীকৃতি সেখানে প্রেরণাস্বরূপ। কিন্তু কর্মনীতি যদি এগুলিকে নষ্ট করে দেয়, তাহ'লে কাজের মূল্যবিচার অর্থহীন হয়ে পড়ে, এবং এ'ভাবে বিচার করাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।
4. কর্মকৃতিত্বের মূল্য বিচার সম্পর্কিত প্রতিবেদনের পদ্ধতি সম্পর্কে অনুসন্ধান ও অধ্যয়ন প্রয়োজনীয়। যেখানে কতটা কাজ করা হয়েছে তার পরিমাণ দৃশ্যমান হয়, সেখানে পরিমাপের নির্ধারক যন্ত্র কি হবে? সততার সঙ্গে নিজের মূল্যবিচার করার জন্যও শিক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন আছে। সরকারী দপ্তরে আত্মমূল্যায়নে হয় দম্ভের প্রকাশ আর নইলে অতিরিক্ত নম্রতা—যার কোনটাই সঠিক নয়। অস্পষ্টতা ও খামখেয়ালিতায় ভরা সরকারী পদ্ধতিতে কিভাবে মূল্য বিচার সম্ভব, সে বিষয়ে প্রকাশ্য আলোচনায় বসে সকলের

অভিমত গ্রহণ করতে হবে এবং ঐকমত্যে পৌঁছতে হবে। উচ্চপদস্থ কর্মচারীদেরও শিক্ষা দিতে হবে, যাতে তারাও অধীনস্থদের উন্নতির পথ দেখাতে পারে।

5. কর্মচারীদের সবসময়েই জানিয়ে যেতে হবে তাদের কাজের ধরন, যাতে তারা সংশোধনের সুযোগ পায়। সরকারী দপ্তরে বছরে একবার বিরুদ্ধ মন্তব্য জানিয়ে দেবার রীতি। কোন ব্যক্তিকে একবার বলা হ'ল যে ঐ ব্যক্তি তার বুদ্ধির ওপর নির্ভর না করে সহজাত চেতনায় কাজ করে। এটি প্রতিকূল মন্তব্য কিনা, তা নিয়েও ভাবনার প্রয়োজন আছে। কারণ, দেখা গিয়েছে যে বুদ্ধির চেয়ে সহজাত চেতনা অনেক সময়েই বেশি কার্যকরী হয়। অনেক নতুন কর্মাধ্যক্ষ এখন অনিশ্চিত পরিবেশে তাদের অন্তর্নিহিত আবেগের ওপর বেশি নির্ভর করে।
6. শুধু অভিজ্ঞতার বলেই কাজের মানকে সন্তোষজনক করে তোলা যায় না। গুরুত্ব দিতে হবে শিক্ষণ ব্যবস্থার ওপারে, এবং বয়সে ছোট বা বড় যাই হোক, সকলকেই তার সবচেয়ে যা ভালো তার প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে। তাই একটি সম্পূর্ণ কর্মী পরিচালনা নীতি ও কর্মী শিক্ষণ নীতি—শিশুর দোলনা থেকে কবরের মাটি পর্যন্ত, তৈরি হওয়া দরকার যার দ্বারা সরকারের সিভিল সার্ভিসে কর্মরত ব্যক্তিদের শুধু বেতন ও চাকরির নিরাপত্তা বাড়িয়ে ফাঁপিয়ে তোলার আগে, তাদেরকে আরও গভীর ভাবে দেখা দরকার।
7. শীঘ্রই একটা সময় আসবে যখন নিচুতলার লোকেরা তাদের ওপরের তলার আধিকারিকদের কাজের মূল্য বিচার করবে এবং সেটা প্রকাশ্যে হবে। উদাহরণ দেখানো যাক দেশের একটি বিখ্যাত সরকারী প্রতিষ্ঠানে শীর্ষ প্রশাসকদের কাজের পরিমাপ (যাদের মধ্যে আছে ডিন, রেজিস্ট্রার, বিভাগীয় প্রধান, এবং ডিরেক্টর) গোপনে একটি প্রশ্নপত্র পূর্ণ করার মাধ্যমে সকল কর্মচারীর কাছ থেকে নেওয়া হয়। প্রত্যেক শীর্ষস্থানীয় প্রশাসকেব মূল্যায়নের জন্যে কুড়ি জন ব্যক্তিকে বেছে নেওয়া হয়। যা পাওয়া যায় শুধু সংশ্লিষ্ট প্রশাসককে দেখিয়ে গোপন ফাইলে রাখা হয়। তবে অধ্যক্ষ ও অধিকর্তার ক্ষেত্রে (Dean and Director) ফলাফল ক্যাম্পাস নিউজ লেটারে ছাপিয়ে দেওয়া হয়। এই ধরনের ওপরের দিকের প্রশাসকদের মূল্য পরিমাপ মুক্ত প্রশাসনের পথ প্রশস্ত করে, পদমর্যাদা সম্পর্কে সচেতনতা বোধ করে, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসের ভাবকে বাঁচিয়ে রাখে।
8. সরকারী দপ্তরে কাজের মূল্যায়ন সংক্রান্ত রিপোর্টে আমাদের অন্তর্মুখীনতার

ভাব কমাতে হবে, যতটা সম্ভব পরিমাণগত পরিমাপ করে। কি করে আমাদের প্রতিবেদনকে বেশি বস্তুমুখী করা যায়? কি করে পৃথক করে দেখানো যাবে কাজের বিষয় ও কাজের পরিবেশ? বিষয় হ'ল যার সঙ্গে কাজ জড়িত; আর পরিবেশ হ'ল চারপাশের অবস্থা ও শর্ত যার মধ্যে কাজটা করতে হবে। কাজের পরিবেশ হ'ল কর্মচারীর নিয়ন্ত্রণের বাইরের জিনিস, অবশ্য পরিবেশের ওপরের কাজটির সুসম্পন্ন হওয়া নির্ভর করে। অনেক সময় এরই অজুহাত দিয়ে কৈফিয়ৎ দেওয়ার দায়িত্ব থেকে বাঁচা যায়। সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে কাজের পরিবেশের একটি উল্লেখ্য ভূমিকা আছে।

9. আমাদের মূল্যায়নের জন্য নীতিনির্ধারণ করতে হবে; তার ভিত্তি হবে উৎপাদন ও উৎপাদন ক্ষমতা। এটা সম্ভব হ'লে আমরা কর্মীদের কর্মের অনুরাগ ও নৈতিকতা বাড়াতে পারবো, বিশেষভাবে যেখানে চাকুরির নিরাপত্তা আছে।

সবশেষে, ওপরতলার ব্যক্তিদের অধীনস্থদের সঙ্গে ব্যবহারে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আসা দরকার। যদি তাঁরা 'বস্'-এর মতন না থেকে বন্ধুর মতো ব্যবহার করতে পারেন এবং তাঁদের শেখাবার দক্ষতাকে অন্যদের ব্যক্তিগত যোগ্যতাকে বাড়াবার জন্য লাগান, তাহ'লে অধীনস্থ কর্মচারীরাও নিজেদের গুরুত্ব অনুভব করবে। অন্যথায় 'বস' হয়ে শুধু অভিযোগ করে যেতে হবে। কর্মকর্তা ও সমগ্র পরিচালন ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যতদিন পর্যন্ত তারা অধীনস্থদের অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতার শিকার হয়ে থাকবে ততদিন পর্যন্ত। যতদিন তাঁরা এই অবস্থার উন্নতি সাধনের চেষ্টা না করবেন, ততদিন উৎপাদন ক্ষমতা, উৎপাদন, কাজের পরিধি বাড়ানো ও সুস্থ কর্মনীতি আলেয়ার মতো দূরেই সরে থাকবে।

সাত

ভারতের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা

গ্রাম্য পঞ্চায়েত গড়ে তুলবার ব্যবস্থা নেবে রাজ্য। স্বশাসিত শাসন ব্যবস্থার ইউনিট হিসাবে কাজ করার জন্য তাদের যে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দরকার হতে পারে তাদের সেই ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দেবে রাজ্য।

Article 40 of Part IV Directive Principles of State Policy of the constitution of india.

The 73rd Constitutional Amendment Act 1992, inserted as Part IX of the constitution, সংবিধানের 73তম সংশোধন অ্যাক্ট—1992 নির্দেশ দিয়েছে যে, প্রতি রাজ্যে গ্রামে, মধ্যবর্তী স্তরে ও জেলায় (তিন সারি পদ্ধতি) পঞ্চায়েত গড়তে হবে। ওই সংশোধনীতে আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হ'ল

1. পঞ্চায়েতে প্রতি পাঁচবছর অন্তর নির্বাচন হবে

2. আসন সংরক্ষিত রাখতে হবে সিডিউল্ড কাস্ট ও সিডিউল্ড ট্রাইবের জন্য এবং মোট আসন সংখ্যার এক তৃতীয়াংশের অনধিক আসন সংরক্ষিত থাকবে নারীদের জন্য—নারীর আসন সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ তপশিলভুক্ত নারীদের জন্য। চেয়ারপার্সন বা সভাপতির স্তরে সংরক্ষণ স্থির করার ভার রাজ্য বিধানসভার হাতে। এইভাবে প্রায় একলক্ষ এখন পর্যন্ত অসুবিধাগ্রস্ত মানুষ তাদের ভাগ্য স্থির করার সুযোগ পাবে স্থানীয় ব্যবস্থায়।

1992 সালে অনুরূপ একটি সাংবিধানিক সংশোধন (74তম) বিধিবদ্ধ হয় একই নীতিতে—ত্রিস্তর, পাঁচবছর অন্তর নির্বাচন, নারী ও তপশিলভুক্ত মানুষের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা তবে পৌর স্ব-শাসিত স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য।

একটি প্রচলিত মত যে, যতই বলা হোক না কেন, যে, ব্রিটিশ শাসনে শাসনব্যবস্থা একীভূত ছিল, আমলাতন্ত্র বিকেন্দ্রীভূত হয়েছিল। গ্রামগুলি একক-ছিল, তার পুরানো আচার ব্যবহার নিয়ে। প্রদেশগুলিতে গভর্নর এবং জেলাগুলিতে কালেক্টরকে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল স্থানীয় সমস্যাগুলির

বিচারের জন্য। নিঃসন্দেহে এই ব্যবস্থা ছিল আধিপত্যে গড়া কাঠামোর ওপরে দাঁড়িয়ে, একটি উদ্দেশ্য সংগঠিত; সে উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ-রাজকে তুলে ধরা। এই ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীভূত পদ্ধতিতে দাঁড়িয়েছিল, তবু বাছাই করা ক্ষেত্রে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল। ব্রিটিশ চলে যাওয়ার পরে জেলাস্তর থেকে আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হ'য়েছে রাজ্যস্তরের রাজনৈতিক নেতাদের হাতে। আরও বেশি ক্ষমতা নেওয়া হয়েছে ভারত সরকারের হাতে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও অর্থদপ্তরে। এইভাবে ব্রিটিশ আমলের স্বৈরনীতি যা ভাবেনি তাই ঘটেছে অনেক বড় ও গভীরভাবে কেন্দ্রীকরণের ফলে।

ভারতে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের ইতিহাস

ব্রিটিশ এদেশে আসার অনেক আগে স্থানীয় শাসনব্যবস্থা চালিত ছিল গ্রামীণ সমাজ ও শাসন পরিষদের মাধ্যমে। 1830 সালে বলেছিলেন,

> যেখানে কিছুই থাকেনা, সেখানে তারা ছিল দেখা যায় রাজার পর রাজা চলে গেছে, বিপ্লবের পর বিপ্লব। হিন্দু, পাঠান, মোগল, মারাঠা, শিখ, ইংরাজ সকলেই একের পর এক প্রভু হয়ে বসেছে। কিন্তু গ্রামীণ সমাজ সেই একই ভাবে আছে।[1]

মোগল আমলে কোতওয়াল ছিল শহরের শাসনকর্তা। তারই হাতে ছিল শাসন কর্তৃত্ব, পুলিশ ও রাজস্ব বিভাগ। তাই ইচ্ছামত কাজ করার প্রচুর ক্ষমতা ছিল তার হাতে। কিছু কিছু পৌর কর্তব্য সে দেখতো বণিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে। তার আয় নির্ভরশীল ছিল ঐ বণিকদের হাতে।

কিন্তু প্রাচীন কালের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। ব্রিটিশ এদেশে এসেছিল যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা, তার ভিত্তি ছিল ইংল্যান্ডের অভিজ্ঞতা, স্ব-শাসিত সরকার যার বাধ্যবাধকতা ছিল ভোটারদের কাছে।

ব্রিটিশ অনুভব করেছিল যে, যেহেতু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ছিল বৈচিত্র্য, ভূগোল থেকে সংস্কৃতি পর্যন্ত যে সব সংগঠন তখন পর্যন্ত বেঁচেছিল, সেগুলি তাদের স্বার্থে কাজে লাগানো যেতে পারে বিশেষত এইজন্য যে, ব্রিটিশ মানতো না স্থানীয় ভাষা ও রীতিনীতি। লর্ড লরেন্সের সিদ্ধান্ত ছিল—এ দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের যতটা সম্ভব দেশের লোকের হাতে ছেড়ে দেওয়া। তার আগে বোম্বের শাসনকর্তা এলফিন স্টোন ঘোষণা করেছিলেন,

> আমাদের প্রধান অবলম্বন 'পঞ্চায়েত' হয়েই চলুক। আর তাকে ছাড় দিতে হবে সমস্ত নতুন ফর্মের হাত থেকে, অথবা হস্তক্ষেপ ও নিয়মকানুনের বন্ধন থেকে।[2]

1824 সালে টমাস মুনরো ছিলেন মাদ্রাজের শাসনকর্তা। গ্রাম্য চৌকিদারকে পুলিশ দপ্তরে ঢুকিয়ে নেওয়ার প্রস্তাবে তিনি আপত্তি জানিয়েছিলেন। আরও আগে কলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি শহরগুলিতে 'জাস্টিস অব পিস' নিয়োগ

করা হয়েছিল, যাদের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল জমি ও বাড়ির ওপর খাজনা ও কর বসাতে, পথঘাট পরিষ্কার রাখতে, রাস্তা ও পুলিশের কাজ দেখতে। 1845 সালের অ্যাক্ট (XI) অনুযায়ী প্রশাসনিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল একটি তত্ত্বাবধায়ক পর্ষদের হাতে। পর্ষদে নেওয়া হয়েছিল দুজন ইউরোপীয় ও তিনজন ভারতীয় বিচারপতিকে; চেয়ারম্যান ছিল একজন সিনিয়ার ম্যাজিস্ট্রেট অব পুলিশ। 1856 সালে অ্যাক্ট XIV তৈরি হল কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বে শহরগুলির তত্ত্বাবধান ব্যবস্থার জন্য। তিনটি শহরের প্রত্যেকটির জন্য তিনজন করে কমিশন। কলকাতার 120 জন বিচারপতিকে বিস্তৃত ক্ষমতা দেওয়া হ'ল।

রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বালানো ও নর্দমা পরিষ্কারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বোম্বেতে একজন স্পেশ্যাল কনট্রোলার অব অ্যাকাউন্টস নিযুক্ত হ'ল। স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে কর বসানোর ক্ষমতা দেওয়া হ'ল, যখন জলের ব্যবস্থা করার জন্য নির্মাণ কার্যের ব্যয়ের অংশ কিছুটা শহরকে দিতে হ'ল। মাদ্রাজ শহরকে আট ভাগে ভাগ প্রত্যেকটি ওয়ার্ডয়ের ভার নিতে চারজন করে কাউন্সিলার নিযুক্ত করা হ'ল।

সমস্যা দেখা দিল যখন কমিশনাররা একত্রে কাজ করতে পারল না। তাদের হাতে যথেষ্ট টাকা ছিল না, আর স্থানীয় এই কমিটিগুলির হাতে কর আদায়ের ক্ষমতাও ছিল না। বাংলায় আইন করে টাকা তোলা হ'ল, যে আইনের বলে সাধারণ খেয়াঘাট থেকে পাওয়া টাকার উদ্‌বৃত্তাংশ রাস্তা তৈরি ও মেরামতের কাজে ব্যবহার করা হ'ত। ঐ খেয়াঘাটগুলির ও নৌকার ব্যবস্থা যাত্রীদের পারাপারের সুবিধার জন্য গভর্নমেন্ট নিজের হাতে নিয়েছিল। স্থানীয় কমিটিও গঠন করা হ'ল সাধারণের প্রয়োজন ও ব্যয়ের তত্ত্বাবধানের জন্য। এই কমিটিগুলিতে একজন সরকারী কর্মচারী সচিব হিসাবে থাকতো, সচিব পথঘাটের গুরুত্ব সম্বন্ধে ও টাকার জন্য সরকারী মহলে কথা বলতে পারতো। বোম্বেতে সরকারী কর্মচারীকে চেয়ারম্যান করে কমিটি গড়া হয়েছে, কমিটির কাজ টাকাকড়ির আয় ব্যয় দেখা, কাজগুলি খতিয়ে দেখা এবং সবকিছুর ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ রাখা।

এই কমিটিগুলি যদিও সরকারী নিয়ন্ত্রণে গড়া হ'ত, তবু তাদের পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণে অনেক উন্নতি ঘটেছিল পথঘাটের, গড়ে উঠেছিল বিদ্যালয় ও চিকিৎসাকেন্দ্র। কিন্তু ঐ কমিটিগুলি সাধারণ মানুষের ইচ্ছায় চলত না, তারা সবসময়ে সরকারী কর্তৃপক্ষের দিকে তাকিয়ে থাকতো নির্দেশের অপেক্ষায়।

1817-30 সালে মাদ্রাজ ও কলকাতায় লটারির সাহায্যে টাকা তোলা হয়েছে, কিন্তু স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থায় সে টাকা যথেষ্ট না হওয়ায় প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিতে হয়েছে।

বোম্বেতে গাড়ি ঘোড়ার ওপর অতিরিক্ত কর বসানো হয়েছে এবং সে টাকা

রাস্তা নির্মাণে ব্যয় করা হয়েছে। সাধারণের কাছ থেকে টাকা তোলা ও ব্যয় করার অরুচিকর কাজে কারও আগ্রহ দেখা যায়নি।

তারপর দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ 1865 থেকে শতকের শেষ পর্যন্ত। এল করদাতাদের প্রতিনিধিদের নির্বাচন ব্যবস্থা, নির্বাহিকদের ওপর আইন ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণকে সুদৃঢ় করা হ'ল। বোম্বেতে কর্পোরেশন গড়া হ'ল বিচারপতি ও করদাতাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে। একজন মহাধ্যক্ষ (Commissioner) নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হাতে নিলেন। নাগরিক সভা সাপ্তাহিক অডিট এবং পেশাদার অডিটর মাসিক অডিট শুরু করল।

কলকাতায় 72 জন সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ নির্বাচিত হ'ত। পৌরসভার ঋণের ওপর সুদ দেওয়া এবং মজুত তহবিল গড়ে তোলার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হল। জলের ট্যাঙ্ক ইত্যাদি ও রাস্তার নর্দমার নির্মাণ কাজ আরম্ভ হ'ল। নদীতে মৃতদেহ ফেলে দেওয়ার রীতিও বন্ধ করা হ'ল। 1882 সালে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল ও তার অধিবাসীদের শহরের সঙ্গে যুক্ত করে নেওয়ায় পৌরসভাকে নতুন করে গড়ার প্রয়োজন হ'ল। জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা ও ঘিঞ্জি অঞ্চলের উন্নতির জন্য দু'লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করা হ'ল। পৌরসভার ব্যবসায়ী ও বণিকদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হল।

কর্পোরেশনের ক্ষমতার মধ্যে ছিল করের হার ঠিক করা ও নীতিনির্ধারণ করা। একটি নির্বাহিক সভা ও গড়া হ'ল; কর্পোরেশনের বৃহৎ কমিটির পক্ষে খুঁটিনাটি ব্যাপার দেখা সম্ভব ছিল না, সেগুলি দেখা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এই নির্বাহিক সভা (Executive Committees) এই পুনর্গঠিত কর্পোরেশন নিয়মিত কর আদায়, জল নিষ্কাশণ ব্যবস্থা ও জলসরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতির কাজ ভালোভাবেই করল।

মাদ্রাজ—নির্বাচন প্রথা চালু হয় 1878 সালে; 32 জন সদস্যের অর্ধেককে নির্বাচিত হ'তে হ'ত। তার মধ্যে প্রেসিডেন্ট ও দুজন ভাইস-প্রেসিডেন্ট সরকারের বেতনভুক কর্মচারী। 1884-তে নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা 24 করে দেওয়া হয়। তারা বাজেট ও ঋণ সংগ্রহ ব্যবস্থা দেখতো। হিসাব পরীক্ষার জন্য সরকারী অডিট ছিল। কলকাতার মতো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধিত্ব ছিল।

মাদ্রাজে পর্ষদ গঠন করা হয়েছিল; সেস ও কিছু কর তাদের হাতে দেওয়া হয়েছিল। যদিও চেয়ারম্যান একজন সরকারী কর্মচারী ছিলেন, পৌরসভার কাজে অনেক উন্নতি ঘটেছিল—বিশেষ ভাবে শিক্ষাব্যবস্থায় ও স্বাস্থ্যরক্ষায় এবং কোন কোন্ অংশে পথ সংরক্ষণে ও জল সরবরাহ ব্যবস্থায়। কিন্তু তারা স্ব-শাসন ব্যবস্থার শ্বাসরোধ করে রেখেছিল, অধীনস্থ বোর্ডগুলির কাজও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

বাস্তব স্থানীয় স্ব-শাসন

কিভাবে শেষপর্যন্ত ব্রিটিশ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা ভারতবর্ষে চলে এল?

প্রেসিডেন্সি শহরগুলিতে বড় বড় কর্পোরেশন গঠন করা হ'ল যার পূর্ণ কর্তৃত্ব রইল আর্থিক বিষয়ে। একজন সরকারী কর্মচারীকে কেন্দ্র করে একটি শক্তিশালী নির্বাহিক সমিতি—নির্দিষ্ট করে দেওয়া সীমার পরিধিতে যার কাজ করার অধিকার। নতুন কর বসানোর ব্যাপারে সরকারের কর্তৃত্ব, ঋণ সংগ্রহের ব্যাপারেও। কর্পোরেশনের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে পারতো গভর্নমেন্ট যখন সে সিদ্ধান্ত তার ক্ষমতার বাইরে হ'ত; ক্ষমতার অপব্যবহার করলে স্থানীয় কমিটিকেও সরিয়ে দিতে পারতো। গ্রাম্য প্রথাও চালু ছিল কিন্তু এ'সমস্তই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় ইংরাজ-ভাবাদর্শ থেকে পৃথক ছিল।

1870 সালে লর্ড মেয়োর উল্লেখ্য সিদ্ধান্ত বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা যাতে আরও বেশি সংখ্যায় ভারতীয়রা জড়িত হয় সেই সব কাজে যেখানে তারা উপযুক্ত হ'তে পারবে; অর্থাৎ যে ব্যবস্থা হ'ল পৌরসভা-প্রশাসন। তাঁর পরের গভর্নর জেনারেল লর্ড রিপন আরও একধাপ এগিয়ে গেলেন। তিনি এই স্ব-শাসন ব্যবস্থাকে প্রধানত রাজনৈতিক ও জনপ্রিয় শিক্ষার সহায়ক বলে উল্লেখ করলেন। তিনি অনুভব করলেন যে, স্থানীয় কমিটিগুলির হাতে যথেষ্ট আর্থিক ক্ষমতা থাকা দরকার। স্থানীয় রাজস্বের উৎস তাদের জন্য স্বতন্ত্র করে দিতে হবে, তার সঙ্গে যোগ করতে হবে প্রাদেশিক সরকারের অনুদান। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কর্মচারীরা তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে থাকবে। 1882 সালে লর্ড রিপনের এই সিদ্ধান্ত স্থানীয় অবস্থা বিশেষে প্রাদেশিক শাসন কর্তৃপক্ষ রদবদল করতে পারতেন।

কতকগুলি ক্ষেত্রে ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল, যেমন, শিক্ষাব্যবস্থা, নগরে প্রহরার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা, পথঘাট এবং বিশেষ ভাবে পঞ্চায়েত সভা, তালুক-সভা ও জেলা-সভা। তারা কাজ আরম্ভ করেছিল সরকার মনোনীত কমিটি হিসাবে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা বেড়েছে 1932-37 সালে, যে সময়টাকে বলা যেতে পারে বিকেন্দ্রীকরণের তৃতীয় পর্যায়। এর মধ্যে ছিল 1909 সালের বিকেন্দ্রীকরণ কমিশন রিপোর্ট, এবং 1919 ও 1935-এর গভঃ অব ইন্ডিয়া রিপোর্ট। বিকেন্দ্রীকরণ কমিশন বলেছে যে, সাধারণ মানুষকে প্রশাসন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করবে, এমন একটি সুদৃঢ় সৌধ গড়তে হ'লে তার ভিত্তি প্রস্তর আনতে হবে গ্রামে থেকেই।[3]

কমিশনের সুপারিশ যে, প্রত্যেকটি গ্রামেই থাকবে পঞ্চায়েত; তার পরিপূরক অংশ থাকবে শহরে—মিউনিসিপ্যালিটি নামে; তার বেশিরভাগ সদস্য হবে নির্বাচিত। মিউনিসিপ্যালিটি তার নিজের সভাপতিকে নির্বাচিত করবে, কিন্তু স্থানীয় পর্ষদের সভাপতি জেলা সমাহর্তাই থাকবেন। মিউনিসিপ্যালিটির হাতে ক্ষমতা থাকবে কর ধার্য করার, এবং আয়-ব্যয়ের বার্ষিক হিসাব (**Budget**) তৈরি করার, যার মধ্যে ন্যূনতম একটি মজুত তহবিল রাখতে হবে। জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা ও জল

সরবরাহের জন্য সরকারী অনুদান পাওয়া যাবে। স্থানীয় সভাগুলি তাদের কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ করবে কিন্তু চাকুরির নিরাপত্তা বজায় রাখতে হবে। স্থানীয় সভাগুলির ওপর বাইরের নিয়ন্ত্রণ সীমার মধ্যে রাখতে হবে, উপদেশ, সুপারিশ, ও অডিটের মধ্যে। গভর্নমেন্টের অনুমোদন পূর্বাহ্ণেই নিতে হবে মিউনিসিপ্যাল সম্পত্তির ভাড়া বা বিক্রির ব্যাপারে। প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব মিউনিসিপ্যালিটির হাতেই থাকবে টাকা ও সময় থাকলে মাধ্যমিক শিক্ষার ভারও

1918 সালে গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়ার সিদ্ধান্ত—নিজেদের স্থানীয় ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে পারার মতো শিক্ষা এবং রাজনৈতিক শিক্ষা যাদের থাকবে তারা বিভাগীয় পরীক্ষার যোগ্যতার অগ্রাধিকার পাবে।

1918 সালের সরকারী সিদ্ধান্ত স্থানীয় মানুষকে বিশেষ কর্তৃত্বই দিতে চেয়েছে; তাদের বাজেট প্রস্তুত করার, কর ধার্য করা ও কাজের অনুমোদন দেওয়ার মতো ক্ষমতা ও নমনীয়তা থাকা চাই। উদ্দেশ্য হ'ল মানুষকে পুরো নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা উচিত নয়, তারা ভুলের মধ্য দিয়েই শিখবে। পণ্ডিত নেহরু, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, সর্দার প্যাটেল এবং অন্যান্য নেতারা পৌরসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন।

1908-1910 সালের রিপোর্ট, 1918'র গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়ার সিদ্ধান্ত এবং 1919 সালের গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট অনুসারে পঞ্চায়েতগুলি তাদের প্রাচীন রীতিনীতি ছেড়ে বিধিসম্মত সংস্থায় পরিণত হ'ল।

সরকারী প্রশাসনে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ভূমিকা

1935-এর গভঃ অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট সমগ্র দেশের স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাকে আমাদের সামনে এনে দাঁড় করালো। ব্যবস্থাপক/আইনসভার কাজ ও নির্বাহী ক্ষমতাকে স্বতন্ত্র করা হ'ল, যদিও কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিতে তা সীমাবদ্ধ আকারে রইল। স্বাধীনতার পরেই 1948 সালে রাজ্যের স্থানীয় স্ব-শাসন বিভাগের মন্ত্রীরা সেই প্রথম মিলিত হল ইউনিয়নের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত কাউরের সভাপতিত্বে। তাঁর হাতেই তখন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগটি ছিল। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের ভূমিকা যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, সে কথাই বিশেষ ভাবে বলা হ'ল এই সম্মিলনে।

পণ্ডিত নেহরুর কথা—"খাঁটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তিই হ'ল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা। ওপর থেকে গণতন্ত্র বসিয়ে দিলে সাফল্য নাও আসতে পারে যদি না নিচের দিক থেকে এই ভিত্তির ওপর তাকে গড়ে তোলো।"[4]

স্থান সম্বন্ধে আগ্রহ ও আঞ্চলিক জ্ঞান, তার সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ততা ও প্রাণশক্তি যুক্ত হ'লে তবেই তা স্থানীয় সংস্থাগুলির প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের উন্নয়ন ব্যবস্থার সাফল্য ও উপযুক্ততার উপাদান হয়।

স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার সুবিধা প্রথমত স্থানীয় অধিবাসীরা তাদের জটিলতা দ্রুত

এবং অল্প খরচে মিটিয়ে ফেলার সুযোগ পায় নৈকট্যের জন্য। এই পর্যায়ে কর্মচারীদের কাজের পরিধি ও অধিকার ক্ষেত্র জেলা বা রাজ্যের মতো ব্যাপক নয়। সকলেই সকলকে জানে, তাই কাজ স্বচ্ছ ও সৎ হওয়া সম্ভব হয়। দুর্নীতির ঘটনা খুব কম, কারণ কেউই নিজেকে প্রকাশিত করতে চায়না। দেশের ছেলেরা তাদের নিজেদের দেশের মধ্যেই কাজের সুযোগ পায়। সামাজিক প্রয়াস এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার কাজে গ্রামীণ/শহরের মানুষের যোগাযোগ অনেক বেশি। অধিবাসীদের ঝুঁকি থাকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে, তাই বিষয়গুলির সমাধান যুক্তিযুক্ত ও বাস্তবসম্মত হ'য়ে থাকে।

1947 সালের পর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিবর্তন

আমাদের সংবিধানের অন্যতম স্রষ্টা আম্বেদকর গ্রাম সম্বন্ধে তাঁর অভিমত জানিয়ে বলেছেন, —"স্থানীয় রীতিনীতির পয়ঃপ্রণালী, অজ্ঞতার ও সংকীর্ণচিত্ততার গুহা।"[5] কিন্তু মহাত্মা গান্ধী বলেছেন,—"পঞ্চায়েতের হাতে যত বেশি ক্ষমতা থাকবে সাধারণ মানুষের পক্ষে তত বেশি মঙ্গল।"[6] তিনি পঞ্চায়েতগুলির নবজীবন লাভ ও নতুন উদ্যমের ওপর জোর দিয়ে বলেছেন, এগুলি হ'ল পূর্ণ স্ব-শাসিত সমিতি। দেশের সমগ্র অর্থনীতি ও রাজনীতি পঞ্চায়েতকে ঘিরে গড়ে উঠুক, এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। তিনি সমকেন্দ্রিক পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলেছেন, যাতে কেউ বলতে না পারে যে একটির স্তর অন্যটির চেয়ে উঁচু। আরও সোজা কথায়, গ্রাম, তালুক, জেলা, রাজ্য ও কেন্দ্র—প্রত্যেকে প্রত্যেকের সমান হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সংবিধানে যা পাওয়া গেল তাহ'ল 40 নম্বর ধারা, (Article 40) এবং VII নম্বর তালিকার II নম্বর পত্রে স্থান লাভ; যে ধারাতে রাজ্য সরকারের ক্ষমতা আছে আইন তৈরি করার, আইন সংবিধান ও পৌরসভাগুলির ক্ষমতা সম্পর্কে, ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, মাইনিং সেটলমেন্ট অথরিটিজ, এবং অন্যান্য স্থানীয় কর্তৃত্ব যা' স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার বা গ্রাম-প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত। তাই যা আগে ঐতিহ্য ও সাধারণ আইনের ও বুদ্ধির নীতিতে স্ব-শাসিত সংস্থা ছিল, এখন তা' আইনের সৃষ্টি হয়ে উঠেছে! এখন তাদেরকে গোড়া থেকে বলতে হবে তাদের ভৌগোলিক অধিকার ক্ষেত্রে, ও কাজের পরিধি। নতুন সাংবিধানিক সংশোধনের আগে গত বিশ বছর ধরে যে জেলা ভিত্তিক ও স্থানিক উন্নয়ন পরিকল্পনার কথা হয়েছে তাতে পরিষ্কার বোঝা গিয়েছে যে, স্থানীয় সংস্থাগুলিকে উন্নয়নের মাধ্যম হিসাবেই চাওয়া হয়েছে, স্থানীয় স্ব-শাসিত পর্ষদ হিসাবে নয়। যাইহোক মানুষ চাইবেই তার স্ব-শাসনের অধিকার, তার জন্য চাই আত্মসচেতনতা ও সাক্ষরতার স্তর এবং উন্নয়নের উপকার ও সুবিধাগুলি আত্মসাৎ করার ক্ষমতা। যখন প্রাথমিক প্রয়োজনগুলিই মেটেনা, তখন উচ্চতর প্রয়োজন ঠিক করা অত্যন্ত

শক্ত। সেই সঙ্গে দেখা উচিত যে একটি স্ফুলিঙ্গ বাইরে থেকে এসে যদি মানুষের মনে আগুন জ্বালায় তবে তাও পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। এই চিন্তা থেকেই ওপর থেকে নিচে আসার ধরন গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক সাফল্যের পর, প্রত্যেকটি পরিবর্তনের সঙ্গে চলার সেই গতি কমে এসেছে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়াতে 1952 সালে আরম্ভ করা হয়েছে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, যার মধ্যে ছিল 55টি কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ব্লক; প্রত্যেকটি ব্লকে 100-120টি গ্রাম এবং তিন লক্ষ জনসংখ্যা। প্রত্যেকটি ব্লকে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ আধিকারিক কৃষি, পশুপালন, সমবায়, গ্রামস্তরের শ্রমিক এবং তিন বছরের জন্য 65 লক্ষ টাকা। ব্লক তৈরির পিছনে যে চিন্তা সক্রিয় ছিল, তা হ'ল উন্নয়নমূলক কাজে সাধারণের যোগাযোগকে বাড়িয়ে দেওয়া; তাদের সাগ্রহকে যুক্ত করা বিভিন্ন ধরনের কাজে—সাক্ষরতা ও শিক্ষা থেকে মহিলা-সমিতি স্থাপন করা পর্যন্ত; কৃষি ও চাষ সম্বন্ধে উপদেশ, সমাজকল্যাণ এবং পল্লী উন্নয়ন। যতদিন কাজ চালু ছিল, ততদিন এটি একটি পরীক্ষামূলক ভাবে ভালো কাজ ছিল, কিন্তু প্রকল্পটি বেশিদূর অগ্রসর হ'তে পারেনি। এবং কোনভাবেই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ধরনে আসেনি। দ্বিতীয় পর্যায়ে ন্যাশনাল এক্সটেনশন সার্ভিস (কমিউনিটি ব্লক-এর পরবর্তী পর্যায়) প্রথম স্তর ও দ্বিতীয় স্তর (10 বছরে) শেষ হয়ে যাওয়ার পর বিভাগগুলি জোর দিতে লাগল হায়ারার্কির ওপরে যার ফলে যে টিমস্পিরিট কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের সময়ে জেলা ও ব্লক লেভেলে দেখা দিয়েছিল, তা মিলিয়ে গেল।

বস্তুত সংবিধান গৃহীত হওয়ার পরে এবং পরিকল্পিত আর্থিক উন্নয়নের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা জাতীয়স্তরে চালু হওয়ার পরে প্রথম পরিকল্পনায় পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, "জেলাপ্রশাসনের কাজে প্রথমেই জোর দিতে হবে সাধারণ মানুষের সহযোগিতা ও সক্রিয় সমর্থনে উন্নয়ন কার্যসূচিকে রূপায়িত করা।"[7] জেলা প্রশাসনকেও ঢেলে সাজাতে হবে যাতে স্থানীয় স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়নমূলক কাজ এবং জেলা ও রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামোতে কাজের যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ঝোঁক দেওয়া হয়েছিল আর্থিক উন্নয়নের জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা ও তার সঙ্গে সামাজিক ন্যায় বিচারের ওপরে। একদিকে যেমন বোঝা গেল যে কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরে প্ল্যানিং কমিশনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার কাজ এগোতে হবে, অন্যদিকে তেমনি স্থানীয় ভিত্তিতে সাধারণ মানুষের শক্তিকে সংগঠিত করতে হবে। তার থেকে বোঝা গেল যে, দুদিক থেকেই আরম্ভ। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে কাজ করতে হবে মহলানবিশের মূলধন বিনিয়োগের ছাঁচে এবং সর্বোচ্চ স্তরে মৌলিক শিল্প সৃষ্টির পথে। একই সঙ্গে প্রশাসনের সুগঠিত একটি গণতান্ত্রিক কাঠামো পাওয়া গেল, যাতে গ্রাম্য পঞ্চায়েতগুলি যুক্ত হয়েছে

উচ্চপর্যায়ের পরিচিত সংগঠনগুলির সঙ্গে। স্ব-শাসন ও ক্ষুদ্রপরিধিতেও জন-সহযোগকে নিশ্চিত করার জন্য পরিকল্পনায় দুটি শর্ত রাখা হয়েছিল।

প্রথম স্ব-শাসন ব্যবস্থায় সমগ্র প্রশাসনকে সঙ্গে নিতে হবে, এবং ওই অঞ্চলের উন্নয়ন ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করতে হবে। নিতে হবে না আইন ও শৃঙ্খলার দায়িত্ব, বিচার বিভাগের ভার ও রাজস্ব প্রশাসনের ভার। দ্বিতীয় শর্ত, জেলার ছোট ছোট অংশে উন্নয়নের কাজে ব্যস্ত থাকা ব্লক বা তালুক সম্বন্ধে আশ্বাস দিতে হবে যে, স্থানীয় কার্যসূচি রূপায়ণের কাজে তাদের পরিষ্কার দায়িত্ব ভার দেওয়া হবে।

1957 সালে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের যোজনা-প্রকল্প সংক্রান্ত কমিটি বলবন্ত রায় কমিটিকে নিযুক্ত করেছিল জেলা প্রশাসনের পুনর্গঠনের কাজের তদন্ত করতে। এই কমিটির সুপারিশ ছিল, পঞ্চায়েত রাজ পদ্ধতিকে চালু করা, তার সঙ্গে থাকবে জেলাস্তরে জেলাপরিষদ যার কাজ হবে ব্লক (পঞ্চায়েত সমিতি) ও গ্রামের স্তরে নিচের দুটি সারির তত্ত্বাবধান করা। পঞ্চায়েত সমিতিগুলি পরোক্ষ নির্বাচনে গ্রাম-পঞ্চায়েতের মাধ্য থেকে নির্বাচিত হবে।

জেলা-পরিষদ জেলার পঞ্চায়েত সমিতিগুলির বাজেট পরীক্ষা করে অনুমোদন করবে, গভর্নমেন্ট থেকে পাওয়া টাকা বিলি করবে সমিতিগুলির মধ্যে, জেলায় ব্লক-এর প্রকল্পগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে এবং গভর্নমেন্ট ও পঞ্চায়েত সমিতিগুলির মধ্যে সংযোগ রক্ষা করবে।

অন্য দিকে গ্রামপঞ্চায়েত দায়িত্ব নেবে স্বাস্থ্যরক্ষার, পরিবারিক ব্যবহারের জন্য জলসরবরাহ, গ্রামের রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা, জমির বন্দোবস্ত, গবাদি পশু সংক্রান্ত নথিপত্র সংরক্ষণ, দুস্থের সহায়তা, পথঘাট সংরক্ষণ, কালভার্ট, ব্রীজ, ড্রেন ও ট্যাঙ্ক প্রভৃতির সংরক্ষণ, প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন, অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণমূলক কাজ, নির্বাচন এবং কর সংগ্রহ।

পঞ্চায়েত সমিতির কী কী কাজ করা উচিত সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

পঞ্চায়েত সমিতির কাজের মধ্যে পড়ে কৃষির সর্বাঙ্গীন উন্নতি, বীজ কোন্‌টা ভালো তা স্থির করা, সংগ্রহ ও বিতরণ করা, চাষের ধরনের পরিবর্তন করা, গভর্নমেন্ট ও সমবায় ব্যাঙ্কগুলির সহায়তায় কৃষিঋণের ব্যবস্থা করা, ক্ষুদ্রসেচব্যবস্থা, গবাদি পশুর উন্নতি সাধনের জন্য ব্যবস্থা, ছাগল, ভেড়া, পোলট্রি প্রভৃতির উন্নতি সাধন, শিল্প গড়ে তোলার প্রয়াস, পানীয় জল সরবরাহ। সাধারণের স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা চিকিৎসা ও ঔষধ, ব্যয় দুর্গতদের সাহায্য, ভূমিকম্প ও খরায় দুর্গতদের সাহায্য, স্থানীয় তীর্থ অথবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট যেগুলিতে স্থানীয় লোকের প্রয়োজন, সেগুলি সরানো ও তৈরি করা, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ভার নেওয়া, মিনিমাম ওয়েজেস অ্যাক্ট অনুযায়ী মজুরি স্থির করা, অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণমূলক কাজ এবং পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।

এরপরেও রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে উন্নয়ন সম্বন্ধীয় বিশেষ কোন পরিকল্পনা অথবা অন্য কোন কাজ যা স্থানীয় কোন কর্তৃত্বের হাতে দিতে চাইতে পারে রাজ্য সরকার—সেগুলির ভার নেওয়া আমরা জোর দিয়ে বলবো, যেখানে পঞ্চায়েত সমিতি বিশেষ ধরনের কোন কাজ হাতে নিতে পারবে না সেখানে ছাড়া রাজ্য সরকার অন্য কোন উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজ ব্লক এরিয়াতে নেবে না। আমরা মনে করি, যে, আমাদের আশু লক্ষ্য হওয়া উচিত দেশব্যাপী উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ যত দ্রুত ও যত যোগ্যতার সঙ্গে সম্ভব করা হোক এবং তার মাধ্যমে হোক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। গভর্নমেন্ট যখন ভালোভাবে বুঝতে পারবে যে, এই স্থানীয় পর্ষদগুলি দক্ষতার সঙ্গে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান রূপে কাজ করছে, তখনই তারা চিন্তা করবে যে, সরকারের হাতে থাকা অতিরিক্ত কাজ ও দায়িত্ব এবং তার সঙ্গে আর্থিক সংস্থানের উৎসগুলিও ঐ আঞ্চলিক কর্তৃত্বের হাতে তুলে দেওয়া যায় কিনা।[5]

কমিটি আরও ভেবেছে ঐ পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রামপঞ্চায়েতগুলির আয়ের উৎস সম্বন্ধে।

1. সমিতির জন্য তারা জমি রাজস্বের একটি নির্দিষ্ট অংশ, জমির খাজনার ওপরে সেস, প্রাথমিক শিক্ষা, জলের হার, বৃত্তিমূলক পেশা ও ব্যবসার ওপর, অস্থাবর সম্পতি হাতবদলের সময় ধার্য করের ওপর অতিরিক্ত কর (Surcharge), খেয়াঘাট, মাছের ভেড়ি থেকে আদায় করা ভাড়ার টাকা, টোল কর ও পথ, ব্রীজ, প্রভৃতির লিজ্ বা ভাড়া, তীর্থযাত্রীর কর, প্রমোদ কর, মেলা ও বাজার থেকে পাওয়া লাভের টাকা, মোটর বাহিত যানের ট্যাক্সের অংশ, সাধারণ মানুষের স্বেচ্ছাকৃত দান, এবং সরকারী অনুদান।
2. গ্রাম পঞ্চায়েতের মূল উৎসগুলি হওয়া উচিত সম্পত্তি ও গৃহের ওপর কর, বাজার, গরুর গাড়ি, বাইসাইক্‌ল্, নৌকা ও মালবাহী পশু, গরু শুল্ক (Octroi), সংরক্ষণ কর, আলো ও জলের হার, স্থানীয় বাজারে পশু-বিক্রয়ের রেজিস্ট্রেশন, কসাইখানা থেকে পাওয়া কর, এবং পঞ্চায়েত সমিতির অনুদান।

1959-এর জানুয়ারিতে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ (ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল) পঞ্চায়েতীরাজ প্রবর্তনে মত দিলেন। অন্যান্য কমিটিগুলিও রাজ্যের পর জেলাকেই স্থানীয় প্রশাসনের কেন্দ্ররূপে গড়ে তোলার অনুকূলে মত দিলেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বাস্তব দৃষ্টি উভয় দিক থেকেই দেখা যায় যে, জেলাস্তরে যে অভিজ্ঞ কর্মী পাওয়া যায়, তাদের সাহায্যে পরিকল্পনার কাজ ভালোভাবে করা যায়। একশ্রেণীর মানুষ খুব জোরের সঙ্গে জানিয়েছে যে, জেলাস্তরে **নির্বাচন** করে জেলায় শাসন কর্তৃপক্ষকে বসানো উচিত।

পঞ্চায়েতীরাজ গঠনের প্রয়াস সফল না হওয়ার কারণ কি ?

ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের অনুমোদনের সঙ্গে সঙ্গে তিনসারি পদ্ধতিতে পঞ্চায়েতীরাজ চালু হয়ে গেল রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, গুজরাট, হরিয়ানা, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক (মহীশূর), উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে। বিহারে কয়েকটি মাত্র জেলায় কাজ আরম্ভ হয়েছিল। ব্লককে পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে দেওয়া হয়েছিল প্রায় সবকটি রাজ্যেই ব্যতিক্রম শুধু মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও কর্ণাটকে, যেখানে তালুককে সে জায়গায় নেওয়া হয়েছিল। এইগুলি জেলাস্তরে জেলা-পরিষদ গঠন করেছে। জেলা থেকে জেলায় কাজে পদ্ধতিগত তারতম্য ঘটেছে—কারণ যে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব তাদের দেওয়া হয়েছে এবং যে ধরনের অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতাকে পাওয়া গিয়েছে। উন্নয়নসূচক কাজগুলিতে এবং নূতন কর্মপদ্ধতিতে প্রচুর উৎসাহ লক্ষ করা গিয়েছে কিন্তু তবুও সাফল্য আসেনি, কারণ উৎপাদন বাড়েনি। ইনটেনসিভ এগ্রিকালচারাল ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম, ইনটেনসিভ্ এগ্রিকালচারাল এরিয়া প্রোগ্রাম, হাই ইল্ডিং ভ্যারাইটি প্রোগ্রাম প্রভৃতি নতুন নতুন কার্যসূচি আরম্ভ করা হয়েছে যে সময় ও সুযোগ নষ্ট হয়েছে তার পুনরুদ্ধারে।

পঞ্চায়েতীরাজ পদ্ধতি তার পূর্ববর্তী কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের মতই মিলিয়ে গিয়েছে। অন্যান্য টুকরো টুকরো কার্যসূচি এসেছে সে জায়গায়। 1978-এ অশোক মেহতা কমিটি তার প্রতিবেদনে পঞ্চায়েতীরাজ সম্বন্ধে বলেছে—

''পঞ্চায়েতী রাজ'-এর কাহিনী উত্থান ও পতনের কাহিনী। এই প্রকল্প তিনটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে গিয়েছে—প্রথম হ'ল উত্থান (1959-64), দ্বিতীয় পর্যায় হ'ল নিশ্চলতা, জড়ত্ব (1965-69), তৃতীয়—ক্ষয় ও সমাপ্তি (1969-77)।''[9]

কর্মধারার অভিনবত্বই এ'কে 1964 পর্যন্ত ধরে রেখেছিল কিন্তু তার মধ্য দিয়ে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করার প্রবণতা মিলিয়ে যাচ্ছিল; পঞ্চায়েত সমিতি স্তরের ব্যবস্থা যেমন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জেলা স্তরে নতুন প্রতিষ্ঠান দেখা দিয়েছিল—যেমন, কর্পোরেশন, বিশেষ প্রতিনিধিমূলক সংস্থা, এবং প্রশাসনের আমলাতান্ত্রিক ধারা যা দাঁড়িয়েছিল পল্লীউন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচির (যেমন, স্মল অ্যান্ড মার্মিনাল ফারমারস্ প্রোগ্রাম, ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, ড্রাউট প্রোন এরিয়াজ প্রোগ্রাম, ডেজার্ট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, মিনিমাম নিড্স প্রোগ্রাম ইত্যাদি) ছত্রছায়ায়। দরিদ্র গ্রামবাসীর জন্য অনেক নতুন সমিতি গড়া হয়েছে। 'দি অশোক মেহেতো কমিটি'-র কথা যে, পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানগুলি বেঁচে থাকতে পারতো, যদি তাদের হাতে দায়িত্ব অর্পণ করে তাদের উৎসাহ বাড়ানো যেত, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট যা হয়েছে, গ্রামভারতে উন্নয়ন প্রয়াসের সামনেই তাদের রাখা হ'ত।

কমিটি দুইসারি পদ্ধতির সুপারিশ করেছে রাজ্যস্তরের নিচে জেলা

বিকেন্দ্রীকরণের পথে প্রথম বিন্দু এবং দ্বিতীয় বিন্দু হ'তে কতকগুলি গ্রামকে একত্র করে মণ্ডল পঞ্চায়েত গড়াতে। তিনসারি পদ্ধতি থেকে রাজ্যগুলিকে আস্তে আস্তে দুই সারি পদ্ধতিতে (two tier system) নিয়ে আসা যেত।

কয়েকটি রাজ্যে নতুন আইন বিধিবদ্ধ করা হ'ল, যেমন, কর্ণাটক জেলা পরিষদ, মণ্ডল পঞ্চায়েত, গ্রামসভা ও ন্যায়পঞ্চায়েত অ্যাক্ট অব 1983, এবং দি অন্ধ্রপ্রদেশ মণ্ডল প্রজা পরিষদ, জেলা প্রজা পরিষদ্ এবং জেলা প্রণালীকা অভিবর্দী মণ্ডলস অ্যাক্ট—1986। একমাত্র কর্ণাটকই অন্য রাজ্যগুলির সামনে স্ব-শাসনের ক্ষেত্রে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলার দৃষ্টান্ত রেখেছে; অন্যান্য রাজ্য সম্পর্কে কোন মনোমুগ্ধকর উদাহরণ দেওয়ার মতো চিত্র ফুটে ওঠার সংবাদ পাওয়া যায়নি। কারণ, ঐ পরিষদ বা মণ্ডলগুলিকে স্বাবলম্বী হওয়ার মতো অর্থসহায়তার ব্যবস্থা করা হয়নি। নির্বাচন নিয়ম মতো হয়নি। পরিকল্পনা ও অর্থের অভাবে (যেখানে টাকা ছিল সেখানেই অপব্যয় ঘটেছে) এবং অবিশ্বাস সৃষ্টি হ'তে থাকায় পঞ্চায়েতীরাজ প্রথা ধরে থাকার মতো কোন অবলম্বন পায়নি। (একমাত্র পশ্চিমবাংলায় পঞ্চায়েতীরাজ যদি সফল হয়ে থাকে, তার কারণ তীব্র রাজনৈতিক ইচ্ছা ও রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ। যার ফলে আমলাতন্ত্রকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল। এম.এল.এ.-রা তাদের বিকেন্দ্রীভূত প্রতিষ্ঠানের অংশ হয়নি, অন্যদিকে স্থানীয় রাজনৈতিক ক্যাডাররা বেশ শক্তিশালী)।

কেন্দ্রীকরণের বিরাট একটি 'পুল' তৈরি হয়ে গিয়েছে, যার ফলে ওপরের স্তরে ক্ষমতা ও কার্যসূচি পুঞ্জীভূত হ'তে চলেছে, নিচের তলা থেকে ক্ষমতা সরে যাচ্ছে। ভারতবর্ষের মতো বিরাট একটি দেশে দেশবিভাগের মতো ঘটনা এবং দেশীয় রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্তি আমাদের নেতৃবৃন্দ ও সংসদকে প্রভাবিত করেছে কেন্দ্রকে শক্তিশালী করে রাখতে; যার ফলে বিভেদকামী শক্তিগুলির সাথে যুদ্ধ করা সহজ হবে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা এবং পরিকল্পিত পথে উন্নয়ন, যার জন্য গ্রহণযোগ্য সাধারণ নীতি অগ্রাধিকার ও লক্ষ্যপথ গ্রহণ করতে হয়েছে। কেন্দ্রীকরণ অবশ্যম্ভাবী হ'য়েছে, প্রত্যেক ব্যাপারে পরিবার নিয়ন্ত্রণ থেকে ফিল্ম করায়, সরকারী অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

প্রযুক্তিবিদ্যা এই পরিবেশে যুক্ত হয়েছে, যোগ করেছে সামান্য জিনিসেও জটিলতা তাই এ'র নীতি ও গতিপথও কেন্দ্রস্তরেই করতে হয়েছে। স্থানীয় স্তরে যেগুলি শক্ত হয়ে দেখা দেয়, যেমন, আলো জ্বালানো, জল সরবরাহ, জঞ্জাল পরিষ্কার, সেগুলিই বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলি হাতে নিয়েছে—তারা এখন বিদ্যুৎ সৃষ্টি ও বিতরণের ভার নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠেছে বিদ্যুৎ তৈরির কারখানা (power

station) ও জলাধার রিসাইক্লিং-এর কারিগরিবিদ্যা। যা কিছু আঞ্চলিক, তারা বিরাট সুবিধা সমন্বিত বৃহৎ পরিবেশে সামলাতে পারে কিন্তু একথা কখনও ভাবা হয়না, তাদের দেওয়াও হয়না।

সত্তরের দশকে এসে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে সরকারী কর্মচারীদের সংখ্যা —বিভাগীয় কার্যালয়গুলিতে, পর্ষদে, লিখিত আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সংগঠনে ও কর্পোরেশনে নেওয়া হয়েছে অগণিত লোক। এই কর্মচারীরা বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষপাতী ছিলনা, নিচের স্তরে ও স্থানীয় সংস্থায় তারা যেতে চায়নি। তাদের মনোভাব ক্ষমতার দ্রুত বিকেন্দ্রীকরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সংবিধি ও স্মারকলিপি যার অনুসরণে তৈরি হয়েছে পর্ষদ, কর্তৃত্ব ও অন্যান্য সংগঠন, সেই সংবিধি ও স্মারকপত্রে সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানের নাম এবং স্থানীয় প্রশাসনের ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্বের কথা। গ্রামীণ শিল্পকে নির্ভুলভাবে দেখানো হয়েছে পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানগুলির দায়িত্ব তালিকায়। কিন্তু কৌতুকের ব্যাপার, যে, এইটিই প্রথম বিষয় যা' একটি জাতীয় কমিশনের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে 1953 সালেই। বিধিসম্মত ভাবে প্রত্যেক রাজ্যেই স্টেট বোর্ড (রাজ্য পর্ষদ) গঠন করা হয়েছে। কিন্তু যে আইনে এই পর্ষদগুলি গড়া হয়েছে। তার কোথাও উল্লেখ করে বলা হয়নি যে, গ্রামীণ শিল্প গড়ে তুলতে পঞ্চায়েতীরাজের ভূমিকা কি? জল সরবরাহ'র কথা পঞ্চায়েতীরাজের করণীয় কাজগুলির মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লিখিত, কিন্তু যে আইন জলপর্ষদ বা Water-boards সৃষ্টি করেছে, সেই আইন ঐ প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা কি তা বলেনি। উদাহরণ দেখানো যায়, জল কর্তৃত্বের ওপর কেরালার আইনে বলা হয়েছে যে, স্থানীয় শাসনের হাতে থাকা যে পদ্ধতি তখনও চলিত, তা' ঐ জল কর্তৃত্বের হাতে যাবে একটি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যেই। ক্ষমতার ঐ হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে জলসরবরাহ সম্পর্কে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সকল ক্ষমতা বাতিল বলে ধরে নিতে হবে। জলের নালাগুলির নির্মাণ ও সংরক্ষণের কাজ নিঃসন্দেহে স্থানীয় কর্তৃত্বের দৃষ্টিতে থাকা উচিত, কিন্তু কমান্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটির কোন আইনে স্থানীয় শাসনের কোন ভূমিকা আছে বলে দেখানো হয়নি।

গৃহনির্মাণ একটি বিকেন্দ্রীভূত সমস্যা। কিন্তু হাউসিং বোর্ড ও স্লাম ইমপ্রুভমেন্ট বোর্ড স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে থাকা ক্ষমতার সবটুকুই নিয়ে নিয়েছে। এখন রাজ্যের দূর প্রান্তের ছোট একটি স্কিমও ঐ পর্ষদগুলির কোন অধীনস্থ সংস্থার হাতে রূপায়ণের জন্য পাঠাতে হবে। পুরানো আইনগুলি যেমন, ইলেক্‌ট্রিসিটি সংক্রান্ত আইনে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে কিছু কিছু কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল; যেমন বিতরণের কাজ। কিন্তু এখন নীতিগত ভাবে ইলেক্‌ট্রিসিটি বোর্ড ও স্টেট গভর্নমেন্ট এই কাজগুলি আর নতুন আসা কোন কর্তৃপক্ষের হাতে দেয়না, বরং তাদের চেষ্টাই হ'ল যাদের হাতে কিছু ক্ষমতা দেওয়া আছে সেগুলি বাতিল করে দেওয়া। এখন সহজতর পথ হচ্ছে লক্ষ্যবস্তু শীর্ষে রাখা আর বিতরণ আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে।

এই কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে অর্থবৃদ্ধির উৎস যেখানে। রাজ্য সরকারের রাজস্ব আদায়ের উৎস খুবই কম। মূলধনের বাজারে তাদের প্রবেশ নেই বললেই চলে। সঞ্চয় ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত হয়েছে, ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা প্রযুক্তির ওপরে জাতীয় স্তরের বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে, যেমন, আই. ডি. বি. আই., ন্যাবার্ড, হাডকো, এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি নিজেরাই অর্থের জন্য চাপের মধ্যে আছে। আঞ্চলিক সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে সন্তুষ্ট থাকতে হয় রেজগি নিয়ে। অনেক দেশে স্থানিক/আঞ্চলিক সরকারের মূলধন নিয়োগ সরকারী মূলধনের একটা বড় অংশ; এখানে তা এক শতাংশেরও কম।

মনে রাখতে হবে যে, যদিও কেন্দ্রীকরণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমবায় সমিতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। গ্রাম থেকে রাজ্য এমনকি জাতীয় স্তরেও অনেক কাজকর্ম সমবায়ের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। এই বিষয়ে কয়েকটি কৃষিজাত পণ্যের উদাহরণ দেওয়া যায়।[10]

স্থানীয় স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি সেই পদ্ধতির মধ্যে খাপ খায়না, যা' কেন্দ্রীভূত হওয়ার দিকেই বেশি ঝুঁকে আছে। এমন ইচ্ছা যাঁরই থাক একজন রাজনীতিক, আমলাতান্ত্রিক নির্বাহী অথবা গ্রাম থেকে আসা মানুষ, তবু গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার সঙ্গে মিলছে না। আর শেষোক্ত ব্যক্তি তো এমন একটা রীতির মধ্যে বাস করেছে, যার ধরন হচ্ছে সরকারের মুখের দিকে, যে কোন প্রয়োজনেই হোক, তাকিয়ে থাকা এবং সরকারের অনুগ্রহ ও দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করে থাকা। সাধারণ মানুষ মাঝে মাঝেই নির্বাচন চায়না।

সাম্প্রতিক পরিবর্তন 73তম 74তম সাংবিধানিক সংশোধন

1992 সালে নতুন সাংবিধানিক সংশোধনগুলি আসার আগে অনেকে বলতে চেয়েছেন, তাদের মধ্যে কি যাওয়া উচিত; যেমন, কার্যভার ও অর্থের বাস্তব বিভাগ স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে। একই যুক্তিতে কেন্দ্র সরকারের কিছু কার্যভার রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার প্রস্তাব উঠেছিল। অনেকে বিস্ময় বোধ করে, কেন সংবিধান রচয়িতারা রাজ্যের নিচের স্তরে নির্বাচিত পর্ষদ গঠনের ব্যবস্থা রাখেন নি।

1987'র শেষের দিকে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী জেলা সমাহর্তাদের (district collectors) অনেকগুলি আলোচনা সভায় বসেছিলেন পঞ্চায়েতীরাজ'এর কর্মধারার পুনর্বিচারে। এই আলোচনার ভিত্তিতে কর্মী মন্ত্রণালয় থেকে একটি পেপার তৈরি করা হয়। 1988 সালের জুলাইতে সেই পেপার নিয়ে আলোচনা হয় মুখ্য সচিবদের মধ্যে। কর্মী মন্ত্রণালয়ের পরামর্শদাতা কমিটিও কতকগুলি সুপারিশ পেশ করে, প্রধানমন্ত্রী নিঃসন্দেহ হ'লেন যে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতে উপযুক্ত

সময়ে মাঝেমাঝে বাধ্যতামূলক নির্বাচন করাতে হবে এবং তাদের যোগ্য কার্যাবলীর তালিকা তৈরি করে দিতে হবে, তার সঙ্গে প্রয়োজনীয় অর্থ, আর এইগুলিকে বাস্তব রূপ দিতে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন। সংবিধানের 64তম সংশোধনের বিলকে একটি নিষ্ফল প্রয়াস বলা চলে। এই প্রয়াসকে রাজ্যের শাসন কর্তৃত্বের অধিকারে হস্তক্ষেপ বলে মনে করা হয়েছে।

এর পরে 73 ও 74তম সাংবিধানিক সংশোধন 1993 সালে অনুমোদিত হয়েছে। এই সংশোধনের ফলে পার্বত্য ও উপজাতিপ্রধান অঞ্চল ও রাজ্যে ছাড়া অন্য সকল রাজ্য রাজ্যস্তরের নিচে ত্রিস্তর (three tier) বিকেন্দ্রীকরণ বাধ্যতামূলক হয়ে গেল। ঐ তিনটি স্তরেই পাঁচবছর অন্তর নির্বাচনও বাধ্যতামূলক। রাজ্যে নির্বাচন কমিশন থাকবে ইলেকটোরাল রোল তৈরি করতে এবং পঞ্চায়েতের নির্বাচন সম্পাদন করতে। স্টেট ফাইন্যান্স কমিশন প্রত্যেক পাঁচবছরে একবার করে নিযুক্ত হবে। রাজ্য আইন প্রণয়ন করবে কর, শুল্ক প্রভৃতি আদায়ের জন্য; এবং তার অংশ পঞ্চায়েতকে দেওয়ার জন্য। রাজ্য বিধানসভায় হিসাব অডিট করানোর ব্যবস্থা স্থির করা হবে।

এপ্রিল 1994-এর মধ্যে সব রাজ্যগুলিতে আইন তৈরি হ'ল, সাংবিধানিক সংশোধনের চাহিদা মতো পঞ্চায়েতগুলিকে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দিতে তাদেরকে স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব নিয়ে কাজ করার অধিকার দিতে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণের ক্ষমতাও এর মধ্যে রয়েছে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার তাদেরকে যে স্কিমগুলি রূপায়ণের ভার দিয়েছে সেগুলির এবং সংশোধনীর সঙ্গে যুক্ত একাদশ নম্বর তালিকায় যে বিষয়গুলি (নগরপালিকার ক্ষেত্রে দ্বাদশ নম্বর তালিকা) সেগুলির ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যসম্পাদনের অধিকার এই আইনের অন্তর্ভুক্ত। এই অধ্যায়ের শেষে দুটি তালিকাই উদ্ধৃত হয়েছে। এগুলির বেশির ভাগই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচারের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় স্থানীয় পর্ষদগুলির হাতে দেওয়ার জন্য তৈরি হয়েছে। সংবিধান সংশোধনের (73 ও 74তম) গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি এখানে দেওয়া হ'ল ঃ

1. জনসংখ্যার অনুপাতে তপশিলভুক্ত জাতি ও উপজাতির জন্য আসন সংরক্ষিত রাখা; এই সংরক্ষিত আসনের অন্যূন এক তৃতীয়াংশ হবে নারীদের জন্য; সভাপতির (chairperson) জন্য রাজ্যে তপশিলভুক্ত জাতি/উপজাতির মোট জনসংখ্যার অনুপাতে আসন থাকবে।
2. রাজ্যের প্রত্যেকটি পঞ্চায়েতে নির্বাচিত আসনের (জেলা, মধ্যবর্তী বা গ্রাম) অন্যূন এক তৃতীয়াংশ নারীদের জন্য সংরক্ষিত হবে; প্রত্যেকটি স্তরে সভাপতির জন্য অন্যূন এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে।

3. স্ত্রীজাতির জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা নির্বাচন কেন্দ্রগুলির মধ্যে আবর্তিত হবে।

যা করতে হবে

1) প্রত্যেকটি স্তরে পঞ্চায়েতে সোজাসুজি নির্বাচন
2) গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির চেয়ার-পার্সনের প্রতিনিধিত্ব মধ্যবর্তী বা জেলাপঞ্চায়েতে
3) গ্রাম বা মধ্যবর্তী স্তরের চেয়ার পার্সনের প্রতিনিধিত্ব জেলাস্তরে
4) পার্ট IX-এর ধারা অনুযায়ী এম.পি., এম.এল.এ, এম.এল.সির প্রতিনিধিত্ব
5) সোজাসুজি নির্বাচিত অথবা অন্য যেভাবেই হোক, পঞ্চায়েতের সকল সদস্যের অধিকার থাকবে ভোট দেওয়ার
6) গ্রাম-পঞ্চায়েতে চেয়ার-পার্সনের নির্বাচন, হয় সোজাসুজি নির্বাচন অথবা সদস্যদের মধ্যে থেকে
7) মধ্যবর্তী বা জেলাস্তরে পঞ্চায়েতের চেয়ার-পার্সনের নির্বাচন কেবলমাত্র নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে

গ্রামগুলিতে গ্রামসভা ও পৌর-অঞ্চলে (স্বায়ত্তশাসন বিশিষ্ট) ওয়ার্ড কমিটিগুলির তালিকা তৈরি করতে হবে, স্থানীয় পর্ষদগুলির কাজে গ্রাম-সমাজের যৌথ অংশগ্রহণ কতটা; এবং তাদের সতর্ক থাকতে হবে ক্ষমতার অপব্যবহার যাতে না হয়।

জেলা প্ল্যানিং কমিটির আবির্ভাব পঞ্চায়েত ও পৌরসভাগুলির প্রকল্পগুলি এক করে জেলা উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি খসড়া তৈরি করার জন্য; ঐ খসড়াটি রাজ্যসরকারের কাছে পাঠাতে হবে। জেলা প্ল্যানিং কমিটি গড়া হবে জেলাস্তরের পঞ্চায়েত ও পৌরসভার নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে।

পৌরসভাগুলি সম্পর্কে সাংবিধানিক সংশোধনে বিমাতৃসুলভ আচরণের প্রকাশ। এ'একটা বিস্ময়ের বস্তু যে, শহর ও গ্রামাঞ্চলের স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা একটি আইনের মধ্যেই কেন দেওয়া হ'ল না। বস্তুত শহরাঞ্চলের জন্য সহানুভূতির অভাব এ'র কারণ। যদিও পঞ্চায়েতরাজ প্রসঙ্গে সংশোধন প্রস্তাব হওয়ার পরেই নগরপালিকা প্রসঙ্গে ও সংশোধন বিধিবদ্ধ হয়। যাই হোক, দুইয়েরই মূলনীতি এক ত্রিস্তর ব্যবস্থা, বাধ্যতামূলক নির্বাচন, প্রতি পাঁচবছরে নির্বাচন, তপশিলভুক্ত জাতি ও উপজাতি এবং নারীসমাজের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা; শুধু সদস্যরূপে নির্বাচনের জন্য নয়, চেয়ার-পার্সন রূপেও।

এই দুটি সাংবিধানিক সংশোধন আমাদের শাসন ব্যবস্থার উল্লেখ্য ঘটনা। ভেতরের বিষয় সম্বন্ধে বলতে হয় যে, রাজ্য বিধানসভাগুলি আসল ক্ষমতা

হস্তান্তরে অনিচ্ছুক হ'য়ে তাদের হাতে অথবা তাদের আধিকারিকদের হাতে রেখেছে পরিদর্শন, নিয়ন্ত্রণ, বাতিল সরকারী কাজের ঘোষণা, স্কিমগুলির অনুমোদন ইত্যাদি।

একটি মত, যে, যদিই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি সত্যই স্ব-শাসিত না হয়, জেলা প্ল্যানিং কমিটি পরিকল্পনা তৈরির কাজে ব্যাপৃত হবে যা বর্তমান অবস্থার ওপরে উন্নতিসাধন। এখনও অবশ্য অনেক সমস্যা আছে, যার সমাধান দরকার। যেমন, কিভাবে কেন্দ্র থেকে প্রবর্তিত স্কিমগুলি অথবা বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট স্কিম, যেগুলির মধ্যে স্থানীয় গ্রামের সম্পর্ক আছে অথচ রাজ্যব্যাপী সম্পর্ক-সূত্র, সেগুলি কিভাবে ব্যবস্থা করা হবে।

জেলা প্ল্যানিং কমিটির 80 শতাংশ আসন জেলাভিত্তিক পঞ্চায়েতীরাজ ও পৌরসভার কর্মকর্তাদের জন্য সরিয়ে রাখার পর প্রশ্ন থাকে কিভাবে বাকি অংশটায় লোক দেওয়া হবে? জেলা প্ল্যানিং কমিটির চেয়ার-পার্সন কে হ'বে? পঞ্চায়েতীরাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে কিভাবে কাজ ভাগ করে দেওয়া হবে? স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া বিষয়গুলিতে কলাকুশল আধিকারিকদের ভূমিকা কি?

তারপর আছে কর্মচারী প্রসঙ্গ। স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে শেষপর্যন্ত তাদের নিজস্ব কর্মচারী বাহিনী রাখতে হবে। সেই কর্মচারীরা তাদের নিজেদের সংগ্রহ করা এবং তাদের ওপর শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবে। জেলা সমাহর্তার ও পর্ষদের নির্বাচিত কর্তাদের মধ্যে কি সম্বন্ধ থাকবে তাও স্থির করতে হবে।

শেষ অবধি বলা যায় যে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির সাফল্য নির্ভর করবে পাঁচটি বিষয়ের ওপরে ঃ

প্রথমত, তাদের নিজেদের এবং রাজ্যসরকারকে পুরোপুরি এই পদ্ধতির মধ্যে আসতে হবে। অনেকসময় তারা নিজেরাই নিজেদের শত্রু হয়ে যায়। এক বড় ধরনের ভয় এই নতুন প্রজাতির সামনে, যে, বিভিন্ন স্তরে যে বিভিন্ন দলের লোক ক্ষমতায় আসতে পারে সেই ঘটনাকে মেনে নেওয়ার অনিচ্ছা। 1967 সালের নির্বাচনের পর কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারে যে নানা দলীয় রাজনীতির সমাবেশ ঘটল, তারই প্রতিফলন ঘটতে পারে নিচের স্তরগুলিতে। কাজেই সর্বস্তরেই এই বাস্তব সত্যকে মেনে নেওয়ার অনিচ্ছাকে বর্জন করে নতুন দায়িত্বের আহ্বানকে গ্রহণ করতে হ'বে।

দ্বিতীয়ত, আমলাতন্ত্রের প্রতিরোধকে রুখতে হবে রাজ্য ও নিচের স্তরগুলিতে উপযুক্ত কর্মীসংক্রান্ত নীতির (personnel policy) প্রয়োগ করে। বস্তুত প্রয়োজনই নীতিকে তৈরি করে। এই একটা বড় সুযোগ, যার মধ্য দিয়ে ওপরতলার পদগুলি, ও পর্ষদ, কর্পোরেশন, এবং অন্যান্য আইনানুগ কর্তৃত্বের অপ্রয়োজনীয় অংশ ছেঁটে ফেলে দেওয়া যেতে পারে। আর সেই বাড়তি কর্মচারীদের পুনর্নিয়োগ করা যেতে

পারে নতুন নতুন প্রতিষ্ঠানে নতুন ভাবে। অবশ্য রাজ্য সহজপথ খুঁজতে পারে, স্থানীয় স্ব-শাসক প্রতিষ্ঠানগুলিকে কাজ বা কর্মচারী সম্পর্কে কোন ক্ষমতা না দিতে পারে।

তৃতীয়ত, স্থানীয় নেতারা নতুন পদ্ধতিকে নিজেদের সুবিধায় ব্যবহার করেছে । সমাজের দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই না করে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে চেয়েছে; তাদের কাছে এই ব্যবস্থা নিজেদের ক্ষমতা প্রকাশের বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছে।

চতুর্থত, হিসাবপত্র লেখার পদ্ধতি, অডিট এবং দায়িত্ব সম্বন্ধে বাধ্যবাধকতা শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে হবে। অন্যথায় মনে হবে তারা অতি ক্ষুদ্রাকারে রাজ্যসরকার—সহানুভূতিহীন, দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে উদাসীন।

সবশেষে, পঞ্চায়েতীরাজ'এর কর্মকর্তা এবং সরকারী কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করতেই হবে। অথবা তাদের নিয়ে যেতে হবে কাজের সম্বন্ধে জ্ঞান ও দক্ষতা এবং সেই মনোভাবের দিকে যা পঞ্চায়েতীরাজ-এর কর্মপদ্ধতিকে কার্যকরী করবে। নারী সদস্যেরা এবং তপসিলভুক্ত জাতি ও উপজাতির সদস্যদের দিকে মন দিতে হবে তাদের শিক্ষাব্যবস্থা করে। প্রত্যেকের চিন্তাধারাতেই পরিবর্তন আসা দরকার যাতে প্রসঙ্গের পূর্বাপর দেখে সমাধানসূত্রে পৌঁছনো যায়। আমরা যদি পরিকল্পনার কাজ নিচের দিক থেকে আরম্ভ করতাম, সংবিধানকে যখন গ্রহণ করেছি তখন থেকেই এবং পরিকল্পনার কাজ যখন হাতে নিয়েছি তখন থেকে যদি স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষকে নির্বাচনের ভিত্তিতে নিয়ে আসতাম, তাহ'লে দেশের অন্য রকম ছবি দেখতে পেতাম। কিন্তু সময়ের পাথরে ঘষে ঘষে মানসিকতাও শক্ত হয়ে গেছে এবং মূল্যবোধের পতন এতদূর নিয়েছে যে এখন আর বর্তমানকে বদলানো সম্ভব হয়। তা সত্ত্বেও আমাদের সামনে এখন অন্তত সাংবিধানিক সংশোধনগুলি আছে, যার ওপর নির্ভর করে আমাদের কর্মোদ্যমকে তুলে ধরতে পারি।

◘

পরিশিষ্ট—2

ইলেভেন্থ্ সিডিউল (Article 243 G)

1. কৃষি ও কৃষিবিভাগীয় প্রসারণ
2. ভূমি উন্নয়ন, ভূমিসংস্কার কার্যের রূপায়ণ, ভূমি জমাট ও সুপ্রতিষ্ঠিত করা, মৃত্তিকা সংরক্ষণ
3. ক্ষুদ্র সেচপ্রকল্প, সেচ ব্যবস্থা, জলবিভাজিকার (water-shed) উন্নতিসাধন
4. পশুপালন, দুগ্ধ সরবরাহ কেন্দ্র, হাঁস-মুরগীপালন কেন্দ্র
5. মৎস্য চাষ
6. বন-সংরক্ষণ
7. ক্ষুদ্র বনজ উৎপাদন
8. ক্ষুদ্র শিল্প ও খাদ্য সংরক্ষণ শিল্প
9. খাদি, গ্রামীণ ও কুটিরশিল্প
10. গ্রামীণ গৃহনির্মাণ প্রকল্প
11. পানীয় জল
12. জ্বালানি ও পশুখাদ্য
13. পথ, জলনালী, সেতু, খেয়া পারাপার, অন্যান্য যানবাহন
14. গ্রামীণ বিদ্যুৎ প্রকল্প ও বিদ্যুৎ বণ্টন
15. অপ্রচলিত শক্তির উৎস
16. দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প
17. শিক্ষা—প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়
18. কারিগরি বিদ্যা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা
19. আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা ও অপ্রচলিত শিক্ষা
20. গ্রন্থাগার
21. সাংস্কৃতিক সক্রিয়তা
22. বাজার ও মেলা।

পরিশিষ্ট—3

টুয়েলভথ সিডিউল (Article 243 W)

1. নগর পরিকল্পনা, শহর উন্নয়ন প্রকল্প
2. ভূমি ব্যবহারের নিয়মাবলী, গৃহনির্মাণ
3. অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প
4. পথ ও সেতু
5. জল-সরবরাহ—গৃহ শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে
6. স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা ও আবর্জনা
7. অগ্নি সুরক্ষা ব্যবহার
8. শহরাঞ্চলে বনরক্ষণবিদ্যা, পরিবেশ রক্ষা.
9. সমাজে দুর্বলতর শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা, প্রতিবন্ধী ও মানসিকভাবে অসুস্থদের জন্যও
10. বস্তি উন্নয়ন ও বস্তির দুঃখলাঘব
11. শহরাঞ্চলের দারিদ্র্য দূরীকরণ
12. নাগরিকদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য বিধান, পার্ক, উদ্যান ও খেলার জায়গার ব্যবস্থা
13. সাংস্কৃতিক, শিক্ষাসম্বন্ধীয় ও নান্দনিক বিষয়
14. সমাধি দেওয়ার ব্যবস্থা, শবদাহ, শ্মশান ও বৈদ্যুতিক চুল্লী
15. গোচারণক্ষেত্র, পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণ
16. গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান, জন্ম ও মৃত্যুর নথিভুক্ত করার ব্যবস্থা
17. সাধারণ মানুষের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য—রাস্তার আলো, গাড়ি রাখার ব্যবস্থা বাসস্টপ ইত্যাদি
18. কসাইখানা ও চামড়ার কারখানার ওপর নিয়ন্ত্রণ।

আট

ভারতবর্ষে প্রশাসনিক সংস্কার

প্রশাসনিক সংস্কার বিষয়টি বর্তমান কালে গভীর চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছে এবং যে কোন সময়েই বিষয়টির একই গুরুত্ব। স্বাধীনতার পর থেকে গত কয়েকদশকে সূক্ষ্ম ও প্রায় অদৃশ্য এবং একই সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিবর্তন ঘটেছে প্রশাসনব্যবস্থায়— কিছুক্ষেত্রে দ্রুত ফল পাওয়া গিয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘ প্রসববেদনা, কয়েকটি ক্ষেত্রে রাজনৈতিক চিন্তা ও কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তনে (যেমন, সম্প্রতিকালের উদারনীতি ও বিশ্বজনীনতার ডাক) এবং কোথাও কোথাও মৃদু হস্তক্ষেপ ও চিন্তাধারার বদলে। অনেকেই বলবেন যে, অত্যন্ত ধীর পরিবর্তন যার কাঁপন বেশিদূরে পৌঁছচ্ছে না; কারণ কাজের ফলাফল যাঁরা ভোগ করছেন, এবং যাঁরা দর্শক তাঁরা 1947 সালের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন; তাঁদের সময়ও খুব কম। বাস্তবিক সরকারী কাজে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, প্রশাসনিক দক্ষতার সাথে আধুনিক ম্যানেজমেন্ট-এর কুশলী বিদ্যার মিলন ঘটাবার চেষ্টা হয়েছে, উদ্দেশ্য ঃ প্রশাসনে আরও বেশি ফল পাওয়া ও সংবেদনশীল মনোভাব পাওয়ার আশা । কারও কারও মধ্যে রয়েছে পেশাদারী জ্ঞান, যাঁরা বিশেষ কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়েছেন, অথবা উল্লেখযোগ্য শিক্ষণ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এসেছেন। কিন্তু ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় যে অসামান্য ও অদ্ভুত দিকগুলি রয়েছে, সেগুলি বুঝবার জন্য যে বিশেষ মনোনিবেশ ও সতর্কতার প্রয়োজন, সে কথা ছেড়ে দিলেও প্রশাসন ব্যবস্থার নতুন নতুন সমস্যা ও প্রবণতার এবং সময়ের দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য যা পাওয়া যাচ্ছে তা যথেষ্ট নয়। তারপর রয়েছে প্রযুক্তি বিদ্যার বিষয়, যা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারকে দ্রুত করে দিতে পারে, পলকের মধ্যে বার্তা পাঠাতে পারে, ছোট একটি ডিস্ক-এর মধ্যে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ম্যাটার লিপিবদ্ধ করাতে পারে—অগ্রগতির দু'একটি দিকের শুধু উল্লেখ করা হ'ল। ভারতবর্ষে আমাদের স্থান কোথায়, যখন নতুন নতুন পদ্ধতি ও প্রযুক্তিবিদ্যা যা আমাদের সুযোগ এনে দিচ্ছে দ্রুত সিদ্ধান্ত দেবার, দুর্নীতি কমিয়ে আনার এবং কাগজ ও সময়ের অপচয় বাঁচাবার?

স্বাধীনতার পূর্বে প্রশাসন সংস্কার

স্বাধীনতার পাওয়ার পরই হঠাৎ যে প্রশাসন সংস্কারের কথা ভাবা হয়েছে তা ঠিক নয়। ব্রিটিশ চেষ্টা করে গিয়েছে দেশশাসনের সবথেকে ভালো উপায়গুলি বার করতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী 1858 সালে ব্রিটিশ রাজের কাছে ভারতের শাসন কর্তৃত্বের ভার তুলে দেওয়ার পর থেকেই। কয়েকজন গভর্নর জেনারেল এবং তাঁদের পরে ভাইসরয়েরা প্রবল চেষ্টা করে গিয়েছেন এ'বিষয়ে; তাঁদের দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিও ছিল। যে শাসনভার তাঁরা হাতে নিয়েছিলেন তার উন্নতির জন্য তাঁদের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। ওয়ারেন হেস্টিংস যিনি এদেশে প্রথম গভর্নর জেনারেল, তিনি মোগল সম্রাটের পদে রাজস্ব সংগ্রহের দেওয়ানি প্রথা তুলে দিয়ে সোজাসুজি হাতে ভার নিলেন এবং জেলা ও আধিকারিক নিয়োগের রীতির প্রবর্তন করলেন। কর্নওয়ালিশের সংস্কার জমির বন্দোবস্ত, পুলিশ, বিচার বিভাগ ও জেলাপ্রশাসন। লর্ড বেন্টিঙ্ক বুঝেছিলেন যে, সামাজিক সমস্যাগুলিও প্রশাসনের অংশ; তিনি সতীদাহ প্রথার অবসান ঘটান। লর্ড ডালহাউসি এবং পরবর্তী কালে আরউইন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য যাঁরা প্রশাসনকে শান দিয়ে অগ্রগতির পথে নিয়ে এসেছেন। কি করে ওয়েলেসলির কথা ভুলে যাওয়া যায় যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কলকাতায় কলেজ অব ফোর্ট উইলিয়ম (Regulation IX of 1800)। সরকারী চাকুরিতে নিযুক্ত সিভিলিয়ানদের ঐ কলেজে তিনবছর শিক্ষার্থী হয়ে থাকতে হ'ত; সরকারী চাকরিতে তাঁদের সর্বভারতীয় ছাপ থাকত।

লর্ড ডালহাউসি শুধুমাত্র পাঞ্জাবের সংযুক্তি করণের জন্য নয়, প্রশাসনে তাঁর কেন্দ্রীকরণ নীতির জন্যও তিনি উল্লেখ্য। তিনিই প্রদেশগুলিকে তাদের বিভিন্ন দপ্তরের অগ্রগতির বার্ষিক বিবরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়েছিলেন।

1823 সালে গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলে সদস্য সংখ্যা 6 করার প্রয়াস এবং তার মধ্যে একজনকে ল' মেম্বার করা ভবিষ্যৎ আইনসভার প্রথম বীজবপন। একজন ল' মেম্বার (এবং ল' কমিশন) নির্বাহিকবর্গের কাছে বাধাস্বরূপ। ব্রিটিশ আমলে আইনসভা ও বিচার বিভাগীয় সংস্কার প্রশাসনিক সংস্কারের অংশ বলে ধরতে হবে। তার সঙ্গে ধরতে হবে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন (যেমনটা ব্রিটেন রয়েছে) সমাজ ও শিক্ষাক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ, এবং রাজস্ব ও আর্থিক সংস্কার।

ক্যানিংয়ের পোর্টফোলিও পদ্ধতিতে কাউন্সিলের সদস্যরা পুরো কাউন্সিলকে না জানিয়ে নিজের দপ্তরের কাজ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে পারতো। 1861 সালের পুলিশ অ্যাক্ট-V, যে বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক প্রদেশে একটি পুলিশ দপ্তর তৈরি হয়েছে একজন ইনস্পেক্টর জেনারেল অব পুলিশকে দপ্তরের শীর্ষে রেখে, অপরাধ সংক্রান্ত গোয়েন্দা দপ্তরের প্রধান শাখার সৃষ্টি, বেশি সংখ্যায় ভারতীয়দের চাকুরিতে নেওয়ার জন্য সরকারী চাকুরির পুনর্গঠন—এ'সমস্ততেই প্রশাসনের উদ্যমের প্রতিচ্ছবি;

সময়ের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার এবং প্রশাসনকে উপযোগী করে তোলার চেষ্টা এগুলির মধ্যে লক্ষ করা যায়।

কেন্দ্রীভূত করণের শতাব্দীব্যাপী ধারণা হঠাৎ সরে গেল 1935 সালের গভঃ অব ইন্ডিয়া অ্যাক্টের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের চাপে, যে আইনের বলে প্রদেশের জনপ্রিয় সরকার আভ্যন্তরীণ শাসনের পূর্ণ ভার গ্রহণ করেছিল। তিনটি বিভাগের চিন্তা—কেন্দ্র, প্রদেশ ও সহাধিকার ক্ষেত্র, এখনও চলছে।

পৃথিবী যেদিন আমাদের সামনে খুলে গেল, এগিয়ে এল যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন থেকেই প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে প্রসারিত করা হয়েছে বর্ধিত আয়তন এবং কাজের জটিলতার সঙ্গে (যেমন রেশন ব্যবস্থা) খাপ খাইয়ে নিতে। 1941 সালে ভারত গভর্নমেন্ট দেশের সম্পদ বৃদ্ধির উপায় ও পথ বার কবতে একটি কমিটি তৈরি করেছিল। এই সময়েই সরকারী কার্য নির্বাহিক ও রাজনৈতিক নেতার মধ্যে সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা চলে। তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও বোঝাপড়ার চেতনা ছাড়া অন্য কোন নিয়ম বা শর্ত স্থির করা যায়নি। স্বাধীনতার পর এই বিশ্বাস অর্জন করা শক্ত ব্যাপার ছিল না, কারণ নেতারা তখন সকলের কাছেই সম্মানের পাত্র ছিলেন। তাঁরা দেশের জন্য অনেক নির্যাতন ভোগ করেছেন, অনেক ত্যাগ বরণ করেছেন। সিভিল সার্ভিসের ভারতীয় কর্মচারীরা যাদের কাছে দেশ বা জাতি গঠনের কাজে কিছু আশা করা যেত না, তারাও নতুন প্রভুদের শান্তভাবেই মেনে নিয়েছে। হায়! আজ আর মন্ত্রী ও সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্কে সেই সহজ সারল্য নেই।

যুদ্ধের পর গড়া হয়েছে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কার্যসূচি। অভাব ও অনটনের নিদারুণ পেষণের মুখোমুখি হ'তে এবং নতুন দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য প্রশাসনিক পরিবর্তন 1945 সালে টোটেনহ্যাম ভার পেলেন কেন্দ্রীয় সচিবালয় পুনর্গঠনের বিষয়ে তাঁর পরিকল্পিত রিপোর্ট দিতে। টোটেনহ্যাম দেখলেন—

আসল সমস্যা সৃষ্টির কারণ "উচ্চপদস্থ অফিসারদের ওপর নির্ভরতা—খুব অল্পই অফিসার যোগ্যতাসম্পন্ন, অত্যন্ত বেশি সংখ্যক কেরানি—যারা নির্ভরযোগ্য নয়। সংখ্যার দিক থেকে বৃদ্ধি কিন্তু গুণের মান নিচু।"[1]

তিনি বুঝতে পারলেন যে, সচিবালয় ও বিভাগীয় প্রধানদের মধ্যে কাজের সুষ্ঠু বিভাজন, এবং উপযুক্ত ব্যক্তির হাতে কার্যভার অর্পণ, এর মধ্যেই রয়েছে প্রতিকার। সচিবেরা নিযুক্ত থাকবে নীতি ও রীতি বিষয়ক ব্যাপারে এবং পরিকল্পনার বিষয়ে খুঁটিয়ে দেখতে। তার ফলে সচিবালয়ের অভিজ্ঞতা বাড়বে এবং উদ্দেশ্য পূর্ণ করার পথে অগ্রসর হ'তে পারবে।

আজ পর্যন্ত অফিসে টোটেনহ্যাম পদ্ধতি ও কার্যপ্রণালী সকলে স্মরণ করে তার পদ্ধতিগত সারল্য ও সহজে কাজ উদ্ধারের জন্য।

স্বাধীনতার পর প্রশাসনিক সংস্কার

স্বাধীনতার সঙ্গে অনেক পরিবর্তন এসেছে। সাধারণ মানুষের চেতনা ও আশা আকাঙক্ষার বৃদ্ধি ঘটেছে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় মানুষের সহযোগ ও নতুন উন্নয়নমূলক কাজের মধ্য দিয়ে সরকারী তৎপরতার বিপুল প্রসার ঘটেছে। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গঠনের নীতি নতুন পরিধি টেনেছে কর্মের। ইউরোপীয়রা ভারত ত্যাগ করায় এবং মুসলমান আধিকারিকেরা পাকিস্তানে যাওয়ায় হঠাৎ কমে গেছে ওপরের তলার অফিসারদের সংখ্যা। দেশীয় রাজ্যগুলির অধিকাংশই যোগ দিয়েছে ভারতের সঙ্গে, প্রশাসনে উপযুক্ত রদবদল করতে হয়েছে এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে।

এই অবস্থার মুখোমুখি হ'তে 1947-এর জুলাই মাসে 6 জন সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয়। ওই কমিটি চাকুরির অবস্থা সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করেছে নতুন কাজ ও দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে। তারাও সুপারিশ করেছে কিভাবে মানবসম্পদকে আরও ভালো ভাবে ব্যবহার করা যায় এবং কাজের পদ্ধতির উন্নতিসাধন করা যায়। পুরনো (ICS)-দের বদলে এসেছে ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস, অন্য নতুন চাকুরির পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। তৈরি হয়েছে ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস (IPS), ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস কেন্দ্রীয় চাকুরি সমূহ, এবং সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট সার্ভিস। সঙ্গে সঙ্গে গড়া হয়েছে আই. এ. এস. শিক্ষানবিশদের প্রশিক্ষণের জন্য বিদ্যালয়।

1949 সালে এন. গোপালাস্বামী আয়েঙ্গারকে অনুরোধ করা হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যধারা সম্পর্কে একটি রিভিউ করতে। তাঁর কমিটি সাংগঠনিক পরিবর্তনগুলির বিষয়ে আলোচনা করেছিল। যেমন, কতগুলি দপ্তর/বিভাগ সৃষ্টি করা হবে, মন্ত্রণালয় ও দপ্তরগুলির নতুন বিভাগ ব্যবস্থা কি হবে এবং আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উন্নয়ন।

1950 সালে পরিকল্পনা কমিশন গড়া হয়েছে, উদ্দেশ্য দেশের সম্পদ সমূহের সব থেকে বেশি ফলপ্রসূ ও সুষম ব্যবহারের জন্য একটি ছক তৈরি করা। একবছরের মধ্যে পরিকল্পনা কমিশন এ. ডি. গোরওয়ালা কমিটিকে বসিয়েছে দেখার জন্য যে, প্রশাসনিক ব্যবস্থা উপযুক্ত কিনা; এবং পরিকল্পিত উন্নয়নের প্রয়োজন মেটাবার জন্য প্রশাসনযন্ত্র যথেষ্ট শক্তিশালী কিনা। কারণ, একথা অনুভব করা গিয়েছিল যে, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় উন্নয়নমূলক কার্যসূচি রূপায়ণের জন্য পরিচ্ছন্ন, যোগ্যতা সম্পন্ন ও পক্ষপাতশূন্য প্রশাসন ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয়। গোরওয়ালা দেখেছেন যে, সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা কার্যসম্পাদনে বিলম্ব ঘটে থাকে; আরও বড় কথা, কাজে সততার অভাব, অহেতুক হস্তক্ষেপ, তার সঙ্গে দুর্নীতির বিস্তার, আধিকারিকেরা জড়িত হতে চান না কর্মসম্পাদনে। তাঁর

সুপারিশ,—কার্যনির্বাহ ব্যবস্থাকে গতিশীল ও ফলপ্রসূ করতে এবং নির্বাহিককে সুযোগ্য ও সংবেদনশীল করে তুলতে শাসন ব্যবস্থার পুনর্গঠন দরকার।

মন্ত্রী ও তাঁর সচিবের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও বোঝাবুঝির ব্যাপারে যে সম্বন্ধ থাকা উচিত সে বিষয়ে বিশেষ ও বিশদ আলোচনা করেছেন গোরওয়ালা। মন্ত্রীর কাজ যখন তাঁর সরকারকে জনপ্রিয় করা, প্রশাসকের কাজ তখন কাজের যোগ্যতা বাড়ানো। গভর্নমেন্টের কাজ মাঝে মাঝে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলি নির্দিষ্ট করে দেওয়া, এবং সাফল্যের জন্য সবরকম চেষ্টা করা।

সচিবালয় ও বিভাগীয় প্রধানের মধ্যে সম্পর্ক

সচিব দেবেন নীতির ব্যাখ্যা ও নির্দেশাবলী, বিভাগগুলিকে নীতিরূপায়ণের জন্য স্বাধীনতা দিতে হবে। প্রশাসন বিভাগকে দিতে হ'বে অর্থ মঞ্জুর করার বিষয়ে ক্ষমতা।

তাঁর সুপারিশ, একজন মন্ত্রী ও একজন সচিবকে প্রশাসনিক সংস্কার সম্বন্ধে এবং পরিবর্তনকে চালু করার কাজ মসৃণ করার জন্য নির্দিষ্টভাবে ভার দেওয়া হোক।

আমেরিকার সরকারী প্রশাসন সংক্রান্ত অধ্যাপক পল অ্যাপ্‌ল্‌বি (Paul Appleby)1953 সালে ভারতবর্ষে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর আমন্ত্রণে এসেছিলেন সরকারী প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে অনুসন্ধান করতে। তিনি প্রশাসন সংস্কারের বিষয়ে তাঁর প্রতিবেদন পেশ করেন। তাঁর দ্বিতীয় প্রতিবেদনে তিনি সরকারী উদ্যোগকে সবল করে তোলার জন্য ভারত সরকারের ও অ্যান্ড এম (Organisation & Methods) বিভাগ স্থাপন করার সুপারিশ করলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে, এই বিভাগ (O&M Divn.) প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে কর্মক্ষমতা বাড়ানোর জন্য একটি সংহত চেষ্টা চালিয়ে যাবে। তাঁর সুপারিশ মেনে নিয়ে O&M বিভাগ স্থাপিত হয়েছে। এই বিভাগের অস্তিত্বের জানান দিতে যাতে এই বিভাগ গুরুত্ব পায়, তার জন্য ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েটে-এর কার্যালয় খোলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেকটি মন্ত্রকই প্রশাসনের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হবে, এবং সে কাজে নির্দেশ দিয়ে যাবে ও অ্যান্ড এম বিভাগ। সমবেত চেষ্টায় প্রয়োজনীয় তথ্য অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার একটি সাধারণ ভাণ্ডার গড়া হবে অর্গানাইজেশন ও মেথডস-এর কাজে।

প্রশাসনের বিবিধ ও জটিল সমস্যাগুলির মুখোমুখি হতে 1964 সালে অর্গানাইজেশন অ্যান্ড মেথডস ডিভিশনকে ডিভিশন অব অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস্'য়ে রূপান্তরিত করা হ'ল। এই ডিভিশন মিতব্যয়িতা ও অফিসের কার্যপ্রণালীর বিষয়ে দৃষ্টি দিল; কয়েকটি বাছাই করা সরকারী উদ্যোগের কার্যপদ্ধতি

ও সাংগঠনিক ব্যাপারেও। রাজ্য সরকারেও অনুরূপ বিভাগ স্থাপিত হ'ল অনুরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে।

1970 সালে অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস কমিটির (1966) সুপারিশে ডিপার্টমেন্ট অব পার্সোনেল স্থাপিত হয়েছে। এই দপ্তরটি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে থেকেছে। 1973 সালে এই বিভাগটি (ডিঃ অব পার্সোনেল) মিশে গিয়েছে ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস-এর সঙ্গে; নতুন নাম হয়েছে ডিপার্টমেন্ট অব পার্সোনেল অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস। প্রধানমন্ত্রীর অধীনে কিছুদিন থাকার পরে দপ্তরটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সামিল হয়। এখন এর নাম হয়েছে "পার্সোনেল, পাবলিক গ্রিভানসেস অ্যান্ড পেনসনস।"

গণতন্ত্রের পথে—উন্নতিলাভের জন্য ভারত সরকারের চেষ্টা দেখে পল অ্যাপলবি মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, অন্য স্থানের চেয়ে ভারতবর্ষের সততা বেশি। দায়িত্ব সম্বন্ধে বাধ্যবাধকতার জন্য লালফিতার ব্যবহার অপরিহার্য। কিন্তু লালফিতার ভয় কমানো যেতে পারে যদি চিঠিপত্রের ভদ্র উত্তর দেওয়া হয়, এবং অফিসের নিয়মাবলী ও কাজের প্রণালী আরও সরল হয়। জটিলতা ও কষ্টের সৃষ্টি হয়েছে কারণ কাউকেই সোজাসুজি দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। জেলা সমাহর্তার (collector) অফিস সম্বন্ধে তাঁর অভিমত, দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সংশয় ও গণ্ডগোলের একটি উদাহরণ। বস্তুত এখন পর্যন্ত কালেক্টরকে একজন অতিমানব ভাবা হয়, যাঁর দৃষ্টি থাকবে প্রত্যেকটি পয়সার ওপর; কোন ক্ষেত্রেই সুচারু ভঙ্গিতে কাজ করতে সক্ষম হন না, অথচ অসম্পূর্ণ সমন্বয় সাধনের চেষ্টা সব কাজেই। তিনি অফিসের কাজের জন্য উন্নত পদ্ধতিতে আধুনিকীকরণের সুপারিশ করেছেন।

1956 সালে দেওয়া তাঁর পরবর্তী সুপারিশে, তিনি সরকারী মালিকানায় যে প্রতিষ্ঠানগুলি আছে সেগুলির সংগঠন ও কার্যপ্রণালী; কর্মী নিয়োগ; প্রশাসনের সঙ্গে লোকসভার, পরিকল্পনা কমিশনের এবং কনট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয়কে কর্মদক্ষ ও গতিশীল করার প্রস্তাব দিয়েছেন।

আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির সবকটিতেই প্রশাসনিক সংস্কারের বিষয়টি নানাভাবে আলোচিত হয়েছে। নিম্নে উদ্ধৃত বিষয়গুলি বারবার লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে ঃ অখণ্ডতা রক্ষা, দুর্নীতিদমনের উপায় ও পদ্ধতি, যোগ্যতার বৃদ্ধিসাধন, আর্থিক সংযম ও সরকারী সহযোগিতা, পরিকল্পনা ও উন্নয়নের নতুন চিন্তার প্রবর্তন, শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনার উন্নততর ব্যবস্থা, আর্থিক ব্যয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা, নিরন্তর নির্দেশ ও মূল্যায়ন, নিয়মিত প্রশিক্ষণ, সতর্কতা, পরিসংখ্যান তৈরির দক্ষতা, কাজ ও দায়িত্বের নির্দেশ যাতে কার্যসূচির সুষ্ঠু রূপায়ণ ঘটে। সঠিক হিসাব রক্ষণ এবং সংবাদ সংগ্রহ ও বিতরণের উন্নত ব্যবস্থা।

সংস্কার ও পরিবর্তনের জন্য উল্লেখ্য সুপারিশ

স্বাধীনতার পর থেকে প্রায় (20) কুড়িটি কমিটি ও কমিশন বসিয়েছেন ভারত সরকার, উদ্দেশ্য ঐ কমিটি ও কমিশনগুলির কাছ থেকে প্রশাসন ব্যবস্থার সংস্কার সম্পর্কে অভিমত পাওয়া। কয়েকটি উল্লেখ্য কমিটি হ'ল ঃ

1) সেকেন্ড সেন্ট্রাল পে-কমিশন, যার গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হ'ল মেধার ভিত্তিতে পদোন্নতি। প্রশাসনের কর্মী নিয়োগ করতে হবে তার নির্বাচনের পরিধি যত বিস্তৃত হয় ততই ভালো, তার মধ্যে বিশেষজ্ঞ অফিসারের অধীনে পেশাদারী বা প্রয়োগের কাজের দপ্তর হ'লে ভালো।

2) কৃষ্ণমচারি রিপোর্ট অন ইন্ডিয়ান অ্যান্ড স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসেস অ্যান্ড প্রবলেম্স্ অব্ ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন—এই রিপোর্টে আই. এ. এস. অফিসারদের শিক্ষণ ব্যবস্থায় উন্নতির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

3) সান্তনম কমিটি রিপোর্ট অন্ প্রিভেনশন অব করাপশন (1966-67) এবং

4) অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফরমস কমিশন (1966-70) (ARC) শেষোক্তটি প্রশাসনের বিভিন্ন দিক নিয়ে 580টি সুপারিশ সমেত 20 খণ্ডের রিপোর্ট। আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন পরিচালনার যন্ত্র, কেন্দ্র-রাজ্য সম্বন্ধে, কর্মী প্রশাসন ব্যবস্থা এবং অভিযোগ নিরসনের বিষয়। এ. আর. সি. সাতটি বিশেষ বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছে ঃ

* সচিবালয়-এ নির্বাহী বিভাগগুলির মধ্যে কাজের সুষম বণ্টন; বিষয়গুলির পুনর্বিভাগ।
* সমন্বয় সাধনের উন্নত প্রয়াস
* প্রতিনিধিত্বমূলক বিভাগ ও কর্মচারী সংখ্যার হ্রাস
* শীর্ষ পরিচালন ব্যবস্থার শক্তি বাড়ানো
* কাজের বিলম্ব কমাতে বিচার বিবেচনার স্তর কমানো এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত দেওয়া; ডেস্ক অফিসার পদ্ধতি গ্রহণ
* পরবর্তী ব্যক্তি বা বিভাগকে ক্ষমতা দেওয়া।

কমিশন একই ধরনের বেতন কাঠামোর (20-25 গ্রেডস) পক্ষপাতী, করণীয় কাজের মূল্য ভিত্তিতে। আই. এ. এস. শ্রেণীতে বিশেষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জ্ঞানের উৎসাহ দেওয়ার পক্ষপাতী এই কমিশন। সকল শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় নিয়ে যাওয়ার সুপারিশও করেছে কমিশন।

যাদের শিক্ষাগত গুণ আছে আর যাদের কর্ম সম্পাদন অসামান্য এমন ব্যক্তিদের (র‍্যাঙ্কের) একই পংক্তি বা শ্রেণী থেকেও উন্নতি হওয়া প্রয়োজনীয়। সমস্ত প্রসার-মূলক বিভাগে পারফরম্যান্স বাজেটিং হওয়া দরকার বলে মনে করেছে কমিশন। তার অন্যান্য সুপারিশগুলি হল—

1. কেন্দ্রে লোকপাল ও রাজ্যে লোকযুক্ত'র নিয়োগ।
2. Ombudsman বা সতর্কপ্রহরামূলক আধিকারিক যাঁর ওপর কোন নির্বাহিকের নিয়ন্ত্রণ থাকবে না।
3. জেলাস্তরে উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণের দায়িত্ব জেলাপরিষদের হাতে দেওয়া।
4. একটি পূর্ণাঙ্গ পার্সোনেল ডিপার্টমেন্ট।

কমিশন জোর দিয়েছে হিসাব নিকাশ বা দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার বাধ্যবাধকতার ওপর সংসদীয় নিয়ন্ত্রণ আরও জোর করতে। কিন্তু একই সঙ্গে বলেছে যে, সরকারী কর্মচারীদের ওপর পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির সাধারণ ভাবে যে অবিশ্বাস তা এড়িয়ে যাওয়া দরকার। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেও প্রশাসনের সংস্কার হওয়া উচিত বলে অভিমত দিয়েছে কমিশন। কোন কোন রাজ্য সরকারও অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস কমিটি গঠন করেছে। কেরালায় 1958 সালে। প্রশাসনের সমস্ত বিভাগই গ্রামপঞ্চায়েত থেকে মহকুমা ও জেলা আঞ্চলিক আধিকারিকেরা, বিভিন্ন দপ্তর, রাজস্ব পর্ষদ, ও সচিবালয়, প্রশাসনী ব্যয় ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ, এবং সরকারী কর্মচারী, মন্ত্রী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সম্বন্ধ—এই কমিটির অধিকার ক্ষেত্রে ছিল। প্রশাসন যন্ত্রের কাজ ও পদ্ধতি, কার্যপ্রণালী ও অতীতের উদাহরণ সমস্তই নতুন করে দেখার ভার দেওয়া হয়েছিল কমিটিকে একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় এই কার্যপ্রণালী উপযুক্ত কিনা বিচার করে দেখতে। এই পুনর্বিচারের আলোকে কমিটিকে সুপারিশ করতে হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থার, যেমন,

1) উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে চলবার প্রয়োজনে প্রশাসন যন্ত্রের উন্নতি সাধন
2) সমন্বয় সাধনের উন্নততর প্রয়াস
3) সরকারী কাজের দ্রুত নিষ্পত্তি
4) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি কার্যকরী সহযোগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে গণতন্ত্রের পরিবেশ বৃদ্ধি করা।

*** পাদটীকা ঃ**

একথা বোঝা গেল যে, বিশেষজ্ঞ ও বিশেষ কাজে কুশলী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের একত্র করা উচিত প্রশাসনিক আমলাতন্ত্রের কাঠামোতে।

"প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছনোর সুযোগ এখন থাকা উচিত সমাজের সকল শ্রেণীর কুশলী ব্যক্তিদের কাছে—যেমন, বৈজ্ঞানিক, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষক, ব্যবসার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি, এবং শিল্প-ক্ষেত্রে যাঁরা অভিজ্ঞ। সরকারের প্রথম শ্রেণীর সব আসনগুলি এখন যারা শুধু চাকুরি জীবন গড়ে তুলতে ব্যস্ত তাদের জন্য সংরক্ষিত রাখা অন্যায়। যে কোন পথেই হোক একচেটিয়া অধিকার অহিতকর। এ'র থেকে আসে ক্ষমতার দুরন্ত আকাঙক্ষা শ্রেণী-সচেতনতা ও অযোগ্যতা।"

— *হনুমন্থাইয়া, চেয়ারম্যান।*

উল্লেখ্য সুপারিশগুলির মধ্যে রয়েছে—পঞ্চায়েতগুলিকে প্রশাসনের ভিত্তিস্তর করা হোক; পঞ্চায়েতগুলির হাতে নির্বাহী দায়িত্বের ভার বেশি করে দেওয়া হোক; তালুক-কাউন্সিলে নারীর প্রতিনিধিত্ব (নির্বাচিত না হয়ে থাকলে মনোনয়নে) রাখতে হবে; জেলা উন্নয়ন পর্ষদের গঠনের প্রস্তাবও বিবেচনা করতে হ'বে; দপ্তর/বিভাগগুলির হাতে আরও ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হবে; অর্গানাইজেশন অ্যান্ড মেথডস ডিভিশন গঠন করতে হবে; সচিবালয়ের কাজ নীতি নির্ধারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে; নিয়মাবলী ও কার্যপ্রণালীর নীতি তৈরি করতে হ'বে; তার সঙ্গে আর্থিক ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ, আইনসভা সম্পর্কিত কাজ, সাধারণ নির্দেশ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা... ইত্যাদি।

কমিটির অভিমত, যে চাকুরির ক্ষেত্রে প্রয়োজনে অতিরিক্ত গুণাবলীর জন্য কোন উল্লেখ রাখা হবে না। মধ্যবর্তী স্তরে সোজাসুজি নিয়োগের ব্যবস্থা থাকবে। একটি সুপরিকল্পিত প্রোমোশন পদ্ধতি এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা। আরও প্রস্তাব তার যে, চাকুরিতে নিয়োগ বাড়াবার ব্যাপারে আর্থিক নিয়ন্ত্রণ, এবং অর্থনৈতিক গবেষণার জন্য একটি দপ্তর স্থাপন। এই শেষোক্ত দপ্তরের কার্যাবলীর মধ্যে কর আদায় পদ্ধতির ওপর অধ্যয়নের সুযোগ। * কমিটির কথা, মন্ত্রীরই মুখ্য দায়িত্ব নীতি প্রণয়নের ব্যাপারে কিন্তু সে কাজে তিনি সিনিয়র কর্মচারীর (অবশ্যই সচিব পর্যায়ের) সঙ্গে পরামর্শ করবেন। সরকারী কর্মচারী তাঁর অভিমত জানানোর সময়ে নির্ভয় সারল্যে কথা বলবেন। কিন্তু তারপর মন্ত্রীর দেওয়া নির্দেশ পালন করবেন, তাঁর নিজের অভিমতের সঙ্গে মিল না থাকলেও। সাধারণ মানুষের কাছে অফিসের অভিমত ও চিঠিপত্র ভদ্র ও সংক্ষিপ্ত হবে, চিঠি দিতে যেন বিলম্ব না ঘটে এবং চিঠি যেন সহজবোধ্য হয়।

1965-তে কেরলের প্রশাসনিক ব্যবস্থার ওপরে ভেল্লোদি কমিটিও কতকগুলি সুপারিশ করেছে, পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠান, সচিবালয়ের প্রশাসন ব্যবস্থা এবং আরও অনেক বিষয়ে, সেগুলির কথা আগে বলা হয়েছে। অনেকগুলি সুপারিশ, (যেমন, সরকারী কর্মচারীদের জন্য শিক্ষণ ব্যবস্থা) গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যান্য রাজ্য সরকারও (যেমন পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য কমিটি গঠন করেছে)।

অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস কমিটির কার্যসূচির মধ্যে প্রশাসন সম্পর্কে দুটি বিষয়ে অনুসন্ধান করা হয়েছিল—রাজ্য প্রশাসন ব্যবস্থা, ও জেলাস্তরের প্রশাসন ব্যবস্থা যা বিশেষভাবে যুক্ত জেলাসমাহর্তার ভূমিকার সঙ্গে। জেলাসমাহর্তার (District collector) কাজের সঙ্গে যোগ পঞ্চায়েতী রাজের, বিভাগীয় প্রধানদের, সাধারণের অভাব অভিযোগের, সাধারণ ভাবে উন্নয়ন মূলক প্রশাসন এবং তাঁর নিজের অবস্থান গভর্নমেন্টের প্রতিনিধিরূপে।

ভারতবর্ষের প্রশাসন ব্যবস্থার পুরো ক্যানভাস জুড়ে প্রশাসন ব্যবস্থার এই

রূপ। সাধারণ মত এই যে, উন্নয়নের ধারার গতি বেড়েছে বলেই প্রশাসনের ওপর নতুন দাবি আসবে। প্রশাসনিক যন্ত্রকে তাই নতুন দাবি পূর্ণ করার জন্য সবসময়েই পথ পরিবর্তন করতে হ'তে পারে।

প্রত্যেক রাজ্যেই 'ও' অ্যান্ড 'এম' ইউনিট খোলা প্রয়োজনীয় বোধ হয়েছে। এই ও অ্যান্ড এম ইউনিটের কাজ প্রশাসনিক কাঠামো ও কর্মপদ্ধতির উন্নতির জন্য প্রশাসনের বিষয়ে সর্বক্ষণ বিশদ অনুসন্ধান।

কমিটির অভিমত, রাজ্য সরকারগুলি মিতব্যয়িতা অভ্যাস করবে, এবং কর্মচারীদের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রবণতাকে প্রশ্রয় দেবেনা। পার্সোনেল ডিপার্টমেন্ট স্থাপন করতে হবে—

ক) উদ্দেশ্য, মানবশক্তির শিক্ষণ ব্যবস্থা ও ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নয়ন পরিকল্পনা।

খ) স্টেট পাবলিক সার্ভিস কমিশন ও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা

গ) উচ্চতর পদের জন্য কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ এবং

ঘ) কর্মী প্রশাসনের বিষয়ে গবেষণা। প্রত্যেকটি রাজ্যে বিভিন্নস্তরের আধিকারিকদের শিক্ষণ ব্যবস্থার জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান।

1975 সালের প্রথম দিকে দুজন বিশিষ্ট প্রশাসক এল. পি. সিং ও এল. কে. ঝা প্রশাসনে কর্মদক্ষতা বাড়াবার জন্য একটি নোট তৈরি করে দেন প্রধানমন্ত্রীকে। প্রধানমন্ত্রী সেই নোটের নকল পাঠিয়ে দেন তাঁর মন্ত্রীসভাকে, সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে, রাজ্যপাল ও কেন্দ্র অধিকৃত অঞ্চলের লেঃ গভর্নরদের কাছে। যে কুড়ি দফা প্রশাসন নীতি সেই নোটে তৈরি করা হয়েছিল, সেগুলি এখানে সংক্ষেপে দেওয়া হ'ল ঃ

* কাজের আবহাওয়া ও অফিসের পরিবেশের উন্নতিসাধন
* সময়ানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা রক্ষা
* ও অ্যান্ড এম'এর প্রবর্তন, যাতে কাজের বিলম্ব হওয়া কমে যায়; কর্মচারীদের সংখ্যা যথোপযুক্ত কিনা তার পরিমাপ; কর্মীদের কল্যাণমূলক কাজ ও অফিসের তত্ত্বাবধান
* বিধান সংক্রান্ত উপদেশের বিকেন্দ্রীকরণ
* প্রশিক্ষণ
* প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল বসানোর প্রয়োজনীয়তা
* আদালতে যাওয়া বিষয়গুলির বিশ্লেষণ
* কর্মী নিয়োগের সমস্যায় ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সাহায্য গ্রহণ।

সংস্কার সম্পর্কিত প্রক্রিয়া

1976 সালের মে মাসে প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নতি ও পরিচালন সম্পর্কিত সমস্যার

বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীদের অধিবেশনে ৪0টি সুপারিশের ভিত্তিতে কতকগুলি রাজ্য স্বতন্ত্রভাবে পার্সোনেল অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস সংক্রান্ত দপ্তর স্থাপন করেছেন।

সচিবালয়ের দপ্তরগুলিতে ও বিভাগীয় প্রধানদের অর্থনীতিক ক্ষমতার দায়িত্ব অনেক বেশি পরিমাণে দেওয়া হয়েছে;

সরকারী কর্মচারীদের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হ'য়েছে;

প্রশাসন যেখানে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সোজাসুজি সংস্পর্শে আসছে, (at the cutting-edge level) সাধারণের সুবিধার জন্য নিয়মাবলী, কার্যপ্রণালী ও আইনের নির্দেশগুলি যথাসম্ভব সরল করা ও কার্যধারা উন্নত করা হয়েছে;

প্রশাসনের কাজে সমন্বয় সাধনেব পদ্ধতির উন্নতি করা হয়েছে;

কাজের মূল্যায়ন পদ্ধতিরও পরিবর্তন করা হয়েছে;

কর্মচারীদের অভাব অভিযোগগুলির দ্রুত খতিয়ে দেখার জন্য স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল গড়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত প্রয়াসেরও প্রশংসা করা উচিত। কয়েকবছর আগে একজন তরুণ সমাহর্তা* অনেক পরিশ্রম করেছিলেন তাঁর অফিসের পরিবেশের উন্নতি ও আধুনিকীকরণের জন্য। তিনি কর্মচারীদের সিনিয়রিটির তালিকা তাঁর সময় পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে এসেছেন, প্রোমোশন ও ট্রান্সফারের নীতিগুলি প্রবর্তনের কাজে স্বচ্ছতা এনেছেন যার ফলে কর্মচারীদের মনে আত্মমর্যাদা ও অফিসের জন্য গর্ববোধ জেগেছে। অফিসে ভালো আলো বাতাসের ব্যবস্থা করেছেন; অফিসের আসবাবপত্রে সৌন্দর্যবোধ এনেছেন, ও তাঁর নির্দেশে উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা অধীনস্থদের কাজের শিক্ষা দিয়েছেন, রেকর্ডরুম থেকে অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরিয়ে তার আকৃতিকে ভদ্রস্থ করেছেন; প্রয়োজনীয় বই, খাতা ও রেজিস্টার সুচারুভাবে সাজিয়ে কাজের সুবিধা এনেছেন; অফিসের মধ্যে একটি সুস্থ ও রুচিসম্মত আবহাওয়া গড়ে তুলেছেন, সাধারণ মানুষের অপেক্ষার সময় কমিয়েছেন; ছোট ছোট বুকলেট ছাপিয়ে অফিসের কার্যপ্রণালীকে সহজবোধ্য করেছেন; .... উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোন সহায়তা পাননি তিনি, তবু অফিসের এই পরিবর্তন ঘটাতে একবছরের বেশি সময় তাঁর লাগেনি। তাঁর কাজের ফল যখন দেখা গেল, তাঁর পরিকল্পনাকে গ্রহণ করার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। কিন্তু এখন কেউ আর কোন ধরনের সংস্কারের কথা বলে না।

সংস্কারের কাজ—ইউনাইটেড কিংডমে

ব্রিটেনের হাত থেকে আমরা প্রশাসনব্যবস্থা যেমন ছিল তেমনি ভাবেই পেয়েছি।

* Lakhina of the Maharashtra Cadre of IAS.

কিন্তু সেই ব্রিটেনের অবস্থা এখন কেমন? প্রশাসন সংস্কারের ক্ষেত্রে তারা কিভাবে এগিয়েছে?

আমরা ফুলটন [Fulton] কমিটির রিপোর্টের কথা ভাবতে পারি। 1966-68 সালে দেওয়া ঐ রিপোর্টে সরকারী চাকুরির কাঠামো নিয়োগ ব্যবস্থা ও পরিচালন পদ্ধতি এবং স্যার ডেরেক রাইনার যিনি মার্কস অ্যান্ড স্পেনসারস-এর পরিচালনার কাজে কাগজের অপচয় বাঁচিয়েছেন, তাঁর মিতব্যয়িতার কথা আলোচনায় আনতে পারি। আশির দশকের আরম্ভে সরকারী দপ্তরগুলির অবস্থা বুঝতে গিয়ে তিনি যে প্রশ্নগুলি করেছিলেন, সেগুলিও চোখের সামনে রাখতে পারি ঃ

এই সংগঠন কি কাজ করে, কি তার খরচ, উদ্দেশ্যই বা কি? অর্থাৎ ঐ কাজ থেকে কি মূল্য পাওয়া যায়? শোনা যায় যে, টাকার জন্য মূল্য (value for money) কথার বিশ্লেষণ এবং সেই হিসাবে কাজ করার ফলে বছরে প্রায় 500 মিলিয়ন পাউন্ডের (£500 million a year) মতো সঞ্চয় সম্ভব হয়েছে এবং 3000 বিভিন্ন ধরনেব সরকারী কাগজপত্র বাতিল করা হয়েছে। ফুলটনের রিপোর্টে নানা বিষয়ে জ্ঞান সম্পন্ন প্রশাসকের পরিচালন দক্ষতার অভাব দুঃখজনক বলে মন্তব্য করা হয়েছে। সাধারণ প্রশাসনিক কাজের মধ্যে বিশেষজ্ঞদের প্রসার এবং সরকারী কর্মচারীদের পেশাদারী দক্ষতা অর্জনের ওপর জোর দিতে বলেছে ফুলটন কমিটির রিপোর্ট।

উল্লিখিত কমিটি যে বিষয়গুলির ওপর জোর দিয়েছে সেগুলি হ'ল ঃ

প্রশাসনে বিশেষজ্ঞদের এলাকায় নিয়োগ, যেমন অর্থনীতি, আইন, সমাজ-বিজ্ঞান, শিক্ষণব্যবস্থা ও উপযুক্ত ভবিষ্যৎ গঠনের নীতি (Appropriate career management), চাকুরিতে একটি একই ধরনের গ্রেড যার কাঠামো একটি নতুন (promotion class) শ্রেণীর ভিত্তি গড়ে দেবে। একটি সিভিল সার্ভিস বিভাগ এবং সিভিল সার্ভিস কলেজ গড়া হয়েছে।

সম্প্রতি ব্রিটেনে একটি প্রবণতা দেখা দিয়েছে সিভিল সার্ভিসের প্রাধান্য সরিয়ে সেই জায়গায় চুক্তিবদ্ধ নিয়োগ ব্যবস্থা। এর ফলে ব্যয়ভার কমবে, প্রয়োজনমতো একজন বিশেষজ্ঞকে নিযুক্ত করা যাবে। কিন্তু সিভিল সার্ভিস আর কখনও সেই আগের মতো হবে না। কারণ Generalist বা নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মানুষের অনেক সুবিধা প্রশাসনের কতকগুলি কাজে। A jack at all trades বা সব বিষয়েই আছে এমন লোকেরও প্রয়োজন হয় এবং সরকারী অফিসেও তার স্থান থাকে।

কাজ করার আরও সুযোগ

সাধারণ মানুষের জন্য সঠিক সময়ে কাজ এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রশাসন

সক্রিয় হ'তে পারে, প্রয়োজনীয় শালীনতার সঙ্গে শুধুমাত্র সঠিক মূল্যবোধ ও মনোভাবই নয়, দক্ষতা ও মিতব্যয়িতার প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতনতা মনে রেখে। কর্মীসংখ্যা ও ব্যয় কমানোর প্রয়াস কখনই প্রীতিকর হয়না। কাজেই কর্মচারী সংখ্যা ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা এবং সেই সঙ্গে ব্যয়ভার সংক্ষেপ করার যে প্রস্তাব অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস ডিপার্টমেন্ট রাজ্য বা কেন্দ্রকে দিয়েছে তা কোনসময়েই প্রসন্ন মনে কেউ গ্রহণ করেনি। কাজকে বাড়িয়ে ফাঁপিয়ে কাগজের ওপর দেখানো হয়। অনেক ক্ষেত্রে সরকারী কাজকে সংক্ষেপে নির্দিষ্ট পরিমাপের মধ্যে দেখানো যায় না বলে মিতব্যয়ের প্রশ্ন অনুল্লেখিত থেকে গেছে।

আমরা এমন একটি প্রশাসনিক পদ্ধতি চাই যা সাহায্য করবে আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্রকে স্থিরতা ও ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং সুষ্ঠুভাবে কাজ করার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বেঁচে থাকতে। একটি মত হ'ল যে, বর্তমানে অত্যন্ত জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন হ'ল যে, সরকারী কর্মচারীদের গড়ে তুলতে হবে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশ্বস্ততার বোধ, এবং তাদের সততার আচরণে বিশ্বাস। চাকুরিতে ন্যায়পরায়ণতা এখন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের দাবি রাখে—প্রশাসন সংস্কারের যে কোন পরিকল্পনাই তা সত্য। বাইরে থেকে সতর্ক চোখ দিয়ে কেউ লক্ষ রাখছে যেমন ওমবাডস্‌ম্যান অথবা লোকপাল (কেন্দ্রে) ও লোকযুক্ত (রাজ্যগুলিতে) সজাগ থাকে, সেই পরিবেশেই যে শুধু সততা থাকবে তা নয়, সুস্থ মূল্যবোধ যা'র সৃষ্টি মনের ভেতরে, তার কাছেই থাকবে সেই সততার প্রেরণা।

এখন সর্বত্র এমনকি নির্বাচন ক্ষেত্র অবধি প্রহরা ও সতর্কতার প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের জাতীয় চরিত্র। অনেকদিন আগে কর্নওয়ালিশ বলেছিলেন যে, সরকারী কর্মচারীদের বেতন যথেষ্ট ভালো হওয়া দরকার, যাতে তাদের মধ্যে অভাববোধ ও লোভ না আসে। সেই ভাবেই সোজা পথ থেকে যারা সরে যাচ্ছে তাদের জন্য কঠিন শাস্তি, এবং ঘুষ নেওয়ার ব্যাপারে দাতা ও গ্রহীতা দুজনেই দ্বিধান্বিত হবে এমন সামাজিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হওয়া খুবই দরকার হয়ে পড়েছে।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পথ যে পথে প্রশাসনিক প্রতিক্রিয়ার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হ'তে পারে, এবং বাস্তব দিক দিয়ে এটাই হ'ল প্রশাসন সংস্কারের নির্ভুল পরীক্ষা, অর্থাৎ যেভাবে প্রশাসন মানুষের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী কাজ দিতে পারে, তাহ'ল সরকারী চাকুরিকে পুরো পেশাদারী করা, গতিশীল করা ও করণীয় কাজের উপযুক্ত করে তোলা। এই ভাবে কাজ সম্ভব হতে পারে যদি উপযুক্ত পদ্ধতিতে চাকুরিতে নিয়োগ করা হয়, যদি মেধার ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়, এবং যদি ইনডাকসন থেকে আরম্ভ করে মাঝেমাঝে শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়। চাকুরিতে কাজের সঙ্গে শিক্ষা এবং ওপরের আধিকারিকদের কাছ থেকে নিরন্তর পাওয়া

নির্দেশ, এই রীতি স্থায়ী করতে হবে, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তিই সময় এলে নেতা ও শিক্ষক হতে পারে। অর্থনীতি, আইন, আর্থিক ব্যাপারে, কর্মী পরিচালননীতি ও সামাজিক সমস্যা সরকারী প্রশাসনের ভিত্তি হয়ে উঠছে। প্রত্যেকটি সরকারী কর্মচারীকে যেমন তার এলাকায় সমস্যাগুলির বিষয়ে সচেতন হতে হবে, প্রত্যেক ব্যক্তির তেমনি সুযোগ থাকবে তার জ্ঞান ও দক্ষতাকে কাজে লাগাবার। লোক নিয়োগে যেমন যত্ন নিতে হবে সব ধরনের শিক্ষাব্যবস্থাতেও তেমনি, সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ কেরিয়ার ডেভেলপমেন্ট।

সরকারী প্রশাসনে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে সবসময়ে ও সব পরিস্থিতিতে একই সত্য কাজ করবে। তাই সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থার পুরোটাই সতর্ক দৃষ্টির সামনে থাকা দরকার, দেখা দরকার যে উদ্দেশ্যগুলি সঠিকভাবে সাধিত হচ্ছে কিনা। প্রশাসনের প্রত্যেক দিনের কাজে সংকটজনক পরিস্থিতিকে আয়ত্তে রাখার প্রচেষ্টায় **গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালরা** সংস্কারের কোন কথা ভাবার সময় পায়না, তা অতিরিক্ত কেন্দ্রীকরণের প্রশ্নেই হোক, আর কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রয়োজনই হোক্। মানুষের কাছাকাছি জায়গায় দাঁড়িয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ যা তাদের সময় ও অর্থ বাঁচাতে পারে, তাদের মধ্যে যোগাযোগের আনন্দ সঞ্চার করতে পারে, তারা স্ব-শাসিত ব্যবস্থায় জীবনের আস্বাদ পেতে পারে—এমনও হ'তে পারে যে শাসন ব্যবস্থা সর্বব্যাপী, যা অন্য কোন সংগঠন পারে না সে কাজও গভর্নমেন্ট করতে পারে; হ'তে পারে যে কিছু করা দরকার—কাঠামো, আবহাওয়া, কৃষ্টি ও রীতি, পদ্ধতি ও শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে যাতে সরকারী কর্মচারীদের সততা ও কর্মদক্ষতা বেড়ে যায়। তাদের উৎসাহিত করে এবং সামাজিক-হিতে উদ্বুদ্ধ করে—এ'সমস্তই প্রশাসন সম্বন্ধীয় সংস্কার ও পরিবর্তনের মধ্যে পড়ে।

প্রশাসন সম্বন্ধীয় সংস্কার কয়েকটি প্রশস্ত বিভাগের মধ্যে পড়ে। প্রথমেই পড়ে কাঠামোগত পরিবর্তন আর সেইটাই হ'ল প্রাথমিক। 73তম ও 74তম সংশোধন (1992) সংবিধানে একটি নতুন যুগকে এগিয়ে দিয়েছে—কেন্দ্র থেকে রাজ্য অবধি শাসন পদ্ধতিতে তিনটি স্তরের সৃষ্টি করে। 1994 সালের মধ্যেই জম্মু ও কাশ্মীর বাদে সমস্ত রাজ্যেই নির্বাচন হয়ে যাওয়া উচিত ছিল গ্রাম্য এলাকায় পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানগুলিতে এবং আধা-শহরাঞ্চলে নগর পালিকায়। একথা বলা বাহুল্য হবেনা যে এই পরিবর্তন মহাত্মা গান্ধীর আকাঙ্ক্ষিত রক্তহীন বিপ্লব যার লক্ষ্য গ্রামীণ স্বরাজ ও রামরাজ্য। ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব নয়, বিশ্বাসে নির্ভর করে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়াও নয়, এ'ঘটনা হ'ল ক্ষমতার বাস্তব হস্তান্তর স্থানীয় মানুষদের হাতে। প্রশাসনের কাঠামো পরিবর্তনে এর মূল্য অনেক। এর ফলে প্রশাসনে আমাদের পূর্বযুগ থেকে পাওয়া অনেক বাস্তব সত্যের পরিবর্তন ঘটবে (যেমন জেলা সমাহর্তার ভূমিকা); ক্ষমতা ও দায়িত্ব যাবে তাদের হাতে যাদের এতদিন আমরা

বিশ্বাস করতে পারিনি তাদের স্ব-শাসনের ক্ষমতা সম্পর্কে; উপনিবেশিক শাসনের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার আগে জাতি যে অবস্থায় ছিল, সেই অবিশ্বাস থেকে তাদের মুক্তি।

এর ফল হবে যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নতুন ও বিভিন্ন ধরনের শক্তির আবির্ভাব। "জলে না নামিলে কেহ শিখেনা সাঁতার"। এই উদ্যমের মধ্য দিয়ে সাংবিধানিক সংশোধনগুলি বিধিবদ্ধ হ'য়েছে, স্থানীয় স্ব-শাসনের অধিকার পেতে। যদিও এখন পর্যন্ত রাজ্য বিধানসভার হাতে রয়েছে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের হাতে ক্ষমতার চাবিকাঠি তুলে দেওয়া।

সাম্প্রতিক কালে নীতিপরিবর্তনের দ্বিতীয় বড ঘটনাটি হ'ল উদার অর্থনীতির প্রবর্তন। আমাদের দৃষ্টিতে ছিল সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গঠন। যে ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতা থাকে সামাজিক ন্যায়নীতির পুনর্বিভাজনে, উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করা ও উৎপন্ন দ্রব্য বিতরণের কাজে রাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। এই বিতরণের কাজ হবে রাষ্ট্রায়ত্ত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। কিন্তু বিত্তশালী ও বিত্তহীনদের মধ্যে বৈষম্য দূর করার স্বপ্নই থেকে গেছে। যে পরিবর্তন সামাজিক ন্যায়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে, অর্থনীতির উন্নতিসাধন করে সেই পরিবর্তনই সাম্প্রতিক কালে গুরুত্বপূর্ণ ও অবশ্য করণীয় হয়ে উঠেছে গভর্নমেন্টের কাছে। অন্যান্য পরিবর্তনের মধ্যে "গোল্ডেন হ্যান্ডশেক"-এর মতো স্কিম যার বলে সরকারী মালিকানায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের চাকরি ছেড়ে দিয়ে একজন ব্যক্তি ভালো ক্ষতিপূরণ পায়, আবার "সেফটি নেট" যারা বিকল্প চাকরির সুযোগ পেতে প্রশিক্ষণ নেয় . তাদের সাহায্য দিতে, প্রভৃতি নানা ধরনের পরিকল্পনা আছে গভর্নমেন্টের হাতে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে রপ্তানী বাড়াতে আর আমদানি কমাতে। কন্ট্রোল ও লাইসেনসিং প্রথা এখন অতীতের বস্তু। তবুও বলা হয়, যে, প্রশাসনিক সংস্কার যার সঙ্গে থাকবে অর্থনৈতিক সংস্কারের পথে গৃহীত উল্লেখযোগ্য উদ্যম, তা'এখনও আসেনি। কার্যপ্রণালী সরল করার জন্য এবং কতকগুলি প্রাসঙ্গিক আইনের প্রয়োগ ক্ষেত্রে লাল ফিতার বাঁধন শিথিল করার জন্য সুপারিশগুলি এখনও পড়ে আছে। উল্লিখিত আইনগুলির নাম ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট রেগুলেসন অ্যাক্ট, লাইসেনসিং কোম্পানীজ অ্যাক্ট, এম. আর. টি. পি. অ্যাক্ট, ফে-রা, ফরেন কোলাবরেশন, এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট পলিসি (EXIM), ডাইরেক্ট ট্যাক্সেশন, সেন্ট্রাল এক্সাইজ, কাস্টমস, সেলস ট্যাক্স, ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল ল', স্টেট্‌লেভল প্রোসিডিওরস্ ....

বোঝা যায় যে বর্তমানের ধীর গতিতে চলা প্রণালীগুলি, এবং প্রশাসনিক জটিলতা কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিতে প্রতিযোগিতার ওপর জোর দেওয়া, বাধাগুলিকে সরিয়ে দেওয়া এবং দেশীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগে উৎসাহ দেওয়ার মতো

উদ্দেশ্যগুলিকে দূরে ঠেলে রাখছে।

অর্থনৈতিক সংস্কার বাজারে চাহিদা ও সরবরাহ্ এবং গুণের মান নির্ণয়ের নির্ধারক, তবু এখন তার জন্য সরকারী তরফে পরিকল্পনা ও নীতির রূপায়ণের তাগিদ অনেক কম। গভর্নমেন্টকে এখন শিক্ষার্থী হ'তে হবে; অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য এতদিন যে কর্মীরা ছিল এবং যে সব স্কিম ছিল তার জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হ'ত, এখন তা বাঁচাতে হবে। রাষ্ট্রের কতখানি কাজ কমেছে তার পরিমাপ করার কাজ সম্ভবত এর পরে আসবে। যখন পিছন ফিরে তাকিয়ে অর্থনীতির এই নাটকীয় পরিবর্তনের ফল কি তা বুঝবার চেষ্টা করবে। অর্থনৈতিক সংস্কারকে সফল করতে এবং তা' ধরে রাখার জন্য শুধু নতুন নিয়মের প্রবর্তনই নয়, সমস্যা যখন আসবে তখন তার মুখোমুখি হ'তে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিরও প্রয়োজন।

সম্প্রতি সরকারী চাকরি রাজনীতির দ্বারা বেশিরকম প্রভাবিত। কি করে তার প্রথম দিক্কার মর্যাদা, রাজনীতির দিক থেকে নিরপেক্ষ থাকার নীতি তারা ফিরে পেতে পারে, তা' নির্ভর করে কয়েকটি শর্তের ওপরে। প্রশাসকের তাৎক্ষণিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজনীতির সঙ্গে নিরপেক্ষতার আপোশ ঘটে; এই ব্যাপারে নাগরিক স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে আলোচনা ও ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

এর সঙ্গে যুক্ত ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সংস্কার ব্যবস্থার ক্ষেত্র হ'ল নির্বাচনের জগৎ যা সফল হ'লে আমাদের রাজনৈতিক প্রভুদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংস্কার ঘটানো হ'লে অর্থসংগ্রহ ও ব্যয়ের হিসাবটা স্বচ্ছ করে রাখতে হবে, অত্যন্ত শ্রমসাধ্য হ'লেও খরচের হিসাবটাকে নিখুঁত করতে হবে। এ ছাড়া ভোটারদের আইডেনটিটি কার্ড রাখতে হবে। দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে নেগেটিভ ভোটিং দিতে পারার ব্যবস্থা থাকা উচিত; যে সব ব্যক্তি আদালতে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত তাদের প্রার্থীপদ বাতিল হওয়া উচিত। অনুরূপ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বে থাকা কোন ব্যক্তিরও নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া উচিত নয়।

অফিসের আধুনিকীকরণ প্রয়োজন; শুধুমাত্র নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা আয়ত্ত করার জন্য, বা দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য নয়, কর্মচারীদের মনোবল বাড়াবার জন্য, তাদের কাছে আরও বেশি কাজ পাওয়ার জন্য। প্রশাসক বর্গকে দায়িত্ব দেওয়া যাতে অফিস গৃহ্ সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন থাকে, প্রশাসনিক সংস্কারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

সবশেষে বলতে হয় যে প্রশাসনিক সংস্কার সবচেয়ে বড় অংশ জুড়ে আছে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সম্পর্ক। এ'ক্ষেত্রে কাজ একদিনের নয়, সবসময়ে তাকে সজীব রাখতে হবে, সুস্থ ও মসৃণ করতে হবে রাজ্যগুলির সঙ্গে কেন্দ্রের সম্পর্ক। এ'র মধ্যে অনেক অংশ জুড়ে আছে সাধারণ মানুষের স্বার্থ। কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের, একরাজ্যের সঙ্গে অন্যরাজ্যের পারস্পরিক সম্বন্ধ যদি সুস্থ ও সুন্দর হয়, তবেই ঐক্য বিরাজ করবে রাষ্ট্রে।

জল ও নদী নিয়ে বিরোধ সেই ঐক্যের অন্তরায়। যে সব অঞ্চলে জলের অভাব, সেখানে জল সবচেয়ে বড় প্রয়োজনের বস্তু; তাই জল নিয়ে বিরোধ যদি মিত্রতাপূর্ণ পরিবেশে মিটিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে আরও বড় একটি পরিবেশ গড়ে ওঠে দেওয়া ও নেওয়ার। কতকগুলি রাজ্য উন্নতির পথে যখন অগ্রসর হয়ে চলেছে, তার পাশে অন্যগুলি হয়তো দারিদ্র্যের মধ্যে ডুবে আছে। প্রশাসনে কি ধরনের পরিবর্তনের প্রয়োজন এবং কখন, তা স্থির হবে পরিস্থিতির দিকে চেয়ে। 1956 সালে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগুলির পুনর্গঠনের পরে প্রশাসনের কাজে বিস্ময়কর তৎপরতা দেখা গিয়েছিল। সবচেয়ে বেশিসংখ্যক মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি হিত, এই নীতিতে প্রশাসকবর্গ তখন উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন।

পরিবর্তনকে ফলপ্রসূ করতে হ'লে প্রশাসন সম্পর্কিত সংস্কারগুলিকে বর্তমান প্রশাসন ব্যবস্থার ওপরেই গড়ে তুলতে হবে। প্রত্যেক প্রশাসকের মনে গাঁথা হয়ে থাকবে দেশের আয়তন। গৃহিণী যেমন গৃহের উন্নতির জন্য কোথায় কি প্রয়োজন, সে বিষয়ে সচেতন থাকেন, প্রত্যেক প্রশাসককেও তেমনি সচেতন হতে হবে তাঁর কাজের প্রণালীকে এবং প্রতিদিনের কর্মপদ্ধতিকে সুন্দর ও সহায়ক করে রাখতে।

নীতিপ্রণয়ন ও তার রূপায়ণের দায়িত্ব আছে বলেই প্রশাসক তাঁর দপ্তরকে এবং কর্মচারীদের নির্দেশ ও সহায়তা দেবেন। অনুসন্ধিৎসু ও দ্রুত সমাধানে উৎসুক, তাঁকে সমস্যাগুলির কথা জানতে হবে, এবং যেসব সমস্যা হঠাৎ সৃষ্টি হয়, সেগুলি সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। একটি সংগঠনের প্রত্যেক সদস্যকে জানতে দিতে হবে সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি, আর তার কাছে সে বিষয়ে কি আশা করা হচ্ছে। তাঁকে আত্মবিশ্বাস অর্জনে সাহায্য করতে হবে, জানতে দিতে যে তার কাজ যদি সঠিক হয়, তাকে সহায়তা দেওয়া হবে। যদি কোন কর্মীকে সংগঠনের বৃহত্তর উদ্দেশ্যর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তার নিজস্ব লক্ষ্য স্থির করে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে তার কার্যধারা আরও ভালো হবে বলে অনুমান করা যায়। সে জন্যই বলা হয়,—"একজন মানুষকে আদেশ দাও, সে কাজটি হয়তো সম্পাদন করতে পারে। কিন্তু তাকে তার নিজস্ব লক্ষ্য স্থির করতে দাও, তাকে স্বাধীনতা ও কর্তৃত্ব দাও, তার কাছে কাজ তার ব্যক্তিগত আদর্শ হয়ে উঠবে।"

এইভাবে, প্রশাসনিক সংস্কার ও সংস্কারজনিত পরিবর্তনগুলি, তার প্রক্রিয়া ও প্রণালী প্রত্যেক প্রশাসকের মনে উদ্বেগের কারণ হবে। এমন কিছু হবে না যা অন্য দপ্তরের হাতে ছেড়ে দিতে হবে।

সরকারী প্রশাসনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ও প্রত্যেকটি দপ্তরে, বড় বা ছোট যাই হোক সর্বত্রই সংস্কারের কাজ হবে একটি বিরামহীন প্রক্রিয়া; প্রত্যেক প্রশাসক ও তাঁর দপ্তরের কাছে এই কাজ তাঁর বা তাঁদের প্রশাসনিক কর্তব্যের অন্তর্গত হবে।

নয়

শাসন কর্তৃপক্ষের ভূমিকা—সাম্প্রতিক পরিবর্তন

1970 সালের শেষ পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে পৃথিবীব্যাপী একটি প্রবণতা ছিল, সাধারণ সমস্যাগুলিরও সমাধান খুঁজতে গভর্নমেন্টের কাছে যাওয়া। জীবনের ক্রমবর্ধমান সমস্যাগুলি সাধারণ মানুষের সমস্যা বলে গণিত হল, আর সঙ্গে সঙ্গে শাসন কর্তৃপক্ষের আয়ত্ত ও ভূমিকা দুই-ই বেড়ে চলল। কমিউনিস্ট দেশগুলিতে—সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে, চীন, কিউবা ও ভিয়েতনামে, মানুষের জীবন প্রায় পুরোপুরি সরকারী নিয়ন্ত্রণে চলে গেল এবং প্রায় সবকিছুই সরকার ও প্রশাসনের অধিকার-ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াল। পশ্চিমের দেশগুলিতেও (পশ্চিম ইউরোপে, ইউ. এস. এ. ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলিতে) শাসন কর্তৃপক্ষ তার নিজের হাতেই বেশি দায়িত্বভার গ্রহণ করতে লাগল। কতকগুলি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে (যেমন সুইডেনে) শাসন কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত সরকার সম্বন্ধে ধারণা, যে, সরকার শিশুর দোলনা থেকে শেষ সমাধিভূমি পর্যন্ত মানুষের সবকিছু দেখবে, সে ধারণাকেই কার্যকরী করা হল। নতুন স্বাধীনতা পাওয়ার পর উন্নতিশীল দেশগুলিও (যেমন, ভারতবর্ষ) উন্নয়নের গুরুদায়িত্ব তার হাতে নিল, অনেক ক্ষেত্রে মূলধন যোগানো ও উদ্যোগ গড়ে তোলার সোজাসুজি ভূমিকাও।

প্রযুক্তিবিদ্যার দ্রুত অগ্রগতি এবং অর্থনৈতিক জটিলতার বৃদ্ধির সঙ্গে (এবং সামাজিক জটিলতাও) এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, যোগ্যভাবে ও সম্ভাবনাশীল পরিবেশে তারা যা করতে পারে, সরকার তার চেয়ে অনেক বেশি দায়িত্ব হাতে নিয়েছে। পশ্চিমের অনেকগুলি দেশে শাসনের ক্ষমতা পেয়েছে সরকার 1980-র দশকে মাত্র, যখন সরকারের ভূমিকা কমে যাচ্ছে। 1989 সাল থেকে নাটকীয় ঘটনা ঘটতে লাগল সোভিয়েত ইউনিয়নে ও পূর্ব ইউরোপে, ধসে পড়তে লাগল তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সৌধ। যার ফলে সেই সব দেশ, যারা কমিউনিজমে বিশ্বাস করেছিল, তাবা ভেসে গেল বিশ্বায়নের পৃথিবীব্যাপী জোয়ারে; যার মধ্যে রয়েছে প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা, এবং রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার প্রাচীন ধারা

ছেড়ে দিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের নীতিকে প্রশস্ত করা। এই ঘটনার প্রভাব অন্যদের ওপরেও পড়েছে। পূর্বে চীন দেশে ব্যক্তিগত উদ্যোগের স্থান ছিল না। আজ, বেসরকারী উদ্যোগে প্রস্তত সরকারী মালিকানায় তৈরি দ্রব্য একই সঙ্গে আমেরিকার বাজার ভাসিয়ে দিয়েছে।

ভারতবর্ষে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছে, গত এপ্রিলে (1994 সালে) গ্যাট (GATT) চুক্তিতে ভারত সই করেছে কেন। এর পক্ষে সরকারী যুক্তি—বহুজাতিক চুক্তিগুলিব মধ্যে এবং যে সব চুক্তিতে অন্যান্য দেশ যুক্ত রয়েছে সেগুলির মধ্যে দ্বিজাতিক চুক্তি পত্রের চেয়ে বঞ্চনা অনেক কম। আর নতুন পারস্পরিক নির্ভরতার অঙ্গ এই চুক্তি।

আশির দশক থেকেই ভরতবর্ষ বিশ্বমুখী বাজার ব্যবস্থার দিকে একটু একটু করে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু একটি দৃঢ় সিদ্ধান্তের পথে ভারতকে ঠেলে দেওয়ার জন্য একটি সংকটজনক পরিস্থিতির প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। 1991 সালের বৈদেশিক মুদ্রা ও রাজস্ব সম্বন্ধীয় সংকট আই. এস. এফ.-এর দ্বারস্থ হওয়া এবং অর্থনীতি সংক্রান্ত ও আর্থিক নীতির পরিবর্তন অপরিহার্য করে তুলল। ভারত আরও এগিয়ে গেল; যে ধরনের সংস্কার সচল বাজার ব্যবস্থার ওপর জোর দিয়েছে, মুক্ত অর্থনীতি যা এদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের পথ খুলে দিয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের বৃহত্তর অংশকে উন্মুক্ত করেছে, অন্যান্য দেশের সঙ্গে সেই সংস্কারের পথ নিল ভারতবর্ষ।

ঝোঁক পড়ল রপ্তানি বাণিজ্য বাড়ানোর ওপর, আমদানির পরিবর্ত চিন্তায় নয়। উদ্দেশ্য হ'ল—সরকার এখন নিজে আর শিল্পোদ্যোগ বা বিনিয়োগের পথে যাবে না, সরকার এখন নিয়ামক ও মধ্যস্থ ব্যক্তি যার হাতে থাকবে বিচারের ভার। তার শক্তি ও সম্পদ ব্যয়িত হবে মানব সম্পদ উন্নয়ন, (শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়ন পরিকল্পনায়) দারিদ্র্য মোচনের কর্মসূচি প্রণয়নে এবং সকল উন্নয়নমূলক কাজের বনিয়াদ (infrastructure), গঠনে।

সংস্কারের কাজ সম্পাদন করতে শাসন পরিষদ ও প্রশাসনের কাঠামোর পরিবর্তন ঘটাতে হ'বে। একটি মৌলিক নীতি ও কৌশল থেকে আর একটিতে যাওয়ার পথ জটিল, চাই সহায়তা, ধৈর্য ও অধ্যবসায়। চাই সরকার ও সাধারণের কাজের মধ্যে সমন্বয়। অর্থনীতিতে সরকারী হস্তক্ষেপ ও পরিচালন দক্ষতার পরিবর্তন এমনই দূরপ্রসারী যে, তার জন্য সরকারের ভূমিকারও পরিবর্তন ঘটাতে হবে। গভর্নমেন্টের আকার ও আয়তনেরও বড়রকম পরিবর্তন হবে কিনা বলা যায় না। নিয়ন্ত্রণ (control) ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত অনেকগুলি দপ্তরই এর মধ্যে গুটিয়ে নেওয়া হয়েছে। শিল্পোদ্যোগগুলির প্রত্যক্ষ পরিচালনা, কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা নীতির সঙ্গে জড়িত সতত ব্যস্ততা, এবং লাইসেনসিং প্রথা ও কন্ট্রোলের আবেশ—

এগুলির জায়গায় আসছে বেসরকারী করণ, বিকেন্দ্রীকরণ ও লাইসেনসিং প্রথার বিলোপ। নিয়ন্ত্রণের প্রাকারকে ভাঙতে (control stracture) অনেক ধাপ এগোতে হয়েছে।

1991 সালের জুলাই মাসে আরম্ভ করা শিল্পনীতির সংস্কারের মধ্যে রয়েছে (1) কয়েকটি বাছাই করা তালিকা ছাড়া শিল্প সম্বন্ধীয় লাইসেন্স প্রথার বিলোপ। ঐ বাছাই তালিকায় রয়েছে—বিপজ্জনক ও পরিবেশগত অনুভূতিশীল শিল্প প্রতিষ্ঠান। (2) বিনিয়োগ ও বিস্তারের জন্য MRTP-র গৃহের জন্য স্বতন্ত্র অনুমোদন।

যে সকল শ্রমশিল্পের নাম কেবলমাত্র পাবলিক সেক্টরের জন্য আলাদা করে রাখা ছিল, তার তালিকায় 17টির স্থানে 6টি মাত্র নাম রয়েছে। বৈদেশিক প্রযুক্তিবিদ্যা শেখার পথ সহজ হয়ে গিয়েছে। এ'সমস্তই একটি প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, লাইসেন্স-এর মাধ্যমে আমদানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উঠে গিয়েছে। ভারী যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের আমদানির শুল্ক অনেক কমে গিয়েছে। স্বর্ণ ও রৌপ্য আমদানির পথ প্রশস্ত করা হয়েছে—চোরাকারবারি বন্ধ করার জন্য । টাকার বিনিময় মূল্য এখন বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে চাহিদা ও সরবরাহের ভিত্তিতে স্থির হয়।

রাজ্যগুলিও শিল্পমূলক উৎপাদন বাড়াবার দিকে মন দিয়েছে। সোজাসুজি বৈদেশিক বিনিয়োগ ও অনাবাসীদের বিনিয়োগ বাড়াতে কমিটি গড়া হয়েছে। বিদ্যুৎ প্রকল্পে বেসরকারী সহযোগকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে; এখনও অনেক কিছু করার আছে সমগ্র অর্থনৈতিক জগতের স্থিরতা ও গঠন সংক্রান্ত পরিবর্তনের জন্য। আমলাতন্ত্রের গঠন কাঠামো সম্বন্ধে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এখানে দেওয়া হল ঃ

সরকারী ভূমিকার পরিবর্তন ঃ গণবন্টন ব্যবস্থা (P.D.S)

গভর্নমেন্ট যদি উৎপাদনের ক্ষেত্রে তার ভূমিকাকে সংক্ষিপ্ত করে নিয়ে আসার কথা ভাবে, তা হলে দরিদ্র মানুষের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে, বিতরণের ক্ষেত্রে তার ভূমিকার কথা বেশি করে ভাবতে হবে। ইতিমধ্যেই অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের (যেমন, ডাল, গম, খাওয়ার তেল ও কেরোসিন) বিতরণে গভর্নমেন্টের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে। 1992 সালের জানুয়ারিতে 1500-র বেশি অনগ্রসর ব্লকে (যেমন, খরা-অঞ্চলে, মরুভূমি অঞ্চলে) উপজাতি ও পার্বত্য অঞ্চলে পি. ডি. এস (অর্থাৎ পাবলিক ডিসট্রিবিউশন সার্ভিস)-কে নতুন করে গড়া হয়েছে এবং তার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে সাবান, ডাল ও আইয়োডাইজড লবণ। সাধারণ পি. ডি. এস. এর-তুলনায় এখানে খাদ্যশস্যের দাম কম। এই নতুন পি. ডি. এস.-এ যারা দরিদ্র নয় (non poor) তাদের বাদ দেওয়া হয়েছে। ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ার সাবসিডি দেওয়ার বোঝা কমানোও এর একটি উদ্দেশ্য। দরিদ্র মানুষকে

উদ্দিষ্ট করায় সমস্যা দাঁড়ায় এই যে, সত্যই দরিদ্র কে তা' কে জানাবে? এর উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি।

মূল্যমান বৃদ্ধির চাপকে নিয়ন্ত্রণ করা

গভর্নমেন্ট রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া থেকে ক্রমান্বয়ে ধার করে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে বাজারে টাকার সরবরাহও বাড়ছে, বাড়ছে ইনফ্লেশান বা মুদ্রাস্ফীতি। মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, যদি সরকারী ব্যয়ও কমানো হয়; সরকারী ব্যয় কমানোর অর্থ অপব্যয় বন্ধ করা এবং কর্মচারী বা স্টাফের খরচ কমানো; এবং একই সঙ্গে রাজস্ব বাড়ানো। একই সঙ্গে অর্থ ও রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে উপযুক্ত নীতি ও পথ নিতে হবে যার প্রভাব পড়বে উৎপাদন, রপ্তানি ও আমদানির ওপরে। কৃষিজাত পণ্য সম্বন্ধে সহায়ক মূল্যনীতি চাষীর স্বার্থকে যেমন রক্ষা করবে, তেমনি ব্যবহারকারী সাধারণ মানুষের। ব্যয় সঙ্কোচ অনেক সময় ন্যায়পরায়ণতার নীতির ওপর কঠোর আঘাত হয়ে পড়ে, কিন্তু সমতা বজায় রাখার পথ বার করতেই হবে। অনেকে ভীত হন যে, সবদিক থেকে অনুদান বন্ধ করলে দরিদ্র মানুষ, বিশেষ ভাবে, চাষীরা কষ্টের মধ্যে পড়বে; উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যয় সংকোচেও বেসরকারী বিনিয়োগের ওপর আঘাত পড়ার কথা। তাই কিছু বাছাবাছি করতেই হবে, তার জন্য স্বল্প ও দীর্ঘকালীন জটিলতার দিকে লক্ষ রাখতে হবে, এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের ওপর তার ফলাফলের বিস্তার কতখানি তার পরিমাপ করতে হবে।

ভারতসরকারের 'ইকনমিক সারভে ফর 1993-94" বলেছে যে, মুদ্রাস্ফীতি রোধ নির্ভর করে কয়েকটি শর্তের ওপরে, যেমন, রাজস্বের ঘাটতি থাকা, আর্থিক স্ফীতির সম্ভাবনা কমে যাওয়া, শিল্পজাত উৎপাদনের পূর্বাবস্থাপ্রাপ্তি, খাদ্যশস্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের সরবরাহ ব্যবস্থা। রাজস্ব ঘাটতি কমিয়ে আনার প্রক্রিয়া গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় প্রশাসন ও সরকারের ভূমিকাকে জটিল অবস্থার মধ্যে ফেলে দিতে পারে।

প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোকে শক্তিশালী করা

এই কাজ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিশেষভাবে অর্থনৈতিক বৃত্তে এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্যে; যেমন, ব্যাঙ্ক, ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট (NABARD), কো-অপারেটিভ সোসাইটি, এগ্রিকালচারাল রিসার্চ অ্যান্ড এক্সটেনশন এজেনসিজ, এক্সপোর্ট প্রোসেসিং জোনস, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর প্রোমোটিং স্মল স্কেল এন্টারপ্রাইজেস এবং ট্রেনিং আউটফিটস বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও তার সাজ সরঞ্জাম। দরিদ্রমুখী কর্মসূচিকে গভীর ও ব্যাপকভাবে রূপায়িত করার কাজ এগিয়ে যেতে এ'হল প্রাথমিক প্রয়োজন।

সরকারী শিল্পোদ্যোগের ভবিষ্যৎ

আর একটি আপাত বিরোধী হলেও সত্যকথা, যে, বেশির ভাগ সরকারী উদ্যোগে গড়া সংস্থা প্রচণ্ড ব্যয় বহুল কিন্তু প্রতিযোগিতাশূন্য। গভর্নমেন্টকে দুটি বিষয়ে মনস্থির করতে হবে ঃ

1. শিল্প বাণিজ্য বা ব্যবসায়ের কোন অংশ সে নির্বাচন করবে এবং কাজের জন্য বেছে নেবে? যদি প্রচণ্ড সামাজিক হিতসাধনের কাজ না থাকে, যাতে ক্ষতির দিকটা পূর্ণ হতে পারে, তাহ'লে সরকারী মালিকানা ও উৎপাদনের কাজে ব্যাপৃত থাকার দায় পরিত্যাগ করাই ভালো। এ বিষয়ে চিন্তার দরকার আছে।

2. সাধারণ মানুষের যে কাজ করা দরকার তার গুণনত মাম বাড়াতে হবে। বিস্তৃত পরিধির ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখার চেয়ে কাজের মান বাড়াবার দিকেই বেশি দৃষ্টি দেওয়া দরকার। সাধারণের জন্য প্রশাসনের সহানুভূতিশীল মনোভাব এখনও বাস্তব সত্য নয়, কাজেই কাজের প্রক্রিয়াকে সরল করে কার্যপ্রণালীকে নতুন করে গড়া দরকার। এমন ভাবে এগোতে হবে যাতে কর্মপ্রবাহে গতি ও স্বচ্ছতা আসে।

তাই যে সব সরকারী সংস্থায় কাজ চলছে না, সেই সংস্থাগুলি নিয়ে কি করা যাবে শুধু সেই চিন্তাই নয়, ভবিষ্যতেও এমন উভয়সংকট কিভাবে এড়িয়ে যাওয়া যাবে, সেই বিষয়ে নতুন করে ভাবা দরকার। ব্যক্তিগত বিনিয়োগের প্রতিযোগিতামূলক দাবিকে এড়িয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে গভর্নমেন্টকে ভাবতে হবে বিকল্প নীতির কথা; ভাবতে হবে কিভাবে বাড়ানো যায় উৎপাদন ও নিয়োগ ক্ষমতা। নীতি বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানের কাজ কেন্দ্র ও রাজ্য—উভয়স্তরেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত এখন ছেড়ে দিতে হবে সাধারণের কাছে।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাকে ফলপ্রসূ করা

আর একটি বড় কাঠামোগত পরিবর্তন যা এসেছে 73 ও 74তম সাংবিধানিক সংশোধনের ফলে, তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে হবে, উক্ত সংশোধনের ফলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা গ্রাম ও শহরাঞ্চলে 1994 সালের মধ্যেই দেখা দিচ্ছে। তার ফলে রাজ্যসরকারের আকার আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই ছোট হয়ে যাচ্ছে, কমে যাচ্ছে অফিস, দপ্তর, মন্ত্রী ও মন্ত্রণাসভা। এগুলিকে সঠিক আকারে আসতেই হবে।

এই ভাবে গভর্নমেন্ট তার টাকার সদ্ব্যবহার করতে পারে, তার সময়, উদ্যম ও অন্যান্য সম্পদের। যা করতে হবে তাই করে—আইন ও শৃঙ্খলা বাঁচিয়ে রেখে, কৃষি ও শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন বাড়িয়ে দিয়ে, উন্নতির বনিয়াদ (Infrastracture) গঠন করে, প্রযুক্তি বিদ্যাকে ছড়িয়ে দিয়ে, এবং আমাদের পরিবেশ ও প্রয়োজনের উপযোগী করে আধুনিক চেতনাকে নিয়ে এসে তার সঙ্গে মানবসম্পদকে উন্নত করে। নতুন কর্মী নিয়ে কোন নতুন সংগঠন তৈরি করা উচিত হবে না। জনহিতকর

কার্যগুলি স্থানীয় স্ব-শাসক প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দিতে হবে। কর্মচারীদের সেইমতো ছাঁটাই করতে হবে। যে সব পদ থেকে কর্মীরা অবসর গ্রহণ করেছে, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় না হ'লে সে পদগুলিতে আর লোক দেওয়া হবেনা। কেন্দ্রে বা রাজ্যে যেখানেই হোক নিচের স্তরে লোক নিয়োগ একেবারেই বন্ধ করে দিতে হবে।

বাস্তব সম্মত উদ্দেশ্য

দুটি আবদ্ধ ধারণাকে মন থেকে বিদায় দিতে হবে। একটি, সরকারই সবসময়, সর্বত্র, সবকিছু করবে সামাজিক ন্যায়ের দোহাই দিয়ে—এবং দ্বিতীয়টি, সরকার দেশের প্রধান চাকুরিদাতা—এই ধারণাগুলিকে বদলাতে হবে; তার জায়গায় চাই দুটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ঃ

* মাঝে মাঝে সরকারের ভূমিকার পুনঃপরীক্ষা, দেখতে চাওয়া যে, যে আদর্শ সামনে রাখা হয়েছে সেই পথ ধরে সরকারী নীতি অগ্রসর হয়ে চলেছে কিনা; আমাদের সংবিধানের ভূমিকায় ও অন্যান্য অংশে যে চিন্তাধারাকে তুলে ধরা হয়েছে, সেই চিন্তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা।
* ঘোষণা করতে হবে যে, সাধারণ মানুষের জন্য যে কাজ তার গুণগত মান রক্ষা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এবং প্রশাসনকে তার দায়িত্ব নিতে হবে।

সবশেষ কথা, যে কোন নতুন সংস্কারের কাজকে তার মূল্য দিতে হবে। বেশিরভাগ মানুষই মনে করে যে, দরিদ্ররাই এ'সবের বোঝা বহন করে। নীতি ও পরিকল্পনাগুলির মধ্যে তাই ফলভোগী মানুষের পুনর্বাসন ব্যবস্থা থাকা চাই। কৃষিজীবী মানুষের ওপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে, কারণ আমাদের জীবন ধারণের নির্ভরস্থান তারাই। এর জন্য যে সব সুপারিশগুলি হবে, তার মধ্যে থাকবে কৃষি সম্বন্ধীয় গবেষণার কাজের গুণ বাড়ানো, পল্লীঅঞ্চলে বিজ্ঞান সম্মত কাজের উন্নতি সাধন, শুকনো জমি চাষের সুবিধা দেওয়া, কৃষিজাত দ্রব্যকে খাদ্যদ্রব্যে পরিণত করার প্রক্রিয়ায় সহায়তা, কৃষিকার্যে অপ্রয়োজনীয় ও অনুচিত অংশগুলিকে ব্যবহার এবং জমি-সংস্কারমূলক কাজে উৎসাহ।

সংস্কারের কাজের অনেকগুলি দিক আছে—বড় থেকে ছোট, কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক—তবে এ'সবের মধ্যেই থাকে ভারসাম্য। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দুরূহতম কাজ হল, মানুষকে সংস্কারের মূল্য বোঝানো এবং তার বিভিন্ন কাজে যোগ দিতে প্রলুব্ধ করা। তার জন্য স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা চাই কাজে। এই দুটি বিষয় এক করলে আসবে পারস্পরিক সাহায্যকারী ব্যবস্থা ও ঐকমত্য; এ'কাজ করতে হবে প্রশাসনকে, তাদের সচেতন থাকতে হবে যে এই বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ, সংস্কার থেকে পাওয়া লাভক্ষতির বোঝা যতটা সম্ভব সমানভাবে ভাগ করে দিতে হবে, বিশেষভাবে এই কারণে যে, ফল পেতে দেরি হ'লেও দাম মিটিয়ে দিতে হবে সঙ্গে সঙ্গে।

অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক মান ও প্রতিযোগিতার ভাব এসেছে বলেই কৃষি, শিল্প ও কর্মের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ঢেউ তোলা দরকার। এই পরিবর্তনের পিছনে থাকবে প্রশাসনিক সংস্কার। আমলাতন্ত্রকে (বা সকল স্তরের প্রশাসকবর্গ) এখন শিল্পজগতের সঙ্গে সহযোগিতার সম্বন্ধ রাখতে হবে। পূর্বের সকল কিছু জানার ভাব ও মর্যাদা ত্যাগ করতে হবে। ফাইল পরিষ্কার করা ও কাজের প্রণালীগুলিকে যথেষ্ট সরল করতে হবে, যাতে সর্বত্র দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়; কাজের নীতি ও নকশা, কর্মক্ষেত্রে কাজের যোগ্যতার মান ও আদর্শ স্থির করে দিতে হবে। সবশেষে, প্রতারণা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ফলপ্রসূ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রশাসনের নতুন ভূমিকার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

দশ

ভবিষ্যৎ ভারতে সরকারী প্রশাসন

গভর্নমেন্টকে যে বিপুল কাজের ভার ও জটিলতা মেনে নিতে হয়েছে, সাধারণ মানুষের জীবনে তার সর্বব্যাপী যে ভূমিকা, তা আমরা দেখেছি। ১৯৪৭-এর পর থেকে আকারে প্রবল ভাবে বেড়েছে আমাদের শাসন ব্যবস্থা। একটি পরিমাপে দেখা গেছে যে, তিন দশকে (১৯৫০-৮০) কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রের সংখ্যা আড়াইশো গুণ বেড়েছে। রাজ্যগুলিতে এই বৃদ্ধি কোন কোন ক্ষেত্রে আরও বেশি। সরকারী কাজকর্ম বিপুল ও জটিল হয়েছে, পারস্পরিক নিয়মানুবর্তিতার ওপর নির্ভরশীল ও সময়ক্ষয়কারী; পরিচালনা করা প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। সরকারী কর্মচারীদের হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে কাজ করতে হয়, কোটি কোটি টাকার কর্মসূচি তাদের নাড়াচাড়া করতে হয়; তাদের জানতে হবে কিভাবে পটভূমিকা ও পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে হবে; বিশৃঙ্খলা ও নীতিহীনতাকে বাদ দিয়ে কিভাবে গণতন্ত্রের দাবিকে পূর্ণ করতে হবে। তাদের জানতে হবে, কিভাবে সহানুভূতিশীল হওয়া যায়, সাধারণকে জানতে দিতে হয় সরকারী সিদ্ধান্তের ফলাফল।

কথা আছে, স্থির হয়ে দাঁড়াতে হ'লে দ্রুত দৌড়তে হয়। সরকারী প্রশাসন ছাড়া অন্য কোন কর্মক্ষেত্রে এই প্রবাদটি বেশি পরিস্ফুট নয়। কি করতে হবে তা জানার আগেই, বিভিন্ন স্তরে,—রাজ্য, জাতীয়স্তরে বা বিশ্বজুড়ে যে পরিবর্তনের হাওয়া, তুমি তাতে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছ। যে দুরন্ত গতিতে পরিবর্তনগুলি ঘটে যাচ্ছে, এবং সরকারী প্রশাসনের পটভূমিতে যে নতুন সমস্যাগুলি এসে জমা হচ্ছে, সেগুলির মুখোমুখি হ'তে চাই গতি ও উপলব্ধির শক্তি। আগামী বছরগুলিতে সরকারী প্রশাসনকে তিন ধরনের কাজে হাতে দিতে হবে। প্রথমটি হ'ল, একটি প্রসারমান শাসন ব্যবস্থার সৃষ্ট সমস্যা ও সামঞ্জস্যহীনতা। দ্বিতীয়টি হ'ল কাঠামো তৈরি করা—গভর্নমেন্টের পরিবর্তমান ভূমিকার সঙ্গে যাকে মানিয়ে নেওয়া যায়; তৃতীয় বিষয় হ'ল, দক্ষ ও সহানুভূতিপূর্ণ কর্ম-সম্পাদন।

বিবর্ধমান শাসন ব্যবস্থার বড় সমস্যাগুলির মধ্যে অন্যতম হ'ল আর্থিক

অসঙ্গতি। তারজন্য প্রশাসনের অনেক কাজই সময়মতো বা ভালোভাবে করা যায় না। কাজের মান রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। অনেক রাজ্যকে তার ব্যয় নির্বাহ করার জন্য প্রচুর ঋণ নিতে হচ্ছে। এ' এমন একটি রীতি যা' বেশিদিন ধরে চালানো যায় না, কারণ মারাত্মক ক্ষতি হ'তে পারে এই ভাবে চললে। বিভিন্ন স্থানে প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নতি নির্ভর করছে রাজস্বের ঘাটতি কি পরিমাণে মেটানো যাচ্ছে তার ওপরে। এইভাবে ঘাটতি মেটাতে হ'লে সরকারের আকার ছোট করে আনতে হবে, সঠিক মূল্য নির্ধারণ করতে হবে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেওয়া অনুদান বন্ধ করে দিতে হবে, যা সোজাসুজি দরিদ্র মানুষের কাছে হিতজনক হবে না। অদূর ভবিষ্যতে এই কাজগুলির সঙ্গে সকলস্তরে সরকারী বিভাগগুলির কাঠামোর বদল একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। কি করে মানুষকে বোঝানো যাবে পরিবর্তনের প্রয়োজন? কিভাবে বিত্তবান ও মধ্যবিত্ত সমাজকে বোঝানো যাবে যে, যে সুবিধাগুলি তারা ভোগ করে চলেছে তা' অনন্তকাল ব্যাপী হতে পারেনা। কিভাবে সরকারী কর্মচারী ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বিশ্বাস করানো যাবে যে, সাধারণ মানুষের স্বার্থ সবার চেয়ে বড়, তার জন্য পরিবর্তনকে মানতেই হবে।

যখন এই বিষয়গুলি সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া হবে, প্রশাসনের সামনে অনেক সমস্যা এসে দাঁড়াবে। যত বেশি সম্ভব সঠিক তথ্য মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে, আধুনিক ইনফরমেশন সিস্টেম, ও কমপিউটার প্রযুক্তি বিদ্যার প্রয়োজন হবে সুদক্ষ ও সহানুভূতিপূর্ণ কাজে। সেই ভবিষ্যতের কথা ভাবা যায়, যখন, অফিসগুলিতে কাগজের ব্যবহার থাকবে না, এবং মানুষেরা তাদের বাড়িতে বসেই কাজ চালাবে কমপিউটারের সাহায্যে।

বিপুল সংখ্যায় মেয়েরা এখন কাজে বেরিয়ে আসছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, কয়েক দশকের মধ্যেই নারী ও পুরুষের কাজের ভূমিকায় গৃহের মধ্যে ও বাইরে বিরাট পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। অফিসগুলির অবয়বগত ব্যবস্থাও একটি নতুন দৃষ্টি দিয়ে দেখা হবে। প্রশাসনের চোখে নারী ও পুরুষের কোন ভেদ থাকবে না, সাধারণ মানুষকে গণ্য করা হবে কর্তা বলে। যে কাজগুলির কথা আগে বলা হয়েছে সেগুলি এমন ভাবে সম্পন্ন করতে হবে যে, উপরোক্ত সম্ভাবনার দিকে এগোনো যায়। অথবা যা ভীতিজনক, তা হ'ল, সরকারী প্রশাসন কি শুধু গা ভাসিয়ে দিয়ে চলবে, শুধু সমালোচনা টেনে আনবে যে, প্রশাসন একটা কাঠের বাক্স, একটি শ্বেতহস্তী?

তিন প্রকৃতির প্রশাসক আছে বলে জানি। প্রথম, যাদের কোন ধারণা নেই যে কি ঘটছে, এবং জানবার ইচ্ছাও নেই।

দ্বিতীয়, যারা শুধুমাত্র লক্ষ করে যায় কি ঘটছে।

তৃতীয়, কিছু অনুপ্রাণিত ব্যক্তি যারা, যা ঘটবে, তার মূলে থাকে।

ভবিষ্যৎ-বাদীদের মতো আমরা তিনটি দৃশ্য এঁকে দেখাতে পারি—1) অত্যন্ত

হতাশা ব্যঞ্জক, 2) অত্যন্ত আশাজনক এবং 3) মধ্যবর্তী দৃশ্য যার মধ্যে দুইয়েরই কিছু আছে। প্রথম দৃশ্যে পাই সেই সরকারী কর্মচারীদের যারা জানে না, বা জানতে চায় না কি ঘটতে চলেছে, আশাবাদীরা সেখানে, যেখানে থেকে ঘটনাগুলিকে সম্ভব করা হয়। সবচেয়ে বাস্তব দৃশ্য সেইখানে, যেখানে কর্মীর সংখ্যা অনেক (যারা ভবিষ্যৎ গড়তে সাহায্য করে) এবং হতাশাবাদীদের সংখ্যাও কিছু যাদের উপস্থিতিতে কিছু যায় আসে না, এবং যারা অন্যদের কাছে সমস্যা নয়।

একজন মুখ্যসচিবকে (চিফ-সেক্রেটারি) আমি জানি, যিনি বুঝেছিলেন যে, তাঁর সচিবালয়ের এক-তৃতীয়াংশ লোক কোন কাজ করে না। তিনি সুপারিশ করেছিলেন, যে, এই লোকগুলিকে চিহ্নিত করে তাদের বাড়িতে থাকতে বলা হোক তারা মাসের প্রথমে শুধু অফিসে আসবে বেতন নিতে এইভাবে অফিসের জায়গা, আসবাবপত্র ইত্যাদি বাঁচানো যায়। সরকারও সুস্থবোধ করবে, কারণ যারা কাজ করে, তাদের কাজের মধ্যে বাধা পড়বে না। প্রশাসকেরা কি নতুন কার্যপ্রণালী বার করতে উদ্বুদ্ধ হবেন এবং যে সকল সমস্যা প্রশাসন ব্যবস্থায় বদ্ধমূল হয়ে বসেছে, সেগুলির সমাধানে নতুন ভাবে চিন্তা করবেন? তাঁরা এ'কাজ করার জন্য রাজনৈতিক প্রভুদের এবং আদালতের অনুমতি পাবেন?

রাজনৈতিক সামাজিক ও আর্থিক সমস্যাগুলির জটিলতা এবং পাশাপাশি মানুষের উদ্বেল প্রত্যাশা চাইছে যে, প্রশাসনিক দক্ষতার নতুন জাগরণ হোক। সময়ের প্রয়োজন মেটাতে নতুন নিয়মাবলী তৈরি হোক সরকারী কর্মচারীদের জন্য। তাদের মধ্যে যে জড়তা, অকর্মণ্যতা ও লোভ দেখা দিয়েছে সেগুলিকে জয় করতে হবে নতুন পথে চিন্তা করে। সরকারী কর্মচারী ও রাজনীতিবিদ দু'দলকেই হিসাবনিকাশে বাধ্য করতে হবে। পুনঃ পুনঃ শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কর্মীদের জানাতে হবে যে, তাদের কাছে যে প্রত্যাশা, তা পূর্ণ করার পথে কিভাবে অগ্রসর হতে হবে। সরকারী কমর্চারীদের জন্য তাদের মধ্যে থাকা সম্ভাবনাময় শক্তির বিকাশের জন্য প্রেরণামূলক নীতি রচনা করতে হবে।

আইনের নিয়মই সর্বোচ্চ যেখানে, সেখানে পৌছতে সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও সংবেদনশীল প্রশাসন ব্যবস্থা আমাদের গড়ে তুলতে হবে। আমরা বুঝতে আরম্ভ করেছি যে, সরকারের একটি আঙুল রয়েছে অনেকগুলি পয়সার মধ্যে এবং তার মধ্যে কিছু সরাতেই হবে। অন্য যে কোন সংস্থার চেয়ে তার কাজ ভালো হবে, এবং অন্য কোন সংস্থা যা পারে না তাই করার জন্য শাসন কর্তৃপক্ষের থাকা উচিত। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী থেকে বোঝা যায় যে, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক স্থিরতা রক্ষার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িকতা তার বিষাক্ত ফণা তুলে দাঁড়াচ্ছে। নতুন ধরনের সন্ত্রাস সৃষ্টি, নিরীহ মানুষের জীবননাশ, পরস্পর বিরোধী দাবির জন্য, একটি রুটির ভাগ নেওয়ার জন্য

যে দলাদলি ও উত্তেজনা জাগছে, তার মধ্যে আইন ও শৃঙ্খলাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারাই সরকারী কাজে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে। দেশের উন্নয়নের জন্য আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষাই অগ্রাধিকার পাবে। কি চায় সাধারণ মানুষ? সে চায় নিরাপদে ঘুরতে ফিরতে; একটি পরিচ্ছন্ন পরিবেশ এবং সৎভাবে জীবন ধারণের অধিকার। তার বিক্ষোভ ও দুঃখের অবসান ঘটাতে চাইবে তার বাসস্থানের কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে। তার জন্য রাজনীতিতে যাওয়ার প্রয়োজন কেন হবে, কেন এত ব্যয় করতে হবে যা তার সাধ্যের বাইরে? জনসংখ্যা কম হলে জনসেবার উৎকর্ষ বাড়ে। তাই স্থানীয় স্ব-শাসিত শাসন ব্যবস্থার গুরুত্ব, যার কাছে দ্রুত পৌঁছনো যায়। স্থানীয়/আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা বাস্তব সত্য হওয়া উচিত। মানুষ যাতে দাবি জানাতে পারে যে ধরনের প্রশাসন ও যে ধরনের হিতকর কার্য তারা চায়, তার জন্য। যারা শক্তিহীন, তাদের শক্তিকে বার করে আনতে হবে। মানুষকে স্বাবলম্বী হতে দিতে এবং যা তাদের প্রয়োজনীয় তার জন্য দাবি জানাতে দেওয়ার অধিকারের জন্য মানুষকে শক্তি দিতে হবে। তারাই যেন ভবিষ্যতে ওমবাডসম্যান বা অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে সতর্ক প্রহরী হয়ে ওঠে।

নাগরিক মানুষকে সক্রিয় করে তুলতে হবে, তার সক্রিয়তা বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রেরণা দিয়ে যেতে হবে। একমাত্র মানুষই তার প্রশাসন ব্যবস্থাকে সজাগ করে রাখতে পারে। গণতন্ত্রের শেষকথা—মানুষই একমাত্র বাস্তব সত্য, প্রশাসনকে পরিশ্রম করতে হবে তাকে সন্তুষ্ট রাখতে।

উল্লেখপঞ্জি

প্রথম পরিচ্ছেদ

I প্রাচীন ভারতের প্রশাসন ব্যবস্থা

1. রোমিলা থাপার, এ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, ভল্যুম 1, পেঙ্গুইন বুক্স্, নিউদিল্লি, 1990, পৃঃ 30
2. নগেন্দ্র সিং, জুরিস্টিক কনসেপ্ট অব এনসেন্ট ইন্ডিয়ান পলিটি, ভিশন বুক্স্, নিউদিল্লি, 1980, পৃঃ 33
3. সোমনাথ ধার, কৌটিল্য অ্যান্ড অর্থশাস্ত্র, মারওয়া পাবলিশার্স, নিউদিল্লি, 1981, পৃঃ XI.
4. উমেশকুমার, কৌটিল্য'জ থট অন পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, এন.বি.ও. পাবলিশার্স, নিউদিল্লি, 1990, কোটেসন ফ্রম অর্থশাস্ত্র, বুকস I & II , চ্যাপটার IV , পৃঃ 107.
5. রোমিলা থাপার, op. cit. পৃঃ 109
6. আই. এইচ. কুরেশী, দি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব সুলতানেট অব দিল্লি, ওরিয়েন্টাল বুকস, নিউদিল্লি, 1971, পৃঃ 2
7. ইউ. এন. দে, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেম অব দিল্লি সুলতানেট, 1206-1413 এ.ডি, কুতবমহল পাবলিশার্স, এলাহাবাদ, 1939, পৃঃ 138। কোটেসন ফ্রম তাজ-উল-মাসির।

II মোগল আমলের প্রশাসন ব্যবস্থা

1. পার্সিভাল স্পিয়ার, এ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, ভল্যুম 2, পেঙ্গুইন বুক্স নিউদিল্লি, 1992, পৃঃ 28.
2. ইউ. এন. দে, দি মুগল গভর্নমেন্ট, 1556-1707 এডি, মুন্সিলাল মনোহরলাল, নিউদিল্লি, 1970, পৃঃ XI , সারণ থেকে উদ্ধৃত, ইস্লামিক পলিসি, পৃঃ 91
3. পি সারণ, দি প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্টস অব দি মুগলস, কিতাবিস্থান, এলাহাবাদ, 1941, পৃঃ 285।

III ব্রিটিশ আমলে সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থা

1. এস. এন. সদাশিবম্ (সম্পাদিত), এ ন্যাশনাল পার্সপেক্টিভ উইথ পার্টিকুলার রেফারেন্স্ টু ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, নিউদিল্লি, 1988, জেলা-প্রশাসনে জেলা-সমাহর্তার ভূমিকা সম্পর্কিত নিবন্ধ—ভি চন্দ্রলেখা কর্তৃক লিখিত, পৃঃ 74
2. পূর্বোক্ত, পৃঃ 73
3. চার্লস রস (সম্পাদিত), করেসপন্ডেন্স অব চার্লস ফার্স্ট, মার্কুইজ কর্নওয়ালিস, ভল্যুম 2, 1859, পৃঃ 558
4. এল. এম. ভাটিয়া., এ মিসলেনি অন দি রাজ, হিস্টোরিক্যাল অ্যান্ড আদার পিসেস, রিলায়েন্স, পাবলিশিং, নিউদিল্লি, 1989, এল.এম. ভাটিয়ার পূর্ববর্তী টিকা
5. এস. গোপাল, ব্রিটিশ পলিসি ইন ইন্ডিয়া, 1858-1905, কেমব্রিজ ইউনিভারসিটি প্রেস, লন্ডন, 1965, রেজোলিউশন অব দি গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া নং 2491, পৃঃ 178
6. এইচ.এইচ. ডোডওয়েল, (সম্পাদিত), দি কেমব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, ভল্যুম VI, এস.চাঁদ অ্যান্ড কোং, নিউদিল্লি, 1958, পৃ ঃ 357
7. পূর্বোক্ত, পৃঃ 375।
8. বি. শিব. রাও, দি ফ্রেমিং অব ইন্ডিয়া'জ কনস্টিটিউশন, সিলেক্ট ডকুমেন্টস, ভল্যুম IV, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, নিউদিল্লি, 1968, পৃঃ 332, এক্সট্র্যাকটস ফ্রম দি লেটার অব হোম মিনিস্টার বল্লভভাই প্যাটেল টু দি প্রাই মিনিস্টার, এপ্রিল 27, 1948.
9. এইচ , এইচ. ডোডওয়েল, (সম্পাদিত), op. cit , পৃঃ 373.
10. আর. সি. মজুমদার, (সম্পাদিত), দি হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার অব দি ইন্ডিয়ান পিপল, স্ট্রাগল ফর ফ্রিডম, ভল্যুম XI, ভারতীয় বিদ্যাভবন, বোম্বে, 1969 পৃঃ 34.
11. পূর্বোক্ত, পৃঃ 758
12. এইচ. এইচ. ডোডওয়েল (সম্পাদিত), op. cit , পৃঃ 570.
13. পূর্বোক্ত

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

1. বি. শিব. রাও, দি ফ্রেমিং অব ইন্ডিয়া'জ কনস্টিটিউশন, সিলেক্ট ডকুমেন্টস ভল্যুম 1; ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, নিউদিল্লি 1966, পৃঃ 559.

2. এম. ভি.পাইল্‌স্‌, কনস্টিটিউশনাল গভর্নমেন্ট ইন ইন্ডিয়া, এস. চাঁদ অ্যান্ড কোং, নিউদিল্লি, 1984, পৃঃ 24.
3. এম.ভি. পাইলস, ইন্ডিয়া অ্যান্ড কনস্টিটিউশন, এশিয়া পাবলিশিং হাউস নিউদিল্লি, 1967, পৃঃ 295-296.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

1. টি. এন. চতুর্বেদী (সম্পাদিত), ইন্ডিয়ান জার্নাল অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ভল্যুম, XXVI, নং 1, জানুয়ারি 1978, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, নিউদিল্লি, পৃঃ 260, 'দিল্লি পুলিশ কমিশন রিপোর্ট রিলেটিং টু নন-গেজেটেড মেম্বার্স অব দি পুলিশ' (চেয়ারম্যান: জি. ডি. খোসলা) থেকে উদ্ধৃতি।
2. ফার্স্ট রিপোর্ট অব দি ন্যাশনাল পুলিশ কমিশন (চেয়ারম্যান ঃ ধরমবীর) গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া 1979, পৃঃ 7.
3. পূর্বোক্ত, পৃঃ 11.
4. পূর্বোক্ত, পৃঃ 10-11.
5. বি.সি. মুখার্জি, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন চেঞ্জিং ইন্ডিয়া, ব্রেজ পাবলিকেশনস নিউদিল্লি, 1994, পৃঃ 99.
6. থার্ড রিপোর্ট অব দি ন্যাশনাল পুলিশ কমিশান (চেয়ারম্যান ঃ ধরমবীর) গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া, 1980, পৃঃ 25-27.
7. সিলভার জুবিলি কোয়ার্টারলি জার্নাল, ভ্যলুম XXIV, No. 1, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, নিউদিল্লি, 1978.
8. ফার্স্ট রিপোর্ট অব দি ন্যাশনাল পুলিশ কমিশন, op. cit , পৃঃ 21-22.
9. এম. ভি. পাইলস, কনস্টিটিউশনাল গভর্নমেন্ট ইন ইন্ডিয়া, এস. চাঁদ অ্যান্ড কোং নিউদিল্লি, 1984, পৃঃ 351.
10. জে. পি. মেমোরিয়াল লেকচার 1982, জাস্টিস জে. এম. এল. সিনহা, দি কনস্টিটিউশন, দি জুডিসিয়ারি অ্যান্ড দি পিপল জয়প্রকাশ ফাউন্ডেশন, নিউদিল্লি, 1983, পৃঃ 6.
11. পূর্বোক্ত, পৃঃ 17-18.
12. বি. শিব. রাও, দি ফ্রেমিং অব ইন্ডিয়া'জ কনস্টিটিউশন, সিলেক্ট ডকুমেন্টস, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, নিউদিল্লি 1967, পৃঃ 36.
13. পূর্বোক্ত, পৃঃ 19
14. পূর্বোক্ত, পৃঃ 22

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

1. বি. এল. ফার্দিয়া ও আর. কে মেনারিয়া, সরকারিয়া কমিশন রিপোর্ট অ্যান্ড সেন্টার স্টেট রিলেসনস, সাহিত্য ভবন, আগ্রা, 1990, পৃঃ 5
2. পূর্বোক্ত, পৃঃ 3
3. পূর্বোক্ত, পৃঃ 4
4. কমিশন অন সেন্টার স্টেট রিলেসনস রিপোর্ট, পার্ট 1, (চেয়ারম্যানঃ জাস্টিস সরকারিয়া), গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া প্রেস, নাসিক, 1998 পৃঃ 111
5. পূর্বোক্ত পৃঃ 271
6. পূর্বোক্ত পৃঃ 543

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

1. অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিসিশন অ্যান্ড জুডিসিয়াল সিস্টেম, ইন্ডিয়ান জার্নাল অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ভল্যুম XXVI, নং-3, অক্টোবর—ডিসেম্বর, 1980. ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, নিউদিল্লি
2. টি. এন. চতুর্বেদী (সম্পাদিত) ইন্ডিয়ান জার্নাল অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন স্পেশ্যাল নাম্বার, ভল্যুম XXIX, নং-3, জুলাই-সেপ্টেম্বর 1983, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, নিউদিল্লি, পৃঃ 513.
3. রিপোর্ট অব দি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস কমিটি, ভল্যুম 1, পার্ট 1, গভর্নমেন্ট প্রেস, থিরুবনন্তপুরম্ 1958, পৃঃ 128
4. অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস কমিশন রিপোর্ট অন দি মেসিনারি অব দি গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইটস প্রোসিডিওরস অব ওয়ার্ক, গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া, নিউদিল্লি, 1968, পৃঃ 21-22.
5. এস. এন. সদাশিবন (সম্পাদিত), এ ন্যাশনাল পার্সপেক্টিভ উইথ পার্টিকুলার রেফারেন্স টু ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, নিউদিল্লি 1988, আর্টিকল অন দি রোল অব ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর ইন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন,—ভি. চন্দ্রলেখা, পৃঃ 74
6. কে. কে. পুরী (সম্পাদিত) পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ইন্ডিয়ান স্পেকট্রাম, কিতাব-মহল, এলাহাবাদ 1985, পৃঃ 149

7. দি সিভিল-সার্ভিস রিপোর্ট অব দি কমিটিস (ফুলটন কমিটি) 1966-69, ভল্যুম 1, ইউনাইটেড কিংডম, পৃঃ 93
8. উমেশকুমার, কৌটিল্য'জ থট অন পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, এন. বি. ও পাবলিশার্স, নিউদিল্লি, 1990, পৃঃ 129
9. পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ভল্যুম 60, অটাম 1982, ইউনাইটেড কিংডম, পৃঃ 253-272

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

1. ভি. টি. কৃষ্ণমাচারি, প্ল্যানিং কমিশন রিপোর্ট, 1962, অন ইন্ডিয়ান অ্যান্ড স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সার্ভিসেস, পৃঃ 14

সপ্তম পরিচ্ছেদ

1. এস. আর. মাহেশ্বরী, লোক্যাল গভর্নমেন্ট ইন ইন্ডিয়া, ওরিয়েন্ট, লংম্যান, নিউদিল্লি, 1971, পৃঃ 10
2. এইচ. এইচ. ডোডওয়েল (সম্পাদিত) দি কেমব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, ভল্যুম VI, 1958, পৃঃ 513
3. হিউ টিংকার, দি ফাউন্ডেশনস অব লোক্যাল সেল্ফ গভর্নমেন্ট ইন ইন্ডিয়া, পাকিস্তান অ্যান্ড বার্মা, অ্যাথলটোন প্রেস, লন্ডন 1954, পৃঃ 85
4. এস. আর. মাহেশ্বরী, op. cit., পৃঃ 24
5. গভর্নমেন্ট অব কেরালা, রিপোর্ট অন দি মেজার্স টু বি টেকন ফর ডেমোক্রেটিক ডিসেন্ট্রালাইজেশন অ্যাট দি ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড লোয়ার লেভেলস, ভল্যুম 1, 1988, পৃঃ 2, এ. ডি. মালব্যর ভিলেজ পঞ্চায়েতস ইন ইন্ডিয়া নিবন্ধ থেকে উদ্ধৃত, নিউদিল্লি, 1956, পৃঃ 259
6. পূর্বোক্ত, পৃঃ 3, এবং হরিজন—ডিসেম্বর 21, 1942
7. পূর্বোক্ত, পৃঃ 3
8. পূর্বোক্ত, পৃঃ 5, উদ্ধৃতি: গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া রিপোর্ট অব দি টিম ফর দি স্টাডি অব কমিউনিটি প্রোজেক্টস অ্যান্ড ন্যাশনাল এক্সটেনশন সার্ভিস, ভল্যুম 1, (চেয়ারম্যান বলবন্তরায় মেহতা) 1957
9. রিপোর্ট অব দি কমিটি অন পঞ্চায়েতী রাজ ইনস্টিটিউশন, আগস্ট 1978, মিনিস্ট্রি অব এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট, গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া, পৃঃ 3-4.
10. ভি. রামচন্দ্রন, রিপোর্ট অন দি মেজার্স টু বি টেকন ফর ডেমোক্রেটিক ডি-সেন্ট্রালাইজেশন অ্যাট দি ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড লোয়ার লেভেলস, গভর্নমেন্ট অব কেরালা, 1988, পৃঃ 17-19.

অষ্টম পরিচ্ছেদ

1. পি. আর. দুবাসি "অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিফর্মস ইন পার্সপেক্টিভ" দ্রঃ জন মাথাই এনডাওমেন্ট লেকচার 1985, ইউনিভারসিটি অব কেরালা, পৃঃ 10

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

Allan Dodwell, Haig and Wolseley, The Cambridge Shorter History of India, S. Chand & Company, New Delhi, 1958.

Banerjee Pramathanath, Public Administration in Ancient India, Indian Reprints Publication House, New Delhi 1973.

Chanda Ashok, Indian Administration, George Allen and Unwin, London 1967.

Chaturvedi S. K., Police ane Emerging Challenges, B.R. Publishers, New Delhi, 1988.

Dubashi P. R., Grammar of Planning Concepts and Applications, Indian Institute of Public Administration New Delhi, 1983.

Gupta S. P., Planning and Development, A Critique, Allied Publishers, Bombay 1989.

Kashyap Subhash C. Our Constitution, National Book Trust, New Delhi, 1994.

Khera S. S., District Administration in India, Popular Press, Bombay, 1964.

Krishnamachari and S. Venu, Planning in India—Theory and Practice, Orient and Longman, New Delhi, 1977.

Maheswari S. R., The All India Services, Indian Institute of Public Administration, New Delhi, 1971.

Administrative Reforms in India, Jawahar Publishers, New Delhi, 1985.

Indian Administration, A Historical Account, Jawahar Publishers, New Delhi, 1994.

Majumdar R. C., Ancient India, Motilal Banarasidas, New Delhi, 1960.

Mehra Ajay K., Police in Changing India, Usha Publications, New Delhi, 1985.

Menon V. P., The Transfer of Power in India, Orient Longman, New Delhi, 1994.

Mukherjee B. C., Administration in Changing India, Blaze Publishers, New Delhi, 1994.

Patel Vallabhbhai, Sardar Patel's Correspondence 1945-50, Navajivan Publications, Ahmedabad.

Raghavan R. K., Indian Police: Problems, Planning and Perspectives, Manohar Publications, New Delhi, 1989.

Rangarajan L. N., Arthasastra, Penguin Books, New Delhi, 1992.

Rao Hemalatha, Centre State Financial Relations, Allied Publishers, New Delhi 1981.

Sarkar Jadunath, Mughal Administration, Sarkar & Sarkar, Calcutta, 1952.

Singh Shailendra (সম্পাদিত) Union State Financial Relations in India with Special Reference to the Under developed States, Sterling Publishers, New Delhi, 1980.

Sinha B. P., Readings in Kautilya's Arthasastra, Agam Prakashan, New Delhi, 1976.

Sinhá B. K., Fiscal Federalism in India, Sterling Publishers, New Delhi 1987.

Strachey John, India, It's Administration and Progress, McMillan, London, 1903.

Tiwari Umakant, The Making of the Indian Constitution, Central Book Depot, Allahabad, 1967.

Tully Mark and Zareer Masani, From Raj to Rajiv, BBC Books London, 1988.

Tyagi A. R., Public Administration: Principles and Practice, Atmaram and Sons, New Delhi, 1980.

Visveswarayya M., Planned Economy for India, Bangalore Printing Press, Bangalore, 1936.

Willoughfy, Principles of Public Administration, Central Book Depot, Allahabad, 1976.

Wraith Ronald and Simkins Edgar, Corruption in Developing Countries, George Allen and Unwin, London, 1963.

Printed at India International Press, A-12/1, Naraina Industrial Area, Ph-I, New Delhi-28